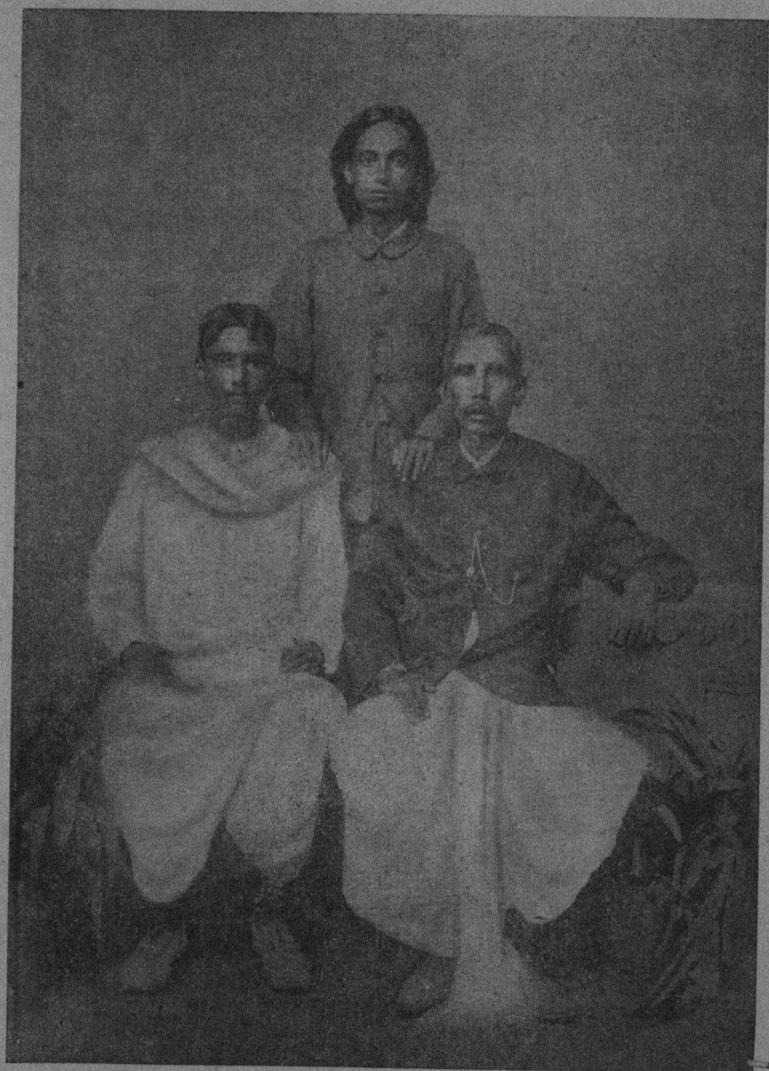
॥ দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৩ ॥

প্রকাশক :

শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়
জয়গুরু কার্য্যালয়
৯৪ শান্তিরাম রাস্তা,
বালি, হাওড়া।

মুদ্রাকর :

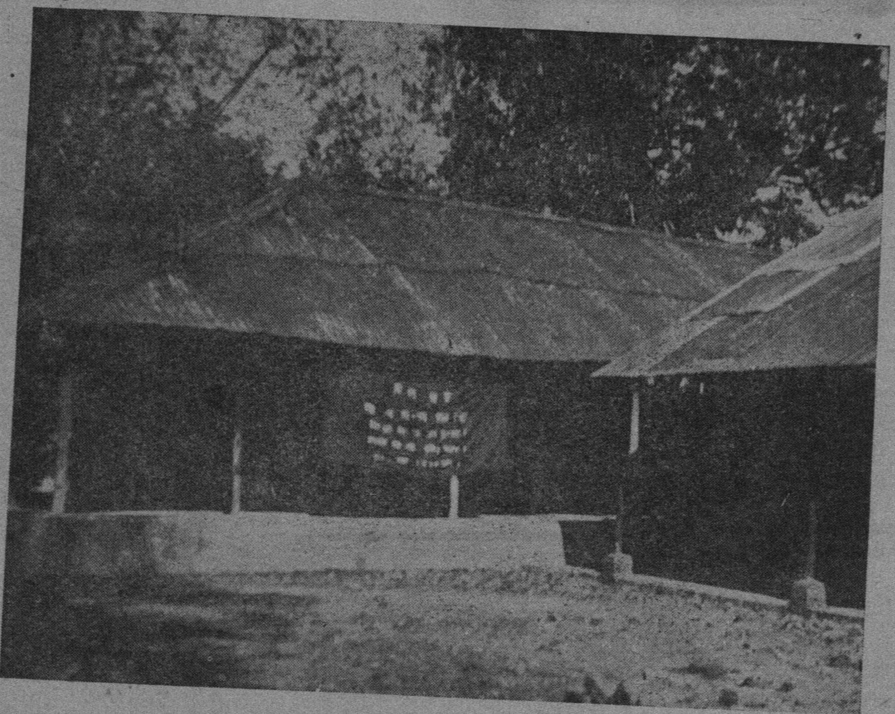
শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস্ প্রিণ্টার্স্
৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা—৫০



পিতা ও অগ্রজ সহ শ্রীশ্রীঠাকুর



যৌবনে সঙ্গীগণসহ শ্রীশ্রীঠাকুর



সাধন সমিতি, দিগসুই

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলাবিলাস

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রীশ্রী১০৮ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী

পিতৃদেব

শ্রীচরণকমলেষু ।

"পিতা নোঽসি"

বাবা, তোমার দেওয়া "শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলাবিলাস"

তোমারই শ্রীচরণে অঞ্জলি দিলাম ।

কৃপা ক'রে গ্রহণ কর ।

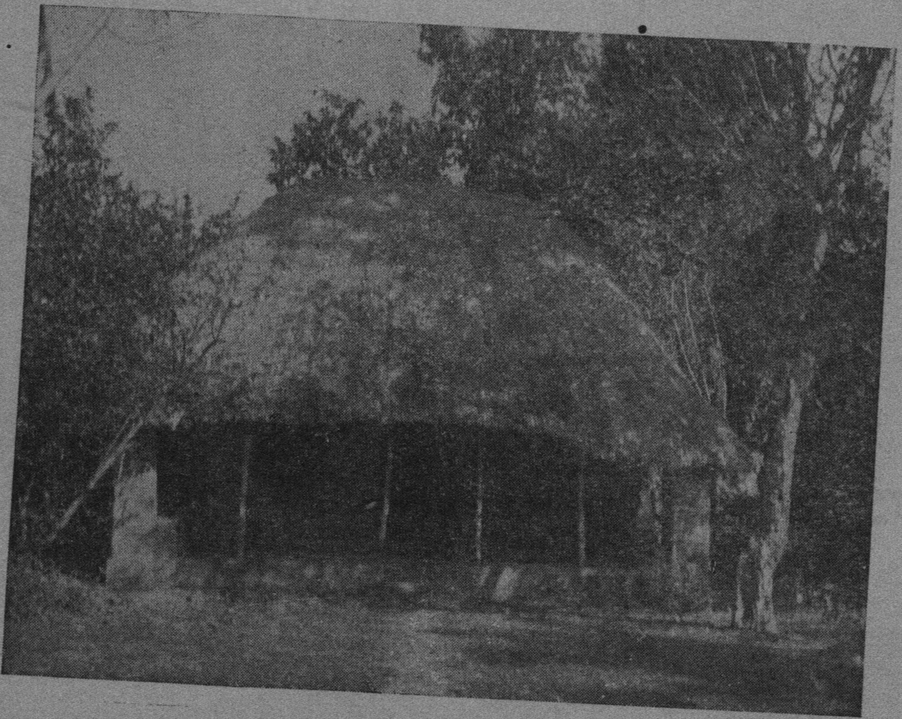
প্রণত

কৃপাধন্য দীনাতিদীন

কিঙ্কর আত্মানন্দ



শ্রীশ্রীমা



টোল ঘর, দিগসুই

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলাবিলাস

অঞ্জলি-অর্পণ

(১)

মধ্যাহ্নসূর্য যখন দীপ্ত তেজে ঊর্ধ্ব গগনে আরোহণ করিয়া সুদূর দিঙ্‌মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করেন, তখন তাঁহার জ্যোতির্ময় সত্তা স্বয়ং প্রকাশিত। সমস্ত জগৎ তাঁহার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করে; আলো জ্বালিয়া সূর্যকে দেখাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সেই সূর্য যখন দিক্‌চক্রবালের নিম্নে আত্মগোপন করিয়া নিশীথ অন্ধকার হইতে ধীরে ধীরে দীপ্তিকণা আহরণ করেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগে। এই ভাস্বর সূর্যের রশ্মি সঞ্চয়ের ইতিহাস কি মানব অনুভূতির নিকট উন্মোচিত করা সম্ভব; অন্ধকারের সহিত অদৃশ্য যুদ্ধের কাহিনী ও সেই নীরব, মর্মান্তিক সংগ্রামে জয়লাভের উদ্দীপনা কি অপরের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে—এই জাতীয় প্রশ্ন আমাদের চিন্তাকে স্বতঃই আলোড়িত করে। মধ্যাহ্ন ভাস্করের জগৎ আলো-করা ঔজ্জ্বল্য ও তরুণ সূর্যের কুয়াশার বাধা অতিক্রম করিয়া মন্থর, সঙ্কুচিত আবির্ভাব—এই দুইএর মধ্যে কি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়?

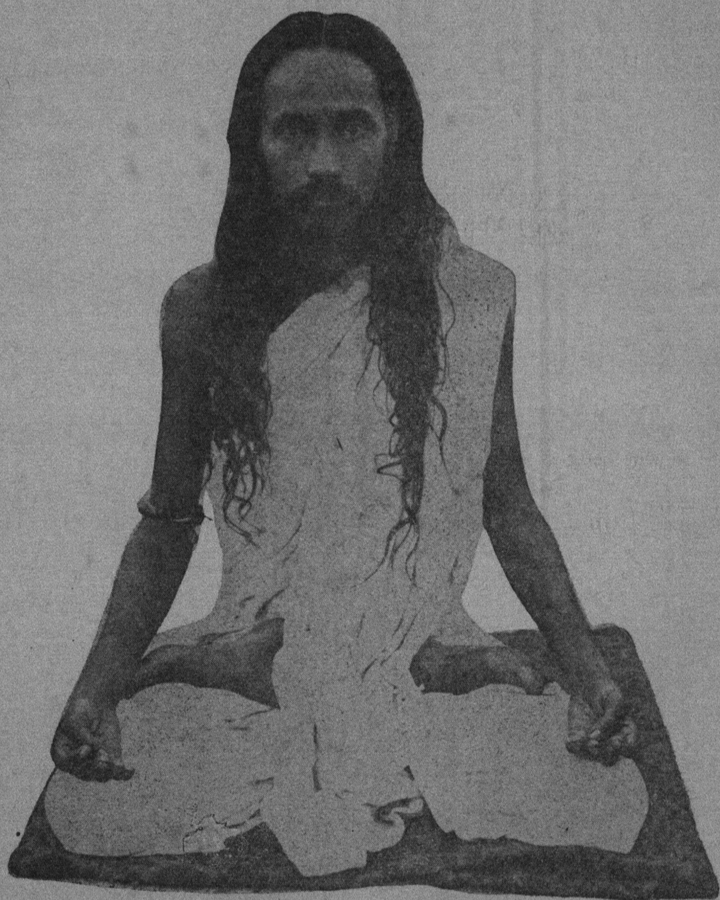
জড় জগতের তেজো-উৎস সূর্য সম্বন্ধে যে সংশয়, অধ্যাত্ম জগতের হিরণ্ময় পাত্রের আবরণভেদী সবিতৃশক্তির সম্বন্ধে তাহা আরও জটিল ও ঘনীভূত। একজন মানব-সন্তান, মানুষের সমস্ত দুর্বলতা



শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের বাটী, দিগসুই

লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া দেহধর্মের সমস্ত বিপরীতমুখী প্রভাব অতিক্রম করিয়া কি একাগ্র সাধনার বলে ভগবৎ-স্বরূপের রহস্যভেদ করেন ও তাঁহার একান্ত সন্নিহিত হন, মরদেহে অমরত্বের সুরভি বিকশিত করেন, তাহার কার্যকারণশৃঙ্খলা কি সাধারণ মানুষের অনুভবগম্য হইতে পারে? বিশ্ববিধানে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি সব সময়ই রহস্যাবৃত ও কেবলমাত্র বুদ্ধির অগোচর। জড় হইতে চেতন, দেহবুদ্ধি হইতে অধ্যাত্মসত্তা, ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়তায় রূপান্তর কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। সাধকের চিত্তে কখন যে অধ্যাত্ম আলোক জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার জীবনবোধ কখন যে ধীরে ধীরে বুদ্ধিনির্ভরতা হইতে ভগবৎ-কেন্দ্রিকতা লাভ করিল, কখন যে তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এক পরম-রহস্য-অনুভূতির উপায়-স্বরূপ হইল তাহা হয়ত সাধক নিজেই বোঝেন না, অপরে কি বুঝিবে? যাঁহাকে ঠিক আমাদেরই মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখিতেছি, যিনি আমাদের মতই পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যবন্ধন স্বীকার করেন, যিনি অসংখ্য মানুষের মধ্যে নিজ স্নেহ-প্রীতি-মমতা ছড়াইয়া দেন, তিনিই যে আবার সমস্ত মানবিক বৃত্তির ঊর্ধ্বে, নির্মম নিঃসঙ্গতায় এক পরমা শক্তির সহিত লীলামগ্ন, এক ঐশ্বরিক কেন্দ্রে একক-সংসক্ত তাঁহার এই আপাত-দ্বৈত প্রকৃতির মধ্যে অদ্বয়ানুভূতির রহস্যভেদ করা মানব-বুদ্ধির অতীত। এই অনির্বচনীয় সত্তা-রহস্যকে বর্ণনা-বিবৃতির দ্বারা কতটুকু প্রকাশ করা যায়?

মদীয় পরমারাধ্য ইষ্টদেব, ভগবৎ-সাধনায় অর্পিত-জীবন ও ভগবৎ-প্রেমবিভোর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের একখানি জীবন-কাহিনী তাঁহার পুত্র পরমপ্রীতিভাজন শ্রীমান্ রঘুনাথ কাব্যব্যাকরণ-



পদ্মাসনে শ্রীশ্রীঠাকুর

তীর্থ কিঙ্কর আত্মানন্দ কর্তৃক লিখিত হইয়া শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলাবিলাস নামে প্রকাশিত হইতেছে। পুত্রও পিতার পদাঙ্কানুসারী। পিতৃ-আদর্শে দীক্ষিত ও পিতৃ-প্রদর্শিত পথে অধ্যাত্ম সাধনায় রত। সুতরাং তিনি যে শ্রীশ্রীসীতারামের লীলা প্রকাশের নিতান্ত উপযুক্ত অধিকারী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি পরিবার-জীবনের অন্তরঙ্গতায়, ভক্তিপূত একত্রবাসের প্রতি মুহূর্তের নিবিড়ত্বে, সংসার-খেলার অন্তরালবর্তী ভগবদনুসন্ধানের গূঢ়তর খেলায় তাঁহার অনুযাত্রী, তিনিই যে তাঁহার অধ্যাত্ম পথে অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করিতে পারিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, শ্রীমান্ রঘুনাথের রচনাটি অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিপ্রোজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শ্রীশ্রীসীতারামের পবিত্র জীবন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ঈশ্বরাভিমুখী হইতে শেষে ঈশ্বরসর্বস্ব হইয়াছে, সংসারজীবন কেমন করিয়া দিব্য জীবনের অপূর্ব বিভামণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহার লীলাক্ষেত্র কেমন করিয়া প্রসারিত হইতে হইতে অনন্তাভিসারের ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করিয়াছে—এই নিগূঢ় তথ্য এই গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। কথায়-বার্তায়-রহস্যালাপে, শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের প্রতি উপদেশদানে, নামপ্রচার ও দীক্ষাদানকল্পে অবিশ্রান্ত দেশ-পর্যটনে, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থরচনায়, মুহুর্মুহু কঠোর মৌনব্রত-পালনের মধ্য দিয়া ঈশ্বর সাধনার নির্জন-নিবিড় অন্তরালসৃষ্টিতে শ্রীশ্রীসীতারামের অন্তরের নিরুদ্ধ জ্যোতি কেমন করিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুদ্র নির্ঝর কেমন করিয়া সমুদ্রাভিমুখী মহানদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস ও একনিষ্ঠ গতিবেগ আহরণ করিয়াছে, তাহা আমরা এই গ্রন্থবিবৃত ঘটনাপঞ্জী হইতে অবগত হই। মহাপুরুষের ভগবানের দিকে সদা-আবর্তিত মুখের যে অংশ আমাদের স্থূল দৃষ্টির নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে, এই

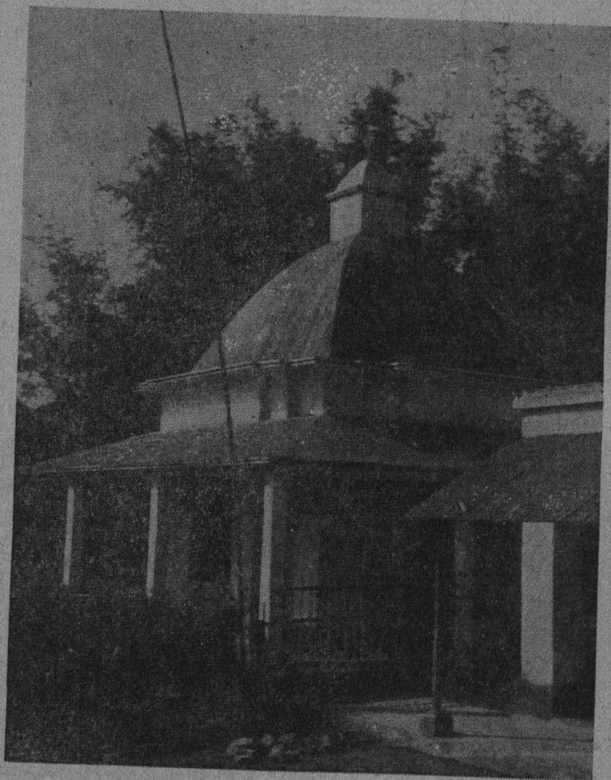


সমাধিস্থ শ্রীশ্রীঠাকুর

জীবনীগ্রন্থে সেই সংসার-পরাবৃত্ত অংশের উপরই আলোকপাত করা হইয়াছে।

(২)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কবিতায় কবিকে তাঁহার জীবনীর মধ্যে খুঁজিতে তাঁহার পাঠকগোষ্ঠীকে নিষেধ করিয়াছিলেন। জীবনেব স্থূল বহির্মুখী ঘটনায় কবিপ্রতিভার রহস্য নিহিত থাকে না, ইহাই তাঁহার ইঙ্গিত। কবির সম্বন্ধে যাহা সত্য, মুমুক্ষু ভগবৎসাধক সম্বন্ধে তাহা আরও সত্য। সৌন্দর্যপ্রীতি ও রূপমুগ্ধতা কবির সহিত সাধারণ মানুষের সাধর্ম-লক্ষণ। তা ছাড়া কবির সৃষ্টি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বহির্জীবনাশ্রয়ী। কবির ছিন্নপত্রাবলী তাঁহার কাব্যসাধনার ভাষ্যরূপে ন্যায্যভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি যখন অনন্তের দিকে অভিসারযাত্রা করেন, তখন মানবসাধারণ সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতিশৃঙ্খলা তাঁহার যাত্রাসহচররূপে তাঁহার অনুগমন করে। এমন কি কবির ভগবৎপ্রেমও মানবিক আবেগ ও আকূতির একটু সূক্ষ্মতর রূপান্তরিত সংস্করণ। কবির চক্ষে ঈশ্বর করুণাময় ও অসীম শক্তিশালী বটেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ রূপময় ও প্রেমময়। "হৃদয়মন্দিরে যব কানু ঘুমাওল, প্রেমপ্রহরী রহু জাগি।" যাঁহারা ধ্যানসাধনার পথে ভগবৎ-স্বারূপ্য কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বহির্জীবন আরও অপ্রাসঙ্গিক। তাঁহাদের বহির্জীবনের ইতিহাস অন্তর্জীবনের রহস্য-উন্মোচনে সর্বদা সহায়ক হয় না। তাঁহারা আসক্তিকে পোড়াইয়া আরতির দীপ জ্বালেন; বহির্জীবনের ঘটনাবলীকে ইন্ধনরূপে ভস্মসাৎ করিয়াই ভগবৎ-সাধনার হোমানল প্রজ্বলিত রাখেন। তাঁহারা পায়ে পায়ে পথের চিহ্ন মুছিয়াই



শ্রীরামনাম মন্দির, দিগসুই

অনন্তাভিসারে অগ্রসর হন। কবির যাত্রাপথে মানবিক হৃদয়স্পন্দন তাঁহার নিঃসঙ্গতাবোধের গভীরতা হ্রাস করে। তিনি সকল মানুষ, এমন কি তাঁহার গমনপথের প্রকৃতিসৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁহার উপলব্ধির আনন্দ ভাগ করিয়া লন। "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"— ইহাই সর্বকালের কবির মর্মবাণী।

সাধকের প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ত্যাগ ও বিস্মৃতির পথ বাহিয়াই তাঁহার অভীষ্ট তীর্থে উপনীত হন। ইন্দ্রিয়ের দীপ নিবাইয়া, মানবিক বৃত্তির উৎসাদন করিয়া, সমস্ত বিশ্বসংসার হইতে বিভক্ত হইয়া তিনি নিজ ধ্যানতন্ময়তার নিঃসঙ্গ গভীরতায় জীবনের অন্তিম রহস্যের মুখোমুখি হন। জগতের আবরণকারী সমস্ত রূপ-রস-গন্ধকে মরীচিকার ন্যায় নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়াই তিনি জগতের অন্তরালবর্তী জগন্নাথের সাক্ষাৎলাভ করেন। বাহিরের ঘটনা একাধারে তাঁহার বন্ধন ও মুক্তি—উহা একদিকে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অগ্রগতির প্রেরণা যোগায়, অন্যদিকে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার উপলব্ধির স্থিরতা সম্পাদন করে। আজ যাহা তাঁহাকে আগাইয়া দিল, কাল তাহা অগ্রগতির বাধারূপে নির্মমভাবে পরিত্যক্ত হইল। আজ যাহা উড়িবার ডানা, কাল তাহা চরণের শৃঙ্খল। বহির্ঘটনার আনুগত্যে নহে, সাধকের অন্তরের নিগূঢ় প্রয়োজনে উহার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণেই সাধকজীবনের সার্থকতা। তাই ইতিহাসের বিবর্তনতত্ত্ব, জৈব প্রাণকণিকার পরিবেশনির্ভরতা অধ্যাত্ম জীবনে সর্বথা প্রযোজ্য নহে।

(৩)

শ্রীশ্রীসীতারামদাসের বহির্জীবনের ঘটনাগুলি কয়েকটি বিদ্যুৎ-দীপ্ত রহস্যনিবিড় মুহূর্ত বাদ দিলে, সাধারণ চক্ষে তাঁহার অন্তর্জীবনের

উপর আলোকপাত করে না বলিয়াই মনে হয়। এই বিশেষ ভাব-রোমাঞ্চিত মুহূর্তগুলির কথা পরে আলোচনা করিব। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিলে তাঁহার প্রথম জীবন সাধারণ বাঙালী জীবনের উদ্‌ভ্রান্তি ও লক্ষ্যহীনতাই প্রতিফলিত করে। তিনি যে পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছেন, পথের সন্ধান পাইতেছেন না, এই ধারণাই মনে জন্মে। শৈশব-চাপল্য অন্যান্য ঈশ্বরানুরাগী মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহারও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে তিনি আঠার বৎসর বয়সে ভাবী দীক্ষাগুরু দিগসুইএর সংস্কৃত অধ্যাপক দাশরথি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের টোলে শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সাধক-জীবনের বীজ এইখানেই উপ্ত হইল ও গুরুর সহিত জীবনব্যাপী একটি মধুর সম্পর্কের সূচনা হইল। দুই বৎসরের মধ্যেই ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তরুণ যুবক নিজ সুপ্ত মনীষার পরিচয় দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর অংশে অবতীর্ণ হইয়া গুরুশিষ্যের সম্পর্ককে এক চিরন্তন প্রীতি-ভক্তি-বন্ধনে পরিণত করিলেন।

বৈরাগ্য-ধূসর অন্তঃকরণ লইয়াই তাঁহাকে বিবাহ করিতে ও সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইল। বিবাহের পূর্বে সন্ন্যাসেরও এক পালা অভিনীত হইল। ভগবানের কোন নিগূঢ় ইচ্ছা তাঁহাকে এই ঘুরপথে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত করিল। সংসারাশ্রমের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও উহার পিছনে সদা-বর্তমান বৈরাগ্যসাধনই কি এইভাবে তাঁহাকে উহার অমোঘ আমন্ত্রণ জানাইল? তাঁহার নবদাম্পত্যসম্পর্কেও আত্মোৎসর্গ ও কর্তব্যপালনের কঠোরতা জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রথম প্রেমের কুসুমিত পথও এই তরুণ সাধকের নিকট দুরূহ কর্তব্যের কণ্টকাকীর্ণ রূপে প্রতিভাত

হইল। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেমিক তাঁহারা সমস্ত পথের শেষেই ভগবানের অদৃশ্য অঙ্গুলিসংকেত অনুভব করেন। বিবাহিত জীবনে সাংসারিকতা ও বিদ্যাভ্যাস কোনটাই বিশেষ অগ্রসর হইল না—অন্তরের এক অনির্দেশ্য শূন্যতাবোধ কোন্ পরম প্রাপ্তির জন্য পূর্ণতা-প্রত্যাশী হইয়া রহিল।

ইহার পর তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা সমুদ্রাভিমুখী নদীর ন্যায় শত শত পথ] ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বহু সাধকের দর্শনলাভ ও তাঁহাদের নিকট নির্দেশগ্রহণ তাঁহার ধর্মপিপাসা-নিবৃত্তির একান্ত আকূতির পরিচয় দিয়াছে। অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত এবং তাঁহার গুরুর আদেশ লইয়া তিনি দীক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। শত শত নর-নারী তাঁহার দেবচরিত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরমার্থ লাভের জন্য তাঁহার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। দীক্ষা, মন্দিরসংস্কার, প্রতিষ্ঠা ও নামপ্রচারের জন্য সর্ব ভারতে অবিশ্রান্ত পর্যটনের মধ্য দিয়া তাঁহার নিজ সাধনাও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার অন্তর লীলার এক একটি দিব্য স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ধর্মসাধনার এক দীপালী মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল। সহস্র সহস্র ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁহার পবিত্র চরণধূলির জন্য পাগল হইয়া উঠিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পর এইরূপ অসংখ্য ভক্তবৃন্দের আত্মহারা ধর্মভাবুকতার দৃশ্য আর দেখা যায় নাই। ইহার মধ্যে ধর্মগ্রন্থরচনা, লুপ্তশাস্ত্রোদ্ধার, ধর্মপত্রিকাপ্রচার, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের পুনঃ-প্রচলন। শিষ্যদের মনে ধর্মপিপাসা, উদ্দীপনা, সংঘশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা দেব ও সমাজ-সেবার আগ্রহ-সঞ্চার তাঁহার অফুরন্ত শক্তি ও বহুমুখী সক্রিয়তার আশ্চর্য নিদর্শনরূপ যুগচিত্তে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছে। অথচ এরূপ বিরাট ও বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়াও তিনি নির্লিপ্ত, ভাবতন্ময় ও

ভগবৎসাধনায় অনন্যমনা হইয়াই বিরাজমান আছেন। তাঁহার জীবনে ও সাধনায় সর্ববিধ আপাত-বৈসাদৃশ্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। গীতার নিষ্কাম কর্মসাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে, জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্য সম্মিলন-স্থলরূপে তিনি যুগের নিকট এক পরম ক্ষেমঙ্কর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

(৪)

তাঁহার এই সুদীর্ঘ সাধনার মধ্যে কয়েকটি মুহূর্ত তাঁহার ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনের সাক্ষ্যরূপ অবিস্মরণীয় মহিমায় দণ্ডায়মান। তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে শিব-দর্শন, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, ১৩২৪ সালে ভূদেব চতুষ্পাঠীর ছাত্রাবস্থায় ধ্যানযোগে শিবের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকরণ ও তাঁহার নিকট বাণীলাভ, সেই বৎসরই দোলপূর্ণিমার পর ডুমুরদহে অনির্বচনীয় দেবোপলব্ধি ও গুরু, গুরুপত্নী এবং পত্নীকে সেই বর্ণনাতীত, বাচ্যাতীত অলৌকিক রহস্য প্রদর্শন, মৌনকালে নিয়মিত দৈববাণী ও পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশে নাম-প্রচার-ব্রত গ্রহণ—প্রত্যক্ষ দর্শনের এই কয়েকটি পরম জ্যোতির্বিন্দু তাঁহার সাধনা-আকাশে অত্যুজ্জ্বল তারকারাজির ন্যায় অক্ষয় দীপ্তি বিকিরণ করিতেছে। সাধারণতঃ শ্রীশ্রীসীতারামদাস তাঁহার দিব্য উপলব্ধির প্রকাশ সম্বন্ধে অত্যন্ত মিতভাষী ও সংযমশীল। তাঁহার যাত্রাপথে নাদবিন্দুচিহ্নিত অপূর্ব আনন্দের কথা তিনি মাঝে মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন রহস্য তিনি আপনার অন্তর মধ্যে কঠোর মৌননিরুদ্ধই রাখেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌সংযম ও আত্মগোপনশীলতার যবনিকা ভেদ করিয়া যেটুকু আলোকের আভাস তিনি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য

সহজেই অনুমেয়। যিনি একটি সমগ্র দিব্য লীলানাটক আমাদিগকে দিতে পারিতেন তিনি কয়েকটি খণ্ডিত দৃশ্যের অংশমাত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আমাদের জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করার পরিবর্তে আরও উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। হয়ত আমাদের গ্রহণশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি তাঁহার বদ্ধমুষ্টির ফাঁক দিয়া কয়েক বিন্দু অমৃত আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার উন্মুক্ত অঞ্জলির দান আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম না জানিয়াই তাঁহার এই কল্যাণকামী কার্পণ্য।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের সাধনাক্রম এখনও নূতন নূতন বাঁক ফিরিয়া চলিতেছে; তাঁহার অগ্রগতি এখনও পূর্ণ বৃত্তের নিশ্চলতায় স্থির হয় নাই। এখনও তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রতীক্ষমান। চারিদিকে বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা করিয়া তিনি অতর্কিতভাবে এই অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় আত্মসংহরণ করিয়া চলেন। তাঁহার আরব্ধ কার্যের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্নসূত্র করিয়া কেবল সাধনাশক্তি ও অন্তরের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার রুদ্ধ দ্বারে ব্যাকুল করাঘাত করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। তিনি তাহাদের সান্ত্বনার জন্য বলেন যে, তাঁহার আশীর্বাদ তাঁহার লোকদের সর্বদা বেষ্টন করিয়া আছে ও তাঁহার সাধনার ফল তাহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। এইভাবে তিনি আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতাকে দেহ হইতে দেহাতীতের দিকে ফিরাইবার জন্য সর্বদা উৎসুক। আত্মিক শক্তি যে দেহনিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে পারে, সাধনাপূত কল্যাণকামনা যে বাহ্যসংযোগের ঊর্ধ্বগামী, মনের যোগ যে দৈনিক বিচ্ছেদের সমস্ত শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে পারে, এই অভয়বাণী তিনি বারবার

আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন। ভগবান্ যেমন মানুষকে নিজের উপর ছাড়িয়া দিয়া অদৃশ্য কল্যাণহস্তে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁহার আশীর্বাদও তেমনি অন্তরাল হইতে অভেদ্য বর্মের ন্যায় আমাদের সমস্ত দুর্বলতাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি আঁধার ঘরের রাজাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন ও রহস্যনিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই তাঁহার সহিত লীলাবিলাসে নিমগ্ন আছেন। আমরা রুদ্ধশ্বাসে, অফুরন্ত ধৈর্যের সহিত, আমাদের সমস্ত অনুভব-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া এই অপূর্ব লীলার পরম পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করিব ও শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় এই লীলার যতটুকু আভাস-ইঙ্গিত আমাদের মনকে ছুঁইয়া যাইবে সেই স্পর্শরসেই আমাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিব। ইতি—

সেবকাধম—**শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলাবিলাস

ওঁ চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদ-কলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং, বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলাবিলাস

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হুগলী জেলায় ডুমুরদহ গ্রামে শ্রীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মাল্যবতী দেবী নামে এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করতেন। শ্রীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় একাধারে নাট্যকার, সুরজ্ঞ, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, ও ভক্ত। বাহ্যিক ব্যবহারে তাঁর অন্তরাত্মার সব পরিচয় পাওয়া যেত না। বাড়ীতে শ্রীব্রজনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। লীলাচিন্তা আর শ্রীব্রজনাথ-বিগ্রহের সেবা, এই ছিল তাঁর প্রাণ। শ্রীমতী মাল্যবতী দেবী গুণে দেবীই ছিলেন। তাঁর পতিভক্তি ও দেবসেবার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীমতী মাল্যবতী দেবীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা হয়।*

যুগে যুগে কত মানুষ আসে এবং যায়। এই ত সৃষ্টির নিয়ম, ভাঙ্গা গড়া তাঁর লীলাবিলাস। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'—যাঁরা বলেছেন, তাঁদের দৃষ্টি স্বল্পপ্রসারী। কীর্ত্তিমানের অমরতা ক'দিনের! কিন্তু মহাকালের সর্বগ্রাসী স্পর্দ্ধাও পরাভূত হয় যাঁর কাছে, এমন লোক ত কচিৎ কখন দেখা যায়। অমৃতের অধিকারী পুরুষ দুর্লভ।

---

* দুই পুত্র—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দুই কন্যা—ভুদি ও হুদি।

অমৃতত্ব দান ক'রতে পারেন, সর্বসাধারণকে অমৃতত্বে অধিষ্ঠিত ক'রতে পারেন—"স মহাত্মা সুদুর্লভতমঃ।"

এমনই একজন শ্রীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র। মাতুলালয়ে কেওটায় (হুগলী) ভূমিষ্ঠ হলেন—১২৯৮ (বাংলা) সালে, ৬ই ফাল্গুন, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে, বুধবার বেলা ৮টায়, নাম দেওয়া হ'ল প্রবোধচন্দ্র।

কিছুদিন যায়। শিশু দামাল হ'য়েছে। শ্রীমতী মাল্যবতী দেবীর জ্বর। ডুমুরদহে ওপরের ঘরে শুয়ে আছেন, তেতলায় যাবার সিঁড়ির দিকে মাথা ক'রে। পিপাসা লেগেছে প্রবোধচন্দ্রের। ল্যাম্পের কেরোসিন গ্লাসে ঢেলে পরমানন্দে গলাধঃকরণ করলেন। তাঁর মেঝদি 'সুদি' চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওমা! খোকা কেরোসিন খেয়েছে।' সকলের মহাচিন্তা, তাই ত' কি হবে! খোকাটি নির্বিকার, 'গরল অমৃত হ'ল।'

১৩০৩ সালে ৩রা বৈশাখ ভোরে গর্ভধারিণী স্বর্গতা হ'লেন, কোলে ছ'মাসের কন্যা রেখে, কলেরা রোগে। আর এক মা[১] এলেন। তিনি নাবালিকা। দরকার হ'ল ছেলে মেয়ে মানুষ করবার লোকের। ভার নিলেন "জগ"। তাঁর জগদিদি স্নেহে যত্নে আদরেই মানুষ ক'রলেন। বড় ভাল ছেলে, কখনও জ্বালাতন করে নি। শুধু একদিন কোঁৎকানি দিয়েছিলেন জগদিদি। জগদিদির এ রেকর্ড অসাধারণ। তাঁর প্রতাপ বড় কম ছিল না।

জগদিদির একটা মাই প্রবোধচন্দ্র খেতেন, আর একটি মাই তাঁর কন্যা[২] খেত। জগদিদি রুটিতে গুড় মাখিয়ে মোমবাতির মত ক'রে পাকিয়ে দিতেন—তিনি খেতেন। তবে হাঁ, ঠাকুর দেবতার ভোগ

১ শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

২ মিন্তা।

না হওয়া পর্য্যন্ত এ শিশুকে কিছু মুখে দেওয়ানো যেত না। বলতেন—"আগে টাকুর দেল হ'ক, তাল পল খাব।" ধীর শান্ত শিশু তখন থেকেই স্থিতধী, কিন্তু বড় চতুর। জগদিদি ব'লেছিলেন—"কিন্তু বাবা, পেবো বড় চালাক ছেলে, হাঁ-টি কখনও করে নি।" আমি বলি, জগদিদিওচালাক কম ন'ন, 'হাঁ'—না ক'র্তেই চিনেছেন। তাঁর ভাষায় তাঁর গর্ভধারিণীর স্মৃতি—'মা, তোর আকৃতি কিছু মনে নাই। বাল্যের শেষ ক্ষীণ স্মৃতিটুকু আছে—ঠাকুমা বৃন্দাবনে গেছেন, সংবাদ এসেছে বৃন্দাবনে অনেকে মারা গেছেন। তুই ঠাকুরমা-ও মারা গেছেন মনে ক'রে ভঁড়ার-ঘরের রোয়াকে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছিস—আমি মিন্থ খেতে গেলাম, তুই আমাকে সরিয়ে দিলি।'

একটু বড় হ'তেই কিন্তু দুষ্টামি দেখা দিল। তাঁকে এড়িয়ে কোনও জিনিষ রাখার জো নেই। শিশুর সন্ধানী চোখের দৃষ্টি সর্বব্যাপী, সর্বভেদী। মা[১] বলেন—'আমি যখন বারো বছর বয়সে এ সংসারে আসি, তখন পেবো চার পাঁচ বছরের শিশু। বর্ণ গৌর। সুন্দর চোখ-জুড়ানো ছেলে। অনেকেই বল্‌তো, এ ছেলে ডাক্তারবাবুর[২] মতই···হবে।" "ছেলেবেলায় স্বভাব ছিল শান্ত। কিন্তু এক এক সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটিয়ে ব'স্‌তো। আমি বাপের বাড়ী যাব, আমায় কিছুতেই যেতে দেবে না। যখন দেখলো তার আবদারে কেউ কান দিল না, তখন খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলো। আর এক সময় জালার মধ্যে মিষ্টির সন্ধান পেয়ে সারাদিন টুক্‌টাক্ চালাতে চালাতে সারা হাঁড়িটাই শেষ করে ফেলেছিল।"

হঠাৎ শিশুর মুখ ভার হ'ল। ব্যাপার কি? স্বপ্ন,—অশোক বনে

---

১ দ্বিতীয় মা।

২ শ্রীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন।

বন্দিনী সীতা, আর চেড়ীগণ তাঁকে লাঞ্ছনা দিচ্ছে। সে ব্যথা বেশ ক'দিন হৃদয় অধিকার ক'রেছিল।

যখন ছ'বছর বয়স, একদিন রাত্রে, তাঁর ভাষায়—'উপরে বড় ঘরে বাবা, মা, দিদি ও আমি সব শুয়ে আছি। দেখলাম—দক্ষিণ দিকের বড় জানালার কাছে শিব দাঁড়িয়ে আছেন। বাবাকে ব'ললাম্—"বাবা শিব দেখো।"

"কৈ শিব? কৈরে বেটা?"

"ঐ যে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

"কৈ?"

"ঐ যে।"

"শিব কি রকম বল দেখি?"

"সাদা রং, পরণে বাঘছাল, মাথায় জটা, তিনটা চোখ, বাঁ হাতে ত্রিশূল, ডান হাতে ডমরু।" যেমন দেখ্ছেন তেমনি বর্ণনা ক'র্ছেন সেই ছ'বছরের শিশু।

শৈশবের আর একটি অভ্যাস—'তীর ধনুক' নিয়ে খেলা ক'র্তেন। সত্যিকারের তীর ধনুক কোথায় পাবেন? তাই নকল তীর ধনু ক'রে নিতেন। একদিন ছাতির শিক্ ছুঁচলো ক'রে তীর তৈরী ক'রে নিয়ে খেলা ক'রছেন, উপরে তীর ছুঁড়ছেন। তীরটি নামার সময় বোন 'বেজো'র হাতে বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন।

ঐ সময়ে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। ১৩০৬ সালে মামার বাড়ী প্রসন্ন গুরুমশাই-এর পাঠশালায় পড়া আরম্ভ হয়। মামার বাড়ীতে পাঠ ও কীর্ত্তনের ধূম লেগেই আছে। নামে প্রেম, সেটা ত' চিরকালই। প্রায় রোজ নাম বেরুত। গান, শুন্লেই "ঐ বাজলো হরিনামের ডঙ্কা—ধো-ধো-ধো" ব'লে উলঙ্গ হ'য়েই ছুট্তেন। শৈশবের এই অভ্যাসটির

মধ্যে যেন তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের আলেখ্য ও পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের আলেখ্য বীজাকারে সূত্রাকারে নিহিত। ঐ সময়েই ব্যাণ্ডেল চার্চ ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'লেন।

শৈশবের পর কৈশোর এলো, যথারীতি ব্যাণ্ডেল চার্চ ইস্কুলে পড়াশুনা চ'ল্‌ছে। কিন্তু যাই ইংরাজীর পালা এল, অমনি মুস্কিল! ধাতে সইলো না। বাঙলায় পেলেন একশো, একশোর মধ্যে; কিন্তু ইংরাজী গ্রামারে যা পেলেন, সে আর ব'লে কাজ নেই।

মাসীমা ব্রত ক'র্‌তেন, তিনি মন্ত্র শুন্‌তেন। "ধর্মভাব গোড়া থেকেই ছিল। উপনয়নের পূর্ব থেকেই জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ক'র্‌তাম।"

তাঁর দাদা শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তিনি দু'জনেই মামার বাড় থেকে পড়াশুনা ক'রতেন। ১৩০৭ সালে "দাদা এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষা দেন। তাঁর বাক্‌স প্রভৃতি আমায় দিয়ে কেওটা ত্যাগ করেন। আমার খুব আনন্দ। দাদা ব'ল্‌লেন—'আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুই সব পাবি, তোর খুব আনন্দ হবে—কেমন?' উত্তর দিতে পারি না। দাদাকে ভয় খেতাম।" তাঁর যেমন ভ্রাতৃ-ভয় ছিল, তেমনি ভ্রাতৃভক্তির-ও কোন অভাব ছিল না।

তাঁর ইংরাজীতে কোন রুচি নাই। আবার এদিকে বাবার মনে চিন্তা হ'ল—দুই ছেলে ইংরাজী শিখ্‌লে চাকরী ক'রতে যাবে, শ্রীব্রজনাথের সেবা হবে না। তাই বাবা দ্বিতীয় পুত্রকে পাঠালেন, হুগলি বালির টোলে শ্রীযাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মশাইয়ের কাছে। ঐ টোলেই তাঁর পরা ও অপরা বিদ্যার শ্রীগুরুদেবের প্রথম দর্শন পান। শ্রীগুরুদেব তখন ঐ টোলের স্মৃতির ছাত্র।

১৩১১ সালে উপনয়ন হ'ল। পড়াশুনা না হওয়ার জন্য এবং

কলাপ ব্যাকরণের অপ্রচলনের জন্য ছাড়তে হ'ল তাঁকে বালির টোল। বহুদিন গেল, এর মধ্যে তাঁর একটি বোন হ'য়েছে—নাম শৈল।

১৩১৩ সালে, ২৩শে বৈশাখ সংসারে একজন নতুন লোক এলেন—বৌদি[১]। তাঁর গুণ অনেক ছিল, সকলেই ভালবাসতেন। দেবরটিকে 'ভাই চন্দ্র' ব'লতেন। স্নেহও ক'রতেন যথেষ্ট।

ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখতে হবে। বাড়ী বসে থাকলে চ'লবে না। কোথাও পড়ার ঠিক হ'চ্ছে না। শেষে ১৩১৫ সালে বৈশাখে ভাবী গুরুর কাছে পড়ার জন্য উপস্থিত হ'লেন। ভাবী গুরু বসে আছেন "হাতে সেতার, দ্বিধা বিভক্ত কেশ সম্মুখে লম্বমান, প্রতিভা-উজ্জ্বল ললাট, অপূর্ব মুখের সৌন্দর্য্য, প্রাণ চিরদিনের জন্য চরণে লুটিয়ে প'ড়ল। প্রণাম।"

ভাবী গুরু। "আসুন আসুন! কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

তিনি। "ডুমুরদহ থেকে।"

ভাবী গুরু। "বসুন, তারকের মামার বাড়ী ডুমুরদহে নয়?"

তারক। আজ্ঞে হাঁ। তবে এখন আসি, ওবেলা আসবো।"

ভাবী গুরু। "আপনার নাম কি?"

তিনি। "শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

ভাবী গুরু। "আমার কাছে কি প্রয়োজন?"

তিনি। "শুন্‌লাম, আপনি টোল ক'রেছেন, যদি আমাকে আশ্রয় দেন।"

এইভাবে আলাপ পরিচয় হ'ল। ১৬ই আষাঢ়, পাঠারম্ভের দিন হ'ল। দুর্য্যোগে তিনি আশ্রয় দিতে পারলেন না। লিখে জানালেন

---

১ ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজবালা দেবী। তাঁর অগ্রজের পত্নী।

—"তোমার মত……ছাত্রকে আশ্রয় দেওয়া আমার ভাগে হ'ল না।" তাই বাধ্য হ'য়ে বাগড়ীতে প'ড়তে গেলেন। বাগড়ীর শ্রীতুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য মশাইয়ের আশ্রয়ে পাঠ চলে। কিন্তু পাঠ আর চ'লতেই চায় না। ভট্টাচার্য্য মশাই খুব ভালবাসতেন। পড়ার জন্য বাগড়ী ত্যাগ ক'র্‌লেন।

১৩১৬ সালে ১৩ই বৈশাখ দিগ্‌সুই-এ ভাবী গুরু শ্রীদাশরথি স্মৃতিভূষণ মশাইয়ের কাছে এসে আশ্রয় নিলেন, ছাত্র হ'লেন। ভাবী গুরুকে দাদা ব'ল্‌তেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আগে থেকেই ছাত্র ছিলেন, দু'জনে ভাবও বেশ জমে উঠল্‌। এই শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেমে ও তার মামাতো ভাই শ্রীশৈলেন্দ্রের ভক্তিতে অদ্যাপি ভাঁটা পড়েনি, বরাবর একটানাই চলেছে। তাদের প্রেম ও ভক্তি সীতারামের জীবনে একটি স্মরণীয় জিনিষ।" তিনি নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক ত' নিয়মতই ক'র্‌তেন। সন্ধ্যায় শিব-প্রণামও ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। শ্রীঠাকুরচরণ ভট্টাচার্য্যের (মুখোপাধ্যায়) বাইরের ঘরে চতুষ্পাঠী হ'ল। ভট্টাচার্য্য মশাইকে কাকা, ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা দেবীকে খুড়িমা ব'ল্‌তেন। এঁদের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। পড়া চ'ল্‌ছে, ১৩১৭ সালে আদ্যের আবেদন করা হয়, কিন্তু অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ১৩১৮ সালে তিনি ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

*　　　*　　　*

কৈশোরের একটি ঘটনা

প্রবোধচন্দ্র তাঁর বাবার সঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন, এক বিয়ে বাড়ীতে। গেঁয়ো গোলযোগে কারুরই খাওয়া হ'ল না। মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'র্‌লেন—

সেদিন একসঙ্গে অনেক লোকের
হ'য়েছিল কুপ্রভাত।
মস্ত বড় একটা বিয়ে,
সবে পেটভরে আসবে খেয়ে
দেখে কলা ব্যোমভোলা, হায় কেউ পেলে না চাটতে পাত ॥

বাবা বল্‌লেন ব্যাটা কবি হবে।

* * *

শ্রীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। মৃত্যু যে মৃত্যু নয়, প্রাণপ্রয়াণ উৎসব, তা শিখিয়ে দিয়ে গেলেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ। তিন কন্যা[১], তিন পুত্র,[২] দ্বিতীয়া পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ক'রে মহাপ্রস্থান ক'রলেন—১৩১৮ সালে ৩রা পৌষ অমাবস্যা তিথিতে।

সংসারে বিরাট পরিবর্ত্তন এল। তাঁর বড়দি ও বড় ভগ্নাপতি সংসারের সমস্ত ভার নিলেন। দিদিটি সাক্ষাৎ দেবী, ভগ্নীপতি সাক্ষাৎ দেবতা। তিনি যথারীতি চ'ল্‌লেন—দিগম্বইয়ে গুরুগৃহে।

---

১ কন্যা—শ্রীমতী সন্তোষকুমারী দেবী, শ্রীব্রজবালা দেবী ও শ্রীমতী শৈলবালা দেবী।

২ পুত্র—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দাশরথি স্মৃতিভূষণ পণ্ডিত, সাধক, কবি, বহুগুণের আকর। তাঁর কাছে পাঠগ্রহণ দীক্ষাগ্রহণ দুই-ই। ১৩১৯ সালের ২৯শে পৌষ ত্রিবেণীতে "সিদু দিদি"-র ঘরে শ্রীদাশরথি স্মৃতিভূষণ মশাই তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

তাঁর বিদ্যার্থী জীবন সেই সনাতন ভারতীয় ধারার অনুবর্ত্তন। সেই গুরুগৃহে বাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চর্য্যা, গুরুর সকল কাজে অংশ গ্রহণ, যাবতীয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাংসারিক বিষয়ে গুরুর আনুকূল্য বিধান, প্রাণপাত পরিশ্রম, অধ্যয়নে প্রগাঢ় নিষ্ঠা। তিনি উপমন্যু আরুণির মত গুরুসেবা ক'রেছেন ব'ল্লে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না। ইনি—গুরু আদেশ না ক'রতেই তাঁর কাজ ক'রতেন।

নিয়মিত ভাবে চলা ও দিনলিপি লেখা অভ্যাস প্রায় চিরদিনই। তখনকার মানসিক অবস্থা—"তোমারা সবাই মিলে আমাকে সংসার হতে দূর ক'রে দিতে পারো, গলাধাক্কা দিয়ে।" সংসারে তীব্র বৈরাগ্য। পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখছেন—"পরীক্ষা, তোমার চরণে দাসের শত শত প্রণাম। তোমা হ'তে যে উত্তীর্ণ হ'তে পারে, সে মহা ভাগ্যবান। সংসারটা শুধু পরীক্ষার ক্ষেত্র, কেবল পরীক্ষা—পরীক্ষা! পিতা পুত্রকে পরীক্ষা করছেন, আবার পুত্র পিতাকে পরীক্ষা করছে। স্বামী স্ত্রীকে পরীক্ষা করছে, আবার স্ত্রী স্বামীকে পরীক্ষা করছে। গুরু শিষ্যকে, আবার শিষ্য গুরুকে। সংসারে জন্মগ্রহণ শুধু পরীক্ষা দেবার জন্য। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে, তাহ'লে তোমার আদরের সীমা নাই। যদি অনুত্তীর্ণ হই, তাহ'লে আর কি বিষম ব্যাপার! এ পরীক্ষার চেয়ে আর একটা বিষম পরীক্ষা আছে। সে পরীক্ষক আবার সমস্ত জানতে পারেন। তাঁর কাছে গোঁজামিল চলে না, দেখে লেখা চলে না। তার উত্তীর্ণের ফল অক্ষয় স্বর্গ, না হয় তো

অনন্ত নরক। সে পরীক্ষা বড় নিকট। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও। দেরী নাই—দেরী নাই।"

জীবন খুবই নিয়মিতান্ত্রিকভাবেই চ'লেছে। ডাইরি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে—"১৩১৯ সাল (বাং) ১৮ই চৈত্র, স্নান—সন্ধ্যা—পূজা ইত্যাদি। আদিত্যদাদাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আহারাদি নিদ্রা। প্রবোধ কলকাতায় যায়। ব্যায়াম করিলাম। অমরদাদার বাড়ী হইতে রুদ্রাক্ষ আনিলাম ইত্যাদি। রাত্রে মালা গাঁথিলাম।"

এদিকে তীব্র বৈরাগ্য! বিয়ের কথা শুনে একেবারে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্লেন—"উল্টা বুঝিলি রাম,—আমি চিরকাল বিবাহ সম্বন্ধে অমত করিয়া আসিতেছি, কিন্তু পাকেচক্রে এমন দাঁড়াইয়াছে যেন আমার মতেই দাদা[1] মত দিয়াছেন। কি অন্যায় ব্যাপার! আমি বিবাহ করিব না।"

বর্দ্ধমানে পরীক্ষা দিতে যান। সেখানে তাঁর পূর্বপরিচিত নরেনদার সঙ্গে দেখা হয়। সংসার ত্যাগের ইচ্ছা হয় কিন্তু ছোট বোনের বিবাহ হয় প্রতিবন্ধক। ১৩২০ সনে ছোট বোনের বিয়ে হ'য়ে গেল। গুরুদেবের কাছে কাশী যাওয়ার প্রস্তাব ক'রলেন, সম্মতি পেলেন না। গুরুদেব ব'ললেন—"সংসারে থেকে নিজেকে তৈরী ক'রে তবে সংসার ত্যাগ করতে হয়, নচেৎ পতনের সম্ভাবনা যথেষ্ট। এখানে পরিচিত লোক আছে, অন্যায় ক'রতে সঙ্কোচ আসবে কিন্তু অন্য স্থানে অসঙ্কোচে অন্যায় কর্ম করা যাবে।" হ'ল না সংসার ত্যাগ করা।

ধর্মভাব চিরদিনই ছিল—"উপনয়নের পর হ'তে নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক করতাম। ভাত খেতে বসে কথা কইতাম না। একাদশী, শিবরাত্রি,

১ শ্রীদাশরথি স্মৃতিভূষণ।

জন্মাষ্টমী-ব্রত উপনয়নের পূর্ব থেকেই আরম্ভ করি। মাকে, দিদিকে শিবপূজাদি শিখিয়েছিলাম। আচার্য্যত্ব গোড়া থেকেই ছিল।"

তীব্র বৈরাগ্য নয়, সুতীব্র বৈরাগ্য! এতেও তাঁর মুখে শোনা যাচ্ছে—"যখন কোন্‌টা ভাল, কোনটা মন্দ বোঝবার সামর্থ্য এল, তখন দেখ্‌লাম জীবন বিপথে চ'লে গেছে। প্রবল সংগ্রাম ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যথাকালে সন্ধ্যা, আহ্নিক, সৎগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি চলিল।"

জীবনটা খুবই নিয়মতান্ত্রিক ছিল। নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা মনে করলে মনে হয়, নিয়মই তাঁর অনুবর্ত্তন করেছে চিরকাল। ডাইরীর পাতায় দেখা যায়—"সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত, ৯টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত, ১টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত, ৫টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত রুটিন বেঁধে পাঠ, সন্ধ্যা-পূজা, পাকাদি, শাস্ত্র আলোচনা, অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম, ডায়েরী লেখা সব সময়-ই চলেছে, শরীরও বিদ্রোহ করছে।"

সময়ে ডায়েরী লেখা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। ডাইরীতে কোন সঙ্কোচের ইঙ্গিত নেই। তাঁর ডাইরীর পাতা তুলে দিচ্ছি—"প্রতি-পালিত নিয়ম—মিথ্যা কথা বলি নাই, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন কথা মনে উদয় হয় নাই। অপ্রতিপালিত নিময়—যথাসময়ে উঠি নাই। পাঠে মনঃসংযোগ করি নাই। শরীর অসুস্থ। পান দোক্তা ছাড়ি নাই।"

বৈরাগ্য! বৈরাগ্য! বৈরাগ্য! বৈরাগ্য তাঁর সেবা নিয়মিত ভাবেই করে চ'লেছে। গুরুদেবের জমি রোয়ান, কৃষাণ দেখা, বেড়া বাঁধা, বাগান কোদ্‌লানো, জমি সংগ্রহ—এই সব বিষয়-সেবা ও গুরুসেবা মহাব্রতে পরিণত হয়েছে তাঁকে পেয়ে। এক একবার মনে হয় তাঁর জীবনের এই অধ্যায়—একি আদর্শ শিষ্যরূপে লীলা? না, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

গুরুদেব কল্‌কাতায় থেকে নকুলেশ্বরতলায় শ্রীবিপিন বিহারী বেদান্তভূষণের নিকট বেদান্ত পড়েন। শিষ্যটি থাকে গুরুগৃহে। শেষে অসুবিধা দেখে শিষ্যটিকে ও শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিঘাটে উপেন্দ্র-কুটিরে কিছুদিন রাখেন। এই সনেই সাধন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

১৩২১ সনে সাধন সমিতিতে গুরুদেবের টোল চ'লতে থাকে। ইনি গুরুকে ছায়ার মত অনুসরণ ক'রে চ'লেছেন। মহাসমারোহে পরা ও অপরা বিদ্যার পাঠ চ'লেছে। এদিকে দেশহিতৈষণাও কখন তাঁকে আশ্রয় ক'রেছে কেউ টের পায়নি। ডুমুরদহে "রাধারমণ সম্মিলনী সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হ'ল—ইনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী। পথঘাট পরিষ্কার করা, রোগীর শুশ্রূষা করা, শবদাহের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রছেন। এই যে দেশসেবা—এটা তাঁর কাছে কর্মযোগ। শ্রীমদ্‌বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজীও একজন কর্মী এবং তাঁর বন্ধু—অভিন্ন আত্মা। এই সমিতির প্রধান উদ্‌যোক্তা রাজেনবাবু তিনি তখনই প্রবোধচন্দ্রকে চিনে ফেলেছিলেন। তিনি যুবক প্রবোধ চন্দ্রকে 'দেবতা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রলেন।

* * *

এতদিন বিয়ের কথা আলোচনাই হ'চ্ছিল। আজ তা কাজে রূপ পেতে চ'লেছে। ১৩২২ সালে বৈশাখ মাসে আশীর্বাদ হ'ল। মহা ফ্যাসাদ্। শরীর খুবই খারাপ, বুক সাঁই সাঁই করে—একটা বালিকার জীবন কেন নষ্ট হবে? পলায়ন—"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে।"

পলায়নের ঘটনা একটু খুলে বলা অসঙ্গত হবে না। সেদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ, একাদশী তিথি। গুরুদেব নিত্যানন্দপুর যাচ্ছিলেন। তাঁকে

প্রণাম ক'রে তাঁর পদধূলি নিলেন। তিনি জান্‌লেন গায়ে হলুদের দিন হ'য়েছে, প্রবোধ ডুমুরদহে যাবে। প্রবোধের মতলব কিন্তু অন্য রকম।

সকলকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন, কিন্তু ভাবী সহধর্ম্মিণীটির চোখ এড়াতে পারেন নি। তিনি তাঁর মা'র কাছে গিয়ে ব'ল্‌লেন—'কুটাইয়ের কাকা কেন এ রাস্তা দিয়ে ডুমুরদহে গেল'। পরে পলায়নের কথা প্রকাশ হ'লে মেয়ের মা'র চিন্তার অবধি নেই। ছেলের দাদাটি তাঁকে আশ্বাস দিলেন—"আমি ঐ মেয়েই নেব। বিয়ে হবেই।" মেয়ের মা'র কিছু ভার কম্‌লো। গুরুদেবের মনেও কি চিন্তা হয় নি?

প্রবোধচন্দ্র ত্যালাণ্ডু বা মগরা ষ্টেশনে না গিয়ে, চলে গেলেন একেবারে ত্রিবেণী। কাটোয়ার টিকিট করেন। সঙ্গে একখানি চাদর, একটা টাকা, ছোট একখানি গীতা।

ত্রিবেণী থেকে কাটোয়া। অপরিচিত স্থান। কে একজন ব'ললেন, "রাধারমণ সেবাশ্রমে" যান। বোধ হয় পথও দেখিয়ে দিলেন বা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

সেবাশ্রমে এসে দেখা নরেনদার সঙ্গে। নরেনদা তখন সাধু, গৈরিকধারী। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তিনি ৺যাদব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছাত্র এবং প্রবোধচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন। খুব বুদ্ধিমান। উভয়ে একসঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৩১৯ সালে বর্দ্ধমানে ব্যাকরণের মধ্য দিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। নরেন্দ্রনাথও কাব্যের মধ্য দিতে এসেছিলেন। প্রাণ বৈরাগ্যে পূর্ণ, সংসার ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত। তখনই বর্দ্ধমানে সংসারত্যাগের সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছিলেন।

তাঁর কথা মত তিনি সংসারত্যাগ ক'রেছেন, এ সংবাদ পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার দেখা হ'ল, দেখা হ'তেই তিনি: "আরে প্রবোধ!"

ইনি : "নরেন দাদা !" পরস্পরকে পেয়ে খুব আনন্দ !

স্বামী নরেন্দ্রনাথ : "কবে সংসারত্যাগ ক'রেছ ?"

ইনি : "আজই ।"

"আমার সংসারত্যাগের কথা জানো ?"

"হাঁ"

"সঙ্গে কি আছে ?"

"কিছু নাই ।"

"আমার বড় কম্বল আছে। তাতে দু'জনে শোব ।"

পরে সেখানে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। কুলদাপ্রসাদ বোধ হয় সেবাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল "ভাগবতরত্ন"।

সে রাত্রি আনন্দেই কাটলো। সাধু নরেনদা ভাল বক্তৃতা করতে শিখেছিলেন, ৺কাশীতে পাতঞ্জলদর্শন পড়েছিলেন। তিনি বক্তৃতা করলেন। ভাগবতরত্নও বক্তৃতা ক'রলেন।

কুলদাপ্রসাদ প্রবোধচন্দ্রকে ব'ল্লেন "আমরা দর্শনের টোল ক'রছি, দর্শন পড়ো।"

তিনি : "পড়বার জন্য সংসার ত্যাগ করি নি।"

"তবে আমার মাসিক পত্রের সম্পাদক হও।"

"না।"

"তবে অবতার হও।"

"অবতার কি ক'রে হব ?"

"সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমরা তোমাকে অবতার ব'লে প্রচার ক'রবো।"

"না, আমি অবতার হ'তে চাই না।"

মল্লিক মশাই নিরস্ত হ'লেন।

বাজার থেকে গেরিমাটি এনে কাপড় ছোবানো হ'ল। চুণ দোক্তা খেতেন, দোক্তা সংগ্রহ ক'রলেন। চুঁচুড়ার ডাক্তার প্রসাদ মল্লিকের পুত্র, দাদা বঙ্কিমের সহপাঠী ব্র্যাঞ্চ স্কুলে একসঙ্গে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি ব'ললেন, "তুমি বঙ্কিমের ভাই নও?"

সমূহ বিপদ! "যদি দাদাকে খবর দেন।" নরেনদাকে ব'লে জুড়নপুর পালালেন। কথা রইল, নবদ্বীপে একসঙ্গে মিলিত হবেন। পরে পুরীধামে যাওয়া হবে।

জুড়নপুর কালীতলায় যাওয়া হ'ল। গঙ্গায় কম জল। সাঁতরে পার হ'লেন। জুড়নপুরের কালীতলা মনোরম স্থান। সেবাইত ভদ্রলোকের সৌজন্য অপূর্ব্ব! কছুতেই ছাড়লেন না। সেখানে তিন দিন থাকতে হ'ল। কি যত্ন তাঁর। একদিন একটি মায়ী চারটি পয়সা দিতে এলেন। ব'ল্‌লেন—"গাঁজা খেও।"

"গাঁজা তো খাই না।"

"তবে রসগোল্লা খেও।"

"রসগোল্লা খাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুই নি।" নাছোড়বান্দা! নিতে হ'ল।

জুড়নপুরের কালীমাতার পূজক, ইনি পুরী যাবেন শুনে ॥• আনা পয়সা দিলেন।

নবদ্বীপ যাত্রা ক'রলেন। পথে জল পিপাসা হ'ল। একজন ব্রাহ্মণকে ব'ল্‌লেন। তিনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে কাঁটাল প্রভৃতি সহ জল দিলেন।

বাইরে বেরুলে খাবার কষ্ট হওয়ার কথা। দেখা গেল বিপরীত ব্যাপার! খাবার যেন সাজান আছে!

কাটোয়া হ'য়ে নবদ্বীপ এলেন। সেখানে নরেনদার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে উভয়ে কলকাতা রওনা হ'লেন, পুরীধাম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। খামারগাছি ষ্টেশনে ফকিরের দাদা নারাণ মোদক পাশের গাড়ীতে উঠ্‌ল। ভারী বিপদের কথা। নারাণ যদি কোন রকমে টের পায় তা হ'লে টেনে নামিয়ে নেবে! তার সঙ্গে 'বেয়াই' সম্বন্ধ পাতানো। যথেষ্ট সম্প্রীতি। তার কনিষ্ঠ ফকির এঁর সমবয়সী!

মুড়িশুড়ি দিয়ে শুয়ে বা বসে আত্মগোপনের প্রচেষ্টা চ'লছে। যাক্, শ্রীভগবানের কৃপায় নারাণ কোনও ষ্টেশনে নেমে গেল। এঁরা হাওড়ায় পৌঁছালেন। নরেনদা ব'ল্‌লেন, "আড়ষ্ট হ'য়ে থেকো না।" ইনি কিন্তু জড়সড়।

নরেন কোলাঘাটের দুটি টিকিট ক'র্‌লেন। গাড়ীতে ওঠা হ'ল। খড়্গপুরে চেকার নামিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে থাকা হ'ল। নরেনদা খাবার কিছু কিন্‌লেন। সে রাত্রি ষ্টেশনে কাটলো। পরদিন সকালে সীতারামজীর ঠাকুরবাড়ীতে যাওয়া গেল। মধ্যাহ্নে অন্ন ও বড় বড় রুটি প্রসাদ পেয়ে আবার ষ্টেশনে ফেরা হ'ল।

নরেনদা আবার কাছের কোন ষ্টেশনের টিকিট ক'র্‌লেন। টিকিটের উদ্দেশ্য, কোনও রকমে গাড়ীতে ওঠা।

বালেশ্বরে টিকিট-চেকার ধরলে, বল্‌লে, "কানা নয়, খোঁড়া নয়, বিনা টিকিটে গাড়ীতে যাওয়া!" নামিয়ে দিলে না কিন্তু।

পুরীধামে নামা হ'ল। গেটে টিকিট চাইলে। টিকিট নাই শুনে পুলিশকে ব'ললে, "পাকড়ো"। পাকড়াতে হ'ল না, ওঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। সব টিকিট নেওয়ার পর প্রশ্ন করলে, "সঙ্গে টাকা আছে?" এঁর কাছে ।৷৹ আনা ছিল, দিলেন। "নরেনদা-র পুঁটুলি খুলে বই-এর পাতা দেখলো, শেষে নরেনদার কৌপিনের পেছন থেকে ২

টাকার বেশী বের ক'রল, নিলে না। দিয়ে দিল। বললে, "যাবার সময় হেঁটে যেও।"

পুরীধামে নেমে খুব আনন্দ হ'ল। সোঁ সোঁ করছে ঝাউগাছের হাওয়া। সমুদ্র দেখেও প্রভূত আনন্দ হ'ল। শ্রীশঙ্কর মঠে নরেনদা আশ্রয় নিলেন। সে সময় চন্দনযাত্রা। মধ্যাহ্নে প্রসাদ, রাত্রে প্রসাদ। রাত্রে জগন্নাথের ঘিভাত থাকতো, সে যেন অমৃত! কুমড়োর তরকারী প্রসাদ।

নরেনদার কথামত মাথা মুড়ানো হ'ল।

ইতঃপূর্ব্বে নরেনদা "কেন সংসার ত্যাগ করে এসেছো" ইত্যাদি সব কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইনি সব কথা বলেন।

৩।৪ দিন পর নরেনদা বলেন, "দেখ, একটি বিধবা তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে কতদিন ধরে আশা পোষণ ক'রে আসছেন, একবার সে কথা ভাবো! তোমার দাদার বুকের অসুখ; যখন তোমার পত্র পাবেন, তখন তাঁর কি অবস্থা হবে ভাবো! এই বিয়েতে তোমার গুরুদেব আছেন, তাঁর ইচ্ছা বিয়ে হয়, তুমি চলে আসাতে তিনি অপদস্থ হয়েছেন, ভেবে দেখ।"

ইনি উত্তর দেন, "আপনি এসব কথা কেন বল্‌ছেন? আমি ভাববো না!"

তিনি বল্‌লেন, "তোমায় ভাবতেই হবে।" খুব জোর দিতে লাগলেন।

এবার উত্তর হ'ল, "আমি আপনার প্রত্যাশায় বাড়ী থেকে বের হই নি। আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবো।"

তিনি তথাপি বলতে থাকেন, "তুমি ভাবো।"

এইরূপ ভাবে জোর দেওয়ায়, সত্যই সকলের কথা মনে পড়তে

লাগ্‌লো। একদিন রাত্রে বসে বসে ভাব্‌ছেন, নরেনদা পায়চারী করছেন আর মনে মনে বক্তৃতা করছেন। (এইরূপ করা তাঁর অভ্যাস ছিল)। সহসা প্রশ্ন করলেন, "কি ভাব্‌ছো?" ইনি উত্তর দেন, "ভগবান্।" তিনি বলেন, "হাঁ, ভগবান্ বৈ কি!"

যাই হোক্, এইভাবে বিবাহে অনিচ্ছুক বৈরাগ্যপ্রবণ যুবকের চিত্তে ভাবনা এনে দিয়ে নরেনদা বল্‌লেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে, দাশুদাদার (অর্থাৎ গুরুদেবের) কাছে ক্ষমা চেয়ে সে বিধবাকে বুঝিয়ে সংসার ত্যাগ ক'রো, আমার সঙ্গেই ৺কাশী যেয়ো।"

এর পূর্বে একদিন পুরীতে প্রবোধচন্দ্র শ্রীগুরুর পদরজঃ খাচ্ছেন (পদরজঃ সঙ্গে ছিল), নরেনদা বললেন, "কি খাচ্ছ?"

"গুরুদেবের পদরজঃ।"

"পদাঘাত করে পদরজঃ!"

এইভাবে নরেনদা এঁকে আয়ত্ত করে ফেললেন। প্রবোধ ডুমুরদহ আসবার কথায় সম্মত হলেন। নরেনদা তৎক্ষণাৎ বের হলেন।

সেই ভাবেই কলকাতা। তথা হতে মগরা। মগরার পুলের কাছে শিবুর জেঠামশায় বিনোদ মোদকের দোকান ছিল। বিনোদ দেখে বললেন, "তোমর খুব আক্কেল তো?"

আবার মত ফিরে গেল!

নরেনদা বোঝাতে লাগ্‌লেন, "তুমি যদি ফিরে না যাও, চিরদিন অনুতাপ ক'রতে হবে।"

অগত্যা তাঁর মতে মত দিয়ে ত্রিবেণীতে ট্রেনে চ'ড়ে খামারগাছি নেমে ব্রজনাথের বাটী প্রত্যাবর্ত্তন।

পুরী থেকে নরেনদা গুরুদেবকে পত্র দিয়েছিলেন, "প্রবোধের

বন্ধ্যত্যকে বিবেকে পরিণত ক'রে শীঘ্র নিয়ে যাচ্ছি!" নরেনদা তাঁর কথা রেখেছিলেন।

এক একাদশীতে পলায়ন, পর দ্বাদশীতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যাবর্ত্তন।

পাত্র ভেবেছিলেন, বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ।

দাদা কন্যার মাতাকে সংবাদ দেন, "কোন চিন্তা নাই, সে যাবে কোথা? মেয়ে ষোল বছরের হ'লেও নেবে।" অতএব তিনি নিশ্চিন্ত।

ফিরে আসার সংবাদ দাদা সকালেই দিগ্সুই পাঠান। নরেনদা ও প্রবোধও পরে দিগ্সুই যান। চতুর্দ্দিকে খুব আনন্দ।

খুড়িমা (অর্থাৎ পাত্রীর মাতা) বল্লেন, "বাবা ছেলে! বাবা!"

ইনি বলেন, "আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, পালাবো।"

ডুমুরদহে ফিরে আসা হ'ল। রাজেনকাকার (অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথ রায় বন্দ্যোপাধ্যায়) উদ্যোগে তাঁর বৈঠকখানায় একটি সভা হয়। সেই সভায় নরেনদা ৩।৪ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—যুবকগণের সংসার ত্যাগ না করে সংসার করা কর্ত্তব্য, বিবাহ করা, মাছ খাওয়া উচিত। উত্তমাশ্রমের ব্রহ্মচারীরা আসেন। উত্তমাশ্রমে নরেনদাও যান। উত্তমানন্দ স্বামী তাঁকে তাঁর লেখা গীতার পাণ্ডুলিপি দেখান। মাছ খাওয়ার কথা ওঠে। নরেনদা বলেন, অধিকারী বিশেষের কথা।

নরেনদার সঙ্গে এঁর দাদা বঙ্কিমের খুব সৌহার্দ্দ্য হয়। পরে চ'লে যান। দাদাকে পত্র দেন, "আমার বিজ্ঞানপাদ নাম হয়েছে।" কিছুদিন পরে শোনা যায়, তিনি দেহত্যাগ ক'রেছেন।

* * *

যাক্, বিয়ে তো হ'য়ে গেল। বধূ দিগ্সুই-এর ৺ঠাকুর চরণ

ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবী। বিবাহ হ'ল অগ্রহায়ণে। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে নাম পাল্‌টে রাখা হ'ল "কমলা।"

পাল্‌কিতে চলেছেন বর কনে। বর প্রশ্ন কর্‌ছেন ঃ

"বিয়ে না হ'লে কি হ'ত?"

"বিয়ে ক'রতাম না।"

"হিন্দুর ঘরে তা'তো চলে না।"

উত্তরে সে বল্‌লে, "মরে যেতুম।"

"আমি যদি ম'রে যাই?"

" 'সে' তুমি মরবে না। মা সিদ্ধেশ্বরীকে মানত্ ক'রে পূজা দেওয়া হবে—তুমি মরবে না।"

"১০।১১ বৎসরের বালিকার মুখে এই কথাগুলি শুনে প্রাণের ব্যথা দূর হ'ল। বিয়ে না হ'লেও সে মরণে কৃতসঙ্কল্প ছিল"—এই হ'ল প্রথম সম্ভাষণ।

* * *

তাঁর গুরুগৃহে বাস ঠিকই আছে। প্রয়োজন মত ডুমুরদহে আসেন। সেই অগ্রহায়ণ মাসে গুরুদেবের সঙ্গে ৺পুরী যান। গুরুদেব, জ্যেষ্ঠ-পুত্র শ্রীশঙ্করের* কোষ্ঠী একজন জ্যোতিষকে দেখান। "তিনি শঙ্করের ফাঁড়ার কথা বলেন।" শিষ্যটির জন্মলগ্ন ঠিক নেই ব'লে অনেকেই মনে ক'রতেন। ১৮।২০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় নি। ইনি লগ্নের কথা ব'ললেন। জ্যোতিষী মশাই বাসস্থানাদি সব বলে দিলেন। ইনি ব'ল্‌লেন—"মীন লগ্ন হ'লে লেখাপড়া হ'ত।"

জ্যোতিষ মশাই—"হোগা"।

ইনি—"কব হোগা?"

---

* শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়)

জ্যোতিষ—"জরুর হোগা।"

এখন আর একটি কর্ত্তব্য বেড়েছে—সহধর্ম্মিণীকে সহধর্ম্মিণী করা। তাই তাঁকে ধরতে হ'ল কলম।

"স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ অতি কঠিন সম্বন্ধ। স্ত্রী শুধু বিলাসের সামগ্রী নয়। স্ত্রী যদি শিক্ষিতা না হয়, তাহাকে শিক্ষিতা করিয়া লওয়া স্বামীর কর্ত্তব্য। এবং স্ত্রীরও কর্ত্তব্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সেইমত আচরণ করা। যে স্ত্রী শিক্ষাগ্রহণে বা আজ্ঞাপালনে অবাধ্য হয়, তাহাকে ত্যাগ করিলে পাপ নাই।"

* * *

"স্বামী দেবতাস্বরূপ। স্বামীর আজ্ঞা পালনীয়, স্বামী যাহাতে সন্তুষ্ট হ'ন সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্বামীর সঙ্গে কলহ করিতে নাই। নিজের অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বে ডুবাইয়া দেওয়া। পরপুরুষ দর্শন স্পর্শন করিতে নাই। গুরুজনদিগকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। দেবতায় ভক্তি। লজ্জাশীলতা। নিরহঙ্কার। সমস্ত প্রাণীকে স্নেহের চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য।"

শ্রীমতী কমলা দেবী সহধর্ম্মিণীই ছিলেন। উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা ছিল। আসনে বসিয়ে পতি পরমদেবতাকে পাদ্যাদির দ্বারা পূজা কর্'তেন। তাঁর অনুপস্থিত কালে চিত্রে পূজা চল্‌তো।

অতি সামান্য সম্পত্তির আয়, এই নিয়ে চলে সংসার। তিনি গুরুগৃহেই বেশী সময় থাকতেন। ১৩২৪ সালে গুরুদেব বলেন, "তোমার পড়াশুনা হ'চ্ছে না; লোকে বল্‌বে, দাশু ভট্টাচার্য্য বেড়াই বাঁধিয়েছে। ইচ্ছা করলে অন্যত্র যেতে পারো।"

বেদান্ত পড়ার স্থির হ'ল। বেদান্ত পড়ার জন্য চুঁচুড়ায় ভূদেব চতুষ্পাঠীতে এলেন। বেদান্ত পড়া হ'ল না, হ'ল বেদান্ত প্রতিপাদ্য

পুরুষের সাক্ষাৎকার। এ প্রসঙ্গ একটু বিস্তারিত বলা যেতে পারে।

১৩২৪ সাল, শীতকাল। গঙ্গার উপরে ভূদেববাবুর যে বাড়ী আছে, তার একটি দ্বিতলকক্ষে থাকেন তিনি এবং আর দুইজন সতীর্থ। নানা ব্যাধি একযোগে আক্রমণ করেছে। তিনি বেদান্ত পড়্ছেন—প্রাণে প্রবল পিপাসা। দুঃখনিবৃত্তি করতে হবে—এই হ'ল তাঁর বেদান্ত পাঠের উদ্দেশ্য। সন্ধ্যা-পূজা-পাঠে অনেক সময় যায়, অধ্যাপকমশাই তা পছন্দ ক'র্তেন না। বল্তেন, "সন্ধ্যা আহ্নিক কম কর, বই মুখস্ত কর, পাশ করতে পারবে।" তিনি অধ্যাপককে প্রণাম ক'র্তেন—বোধ হয় সাষ্টাঙ্গে। তাঁর গুরুভক্তি দেখে অন্যান্য ছাত্রেরা পাগল মনে ক'রত।

২৩শে পৌষ, রাত্রি ১২টা; ইংরাজী ১৯১৮, ৭ই জানুয়ারী সোমবার। আর দুটি বিদ্যার্থী নিদ্রামগ্ন। তিনি বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট। কতক্ষণ পরে আসন ত্যাগ ক'রে চোখ বুঁজে হৃদয়ে ধ্যান করছেন, এমন সময় দেখেন শিব আবির্ভূত হলেন। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে ডমরু। তিনি চমকিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলেন—"আপনি কে?"

উত্তর—"আমি তোর গুরু। বাল্যে এসেছিলাম, চিন্তে পারিস নি, আবার এসেছি।"

ইনি—"আপনি যদি গুরু তো ইষ্ট দর্শন করান।"

তিনি (শিব) পঞ্চমুখে—এঁর ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকেন। তাঁর (শিবের) স্কন্ধ হ'তে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি নাম্লেন। ইনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?"

উত্তর—"আমি তোর মা।"

তারপর দেবী এঁর ভিতর অবস্থিত সূক্ষ্ম মূর্ত্তি নিয়ে কানে ইষ্টমন্ত্র

এটুকু ধৈর্য্য হ'ল না ? তবে কি ক'র্তে সাধু হয়েছ ?" সভা নিস্তব্ধ। ভাষণ আপন ভাবেই চলেছে; ভাষণশেষে ক্ষেত্র নাথ রায় এঁকে যথেষ্ট তিরস্কার ক'র্লেন। ইনি স্বামীজীকে প্রণাম করে ব'ললেন—"কেমন হয়েছে ? আমি আগেই……।" স্বামীজী উঠে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ব'ল্লেন—"দরকার ছিল, ঠিক হ'য়েছে।"

গ্রাম ছিছিক্কারে ভরে গেল। এঁর দাদাকে একজন ব'ললেন—"তোমার ভাইয়ের কাণ্ড দেখ।" উত্তর এল—"অন্যে আড়ালে বল্ছে, সে না-হয় সামনে বলেছে।" ইনি কিন্তু নির্ব্বিকার। আপন ভাবেই বিভোর। কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই।

চল্ছে তাঁর গুরুগৃহবাস। প্রয়োজনে ডুমুরদহ যাতায়াত বাড়াতে হ'ল। একদিন গুরুশিষ্য শুয়ে আছেন টোল ঘরের দুটি চৌকিতে। আলনার লেপ কাঁথা ছিঁড়ে পড়ে গেল একেবারে শিষ্যের গায়ে।

গুরু—"কি প্রবোধ, চাপা পড়লে ?"

ইনি—"তাই ত দেখছি।"

১৩২৪ সালে দোলপূর্ণিমার পর থেকে সজাগভাবেই আছেন, আশ্বিন মাসে সিমলাগড়ে বাবুদের বাটীতে দুর্গাপূজা ক'র্তে যান। পূজা করে দিগ্সুই এসে ইনফ্লুয়েঞ্জা জর হয়, মা ডুমুরদহ থেকে এসে শুশ্রূষা করেন। পথ্য করে ডুমুরদহে যাবার পর অগ্রজের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। ২৮শে কার্ত্তিক উত্থান একাদশীতে অগ্রজ নশ্বরদেহ ত্যাগ ক'র্লেন। বৌদি মুখাগ্নি ক'রে এসে বিছানা নেন—অজ্ঞান, অচৈতন্য। ১৫ই অগ্রহায়ণ একটি শিশু-পুত্র* রেখে ইহলীলাসম্বরণ করলেন বউদি। সতী সাধ্বীকে

* শ্রীবিমল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। গুরুদেব শ্রাদ্ধ করালেন—ইনি হলেন যজমান।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী মেটার পর তিনি দিগ্‌সুই যান, সব ভাব কোথায় চলে গেল! গুরুদেবকে সব বললেন।

গুরু—"তাই তো!……স্থির হ'তে পারলে না। এক কাজ কর—কোন যোগীর কাছে যাও। চক্রাদিতে স্থিতিলাভের চেষ্টা কর।"

ইনি—"কোথায় আবার যোগীর কাছে যাবো? যা, কর্‌তে হয়, তা আপনিই করুন।"

গুরু—"আমি আদেশ কর্‌ছি, বিজয়ের গুরু ২৫০ বৎসরের সাধু ব্রহ্মর্ষি গৌড়েন্দ্রজীর কাছে যাও।"

॥ দ্বিতীয় বিলাস ॥

গুরুর আদেশে শান্ত শিষ্ট হ'য়ে চলেছেন ব্রহ্মর্ষি গৌড়েন্দ্রজীর কাছে। সংসার প্রতিপালন ক'র্‌তে হয় জেনে, ব্রহ্মর্ষি গৌড়েন্দ্রজী ব'ল্‌লেন—"আমি উপদেশ ক'র্‌লে তোমার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যাবে। তাদের খাওয়াবে কে ?" ইনি ছাড়বার পাত্র নন্। শেষে গৌড়েন্দ্রজী ব'ল্‌লেন—"জল্‌মে সমাধি করো।"

কিছুদিন পরে হাজির, 'নাদে'র সংবাদ দিলেন।

গৌড়েন্দ্রজী—'কোন্ দেহ হ্যায় ?'

ইনি—'ব্রাহ্মণ দেহ।'

গৌড়েন্দ্রজী—"সমাধি লাগে গা।' চলে এলেন।

১৩২৪ সাল থেকেই চাতুর্মাস্যে বিশেষ নিয়ম পালন চল্‌ছে। প্রত্যহই ভোরে উঠে 'রাম রাম' ক'রে স্নান, হবিষ্য, জপ, পূজা, অধ্যয়ন প্রভৃতি চল্‌ছে। এবার এল আদর্শ গৃহী হবার পালা। ১৩২৭ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার পর একাদশীর দিন ডুমুরদহে 'ব্রজনাথ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইনি নিশানের কাঠি চাঁচ্‌ছেন। যোগীনবাবু সমিতির কথা জেনে ব'ল্‌লেন—"কর্ত্তা কে ?"

ইনি—"ব্রজনাথ"।

যোগীনবাবু—তাহ'লে চ'ল্‌বে।

ডুমুরদহ গ্রাম নামে মুখরিত হ'য়ে উঠলো। হরিবাসরে নাম কীর্ত্তন চল্‌ছে। শাস্ত্র আলোচনা, উপদেশ, ভাষণ ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। এই আনন্দে মণীন্দ্র, রজনী, পুরঞ্জয়, নিত্যানন্দপুরের বটু, রুকুসপুরের কালী, সাহাগঞ্জের ক্ষিতীশ, পরে অতুল মুখোপাধ্যায়,

নানুবাবু, ইন্দু আরও অনেকে মেতে উঠেছিলেন।[১] স্বামীজী ও গুরুদেব মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। চারিদিকে অনন্দের প্লাবন চল্‌ছে। শ্রীমদ্‌ বিজ্ঞানানন্দজী তাঁর পাশে বরাবরই আছেন।

সংসারী হ'য়ে অতিথি সেবা, গ্রামের সেবা, রোগীর সেবা এই হ'ল তাঁর ব্রত। অতিথিকে কখনও বিমুখ করেন না। প্রার্থীকে করেন না নিরাশ, পরণের কাপড়টি পর্য্যন্ত দিয়ে কৃতার্থ হ'ন। এলেন অতিথি, কর্‌লেন দেবতাজ্ঞানে তাঁর সেবা। অতিথি প্রার্থনা ক'রলেন অর্থের। গৃহ কপর্দ্দকশূন্য। কি হবে? আংটিটি দিলেন। প্রার্থনা পূরণ হ'ল। এদিকে সংসার ঋণভারে জর্জ্জরিত।

সব চাপা পড়ল, না চাপা দিলে? আদর্শ গৃহী হ'তে হবে ত'? আর আমাদের মত লোকের গতি কর্‌তে হবে ত'?

ধর্ম্মবিষয়ে তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রধান উদ্‌যোক্তা। সংসারের সকলেই কেউ কম নন্‌। তিনি বলেন "ধর্ম্মবিষয়ে প্রধান উদ্‌যোক্তা ভগ্নাপতি শ্রীকেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন সরল দেবোপম চরিত্র লোক এ যুগে বিরল। জপতপ নামগান ইত্যাদি নিয়েই অনেক সময় থাকৃতেন। ব্রজনাথের সেবা, মহাবীরের সেবা ক'র্‌তেন।

দিদিও আমার দেবীবিশেষ ছিলেন। সকলকে আপনার করবার ওরূপ শক্তি কম লোকেরই দেখা যায়। তিনিও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। সর্বদা 'কালী কালী' ক'র্‌তেন। সকল কাজে কালীনাম স্মরণ ক'র্‌তেন।

১। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরজনী হালদার, শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণাঘাট), নানুবাবু (শান্তিপুর)।

ব'ল্‌তে লাগলেন। শিব পঞ্চমুখে মন্ত্র জপ কর্‌তে লাগলেন, নেচে নেচে ডমরু বাজিয়ে। ক্রমে মন্ত্র গেল, রাম, রাম! তা গেল, ওম্ ওম্। তা গেল—ও ও। তা গেল, সর্পের গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন। ভেতর থেকে গর্জ্জন ধ্বনি উঠতে লাগলো। চক্ষু খুলে ভ্রূমধ্যে সংলগ্ন হ'য়ে গেল। স্বতঃই ত্রাটক্ হ'য়ে গেল। গোলাকার জ্যোতির আবির্ভাব। রাত্রি ৪টার সময় কলের বাঁশীর শব্দে চেতনা এল।

পরদিন ২৪শে পৌষ পদব্রজে দিগ্‌সুই এসে গুরুর কাছে সব কথা নিবেদন করেন। গুরু ব'ল্‌লেন, "পরমগুরুর দর্শন পেয়েছ, কৃতার্থ হবে। 'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'।"

চুঁচুড়ায় ফিরে এলেন। লৌকিক জ্ঞানহারা। অনেকে পাগল ব'ল্‌তে লাগল। বেদান্ত শাস্ত্রীমশায়ও বল্‌লেন, "মাথাটি গোলমাল হয়েছে।" বিপিনবিহারী নামক একটি ছাত্র বল্‌লেন—"আহারের দোষে যোগ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।" চতুর্দ্দিকে 'পাগল পাগল' রব উঠল। তাঁর কণ্ঠে তখন নতুন নতুন গান আসতে লাগল, নতুন এক রকম সুর এসে উপস্থিত হ'ল। সকলের কাছে গান করেন, লজ্জা বা কুণ্ঠা নাই। জিভ অনিবার 'জয় গুরু জয় গুরু' উচ্চারণ ক'র্‌ছে। নিত্যকর্ম্মাদি চল্‌ছে ঠিক মতই।

গুরু গেছেন গ্রামান্তরে ষট্‌পঞ্চমীব্রত প্রতিষ্ঠা কর্‌তে। শিষ্যটির উপর ৺সরস্বতীপূজার ভার। সকালে যখন জপ কর্‌ছেন, নেমে এলেন একটি সাধুমূর্ত্তি। সাধুটি বিখ্যাত কালীসাধক ছিলেন। প্রশ্ন উঠ্‌ল "ইনি কে?" সত্য অনুভূত হ'ল। চোখ জলে ভরে এল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—মা! এ জন্মেও মুক্তি দিস্ নি! ধ্যান ভেঙ্গে গেল।

রাত্রে গুরু এলে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আমি কি পাগল হ'লাম?

আজ একি দেখলাম ! মাথা খারাপ হয়ে থাকে, চিকিৎসা করান।”

গুরু—“না, না। কাজ চালাও।”

কয়েকদিন পর বেলুড় মঠে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দেখে গঙ্গা পার হ'য়ে দক্ষিণেশ্বর যান। সেখান থেকে হেঁটে কলকাতায় গেলেন, ভীষ্মদেবের[১] দাদা তারাপদ-এর উপনয়ন দেবার জন্য। এঁরা গুরুদেবের যজমান ছিলেন। ভীষ্মদেব মায়ের কোলে ব'সে গান শোনায়, ইনিও শোনান, 'দুই রসিকে মিলন মধুর।'

দোলপূর্ণিমার পর প্রতিপদে শ্রীব্রনাথের দোল। দোলের আগের দিন ডুম্বুরদহে আসেন। ডুমুরদহে সেই পূর্ণিমায় 'পূর্ণতা' প্রাপ্তি ঘটলো। পূর্ণতা অর্থাৎ 'যদা যদা হি' এই বোধে অধিষ্ঠান। অফুরন্ত শক্তির আবির্ভাব হ'ল, অফুরন্ত আনন্দে মেতে উঠ্‌ল মন। সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা। বাক্য তথায় অসহায়, বুদ্ধি বোবা, বেদান্তের সেই নেতি নেতির অবসান। সেথায় সকল বাদ, বিসম্বাদ ভুলে করযোগে অবস্থান করছে। প্রতিপদে শ্রীব্রজনাথের দোল মিটিয়ে দিগ্‌সুই গেলেন।

গুরু : “কিম্ ?”

ইনি : “আসুন।”

তারপর গুরু, গুরুপত্নী, সহধর্ম্মিণী ও ইনি গোয়ালঘরে (বর্তমান রান্নাঘরে) চারজন একত্র হ'লেন। দ্বারে প্রহরী সুশীলকুমার[২]—ছাত্র। চারজন সামনা-সামনি দাঁড়ালেন। এঁর ডান হাত উপরে উঠ্‌লো—হ'ল ঈপ্সিত দর্শন।

গুরুদেব বিহ্বল হ'য়ে পড়েন। 'সাধন সমিতির মহোৎসব উপলক্ষ্যে

১। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ গায়ক।

২। শ্রীসুশীলকুমার কাব্যস্মৃতিতীর্থ (জৌগ্রাম)

গ্রাম্য দেবদেবীর পূজার জন্য ঠাকুরকে সম্পাদকদাদা শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রকমে নিয়ে যান। ৩।৪ দিন বিহ্বল অবস্থায় থাকেন।' কয়েকদিন পরেই আবার গুরু কিছু দেখতে চাইলেন। গুরু দেখ্‌লেন, তৃপ্ত হ'লেন। তারপর ব'ল্‌লেন—তুমি মিথ্যাবাদী। মন্ত্রগ্রহণকালে সত্য ছিল—"আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু।" ইনি নিরুত্তর। গুরুদেব নিম্নোক্ত শ্লোকটি লিখে পুত্রের হাতে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন—

গুরুর্বা শিষ্যো বা ভবসি কতরো ন বিদিতং
অহং তে ত্বং মে বৈ প্রকৃতিস্থলভাৎ তৎ স্থবিদিতম্।
গুরুশ্চেৎ শিষ্যোঽহং শরণমুপগতং পাহি (শাধি) কৃপয়া
শিষ্যশ্চেৎ কিমসি গঠিতস্তৎ কথয় মে॥

গুরু অথবা শিষ্য উভয়ের মধ্যে তুমি কে? আমি তোমার গুরু অথবা তুমি আমার গুরু, তা তুমি উত্তমরূপে বিদিত আছ। যদি তুমি গুরু হও, আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমায় কৃপা করে রক্ষা (শাসন) কর। যদি আমি তোমার গুরু হই, তাহ'লে কেমনে গঠিত হয়েছ বল?

উত্তর দিলেন—"তোমার দেওয়া ভাব, তোমার দেওয়া ভাষা, তোমারই চরণে ডালি দিলাম, যা ইচ্ছা হয় কর।"*

আদর্শ গৃহী হবার বাসনা জাগ্‌ল। এখন কর্ত্তব্য স্মরণ হ'য়েছে তা' ক'রতে হবে ত? এ যুগে বৈরাগ্যের আদর্শ অচল। সকলকে উদ্ধার ক'রতে হবে—তাই কি, এ বাসনা নয়?

নিজ কর্ত্তব্যে সদা সচেতন। গত পৌষে গুরুদেবকে জানিয়েছেন—"সিদ্ধু মুক্ত হবে, দীক্ষিত করুন।" সহধর্ম্মিণীর দীক্ষা হয়েছিল। তারপর

* পরিশিষ্টে 'কিমসি গঠিত' ইত্যাদি প্রবন্ধের ইহা অংশ।

ইনি নতুন ক'রে কিছু ব'ল্লেন সহধর্ম্মিণীকে,—"সব বল্বো না, জপ করে জেনে নাও। মোটামুটি এইটুকু জেনে রাখ, আমরা দুটি জ্যোতির কণা সংসারকে শিক্ষা দেবার জন্য নেমেছি—বুঝলে ?" (১১ই চৈত্র ১৩২৪ সন।)

এই সময়ই 'পাগলের খেয়াল' লেখা হয়। 'পাগলের খেয়ালে' একটি গানে পূর্ণত্বের ছাপ খুবই স্পষ্ট হ'য়ে রয়েছে—"এসেছি জননী জাগাবার আশে, জাগিয়া কর মা ধর্ম্মের উদ্ধার।" চ'ল্ছে ক্ষেপা আপন মনে। ধরছে জনে জনে। বল্ছে—কে ভগবান্ দেখবি আয় ? কে বা আসে তার কথায় ? এই কি তোমার কল্পতরু লীলা ?

১৩২৫ সাল বৈশাখ মাস, ডুমুরদহে উত্তমাশ্রমে স্বামী উত্তমানন্দের তিরোভাব উৎসব। আশ্রমাধীশ স্বামী শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ এঁকে নিরতিশয় স্নেহ ক'র্তেন। এঁর দাদা ও বৌদি গিরি মহারাজের শিষ্য ছিলেন। কাজেই এই উৎসবে সকলেই মেতে উঠেছেন। সন্ধ্যার পর সভা চ'ল্ছে—ইনি গিরি মহারাজের কাছে ব'সে আছেন। স্বামিজী ব'ল্লেন—তুই কিছু বল্ না! ইনি ব'ল্লেন—'আমার ঠিক নেই। শেষকালে কি বল্তে কি বলে ফেলব।' শেষে স্বামিজীর নির্দ্দেশে উঠ্তে হ'ল। সভায় উঠেই গুরুপ্রণাম করেই ভাষণ আরম্ভ হ'ল। "গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান, মাচা ভরা কুমড়ো, অভাব কোন জিনিষের নেই। একেই বলে কি সন্ন্যাস ? এই ভাবে অনেক কথা বলেন।"

এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা অনেকেই সহ্য ক'রতে না পেরে চ্যাঁচামেচি ক'র্তে লাগলেন। শ্রীমৎ মহিমানন্দজী[১] হুঙ্কার দিলেন—"তোমাদের

১। ইনি শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের গুরুভ্রাতা, খুব উন্নত সাধক ছিলেন।

সংসারে অর্থের অনটন। মা ও দিদি কত পরিশ্রম ক'র্‌তেন। খড় নেই, 'হেদো'* থেকে জলে নেমে ঘাস কেটে এনে গরুকে খাইয়েছেন। নিজেরাই অনেক সময় ধান ভান্‌তেন। সংসারের চিন্তা আমাকে করতে হয় নাই। যা পেলুম এনে ফেলে দিলুম। মা আমার সমস্ত ব্যবস্থা ক'র্‌তেন। শৈলও মাতার সদৃশী কন্যা, সে নীরবে ব্রজনাথের সংসারে আত্মদান ক'রে জীবন অতিবাহিত ক'রেছে।"

অধ্যয়ন বন্ধ নাই। শাস্ত্রের পর শাস্ত্র সমাপন করে চলেছেন। পরীক্ষা বিষয়ে কিন্তু নিতান্ত উদাসীন, জপপূজাদি নিয়েই থাকেন।

গুরুদেব পরীক্ষার পূর্ব্বে রহস্য ক'রে বলেন—চাটুজ্যে ম'শাই সাধুলোক, তিনি কি আর পরীক্ষা দিবেন? ইনি পরীক্ষার আবেদন ক'রে পাঠ্য পুস্তক দেখ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌তেন। প্রায়ই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতেন, ক্বচিৎ ক্বচিৎ ফল ভাল হ'তো না। ১৩৩৪ সালে উপনিষদের মধ্য পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়ে ২ বৎসর ৩৲ টাকা ক'রে বৃত্তি পেয়েছিলেন। ইনি বুঝেছিলেন কোন কর্ম্মী পরীক্ষক এঁর কাগজ দেখেছিলেন। এঁর লেখায় অনুভূতির কথা থাকতো।

১৩২৯ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে গয়া যান। সেখানে ভগবানদাস নামক এক পাঞ্জাবী সাধুর দর্শন পান। এঁর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বিস্তৃত বলা দরকার।

একদিন রামশীলা পাহাড়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীতারকব্রহ্ম নাম করতে করতে উঠ্‌ছেন, দেখেন একটি সাধু বাঁ দিকে সিঁড়ির ওপর শুয়ে রয়েছেন। দর্শন ক'রে যখন ওপর থেকে নেমে আসছেন, তখন সেই

---

* একটি পুকুরের নাম।

সাধু ডাকলেন, নিকটে গেলে হিন্দীতে ব'ললেন, "চেঁচিয়ে নাম কর কেন? মনে মনে করবে।" তদুত্তরে এইরূপ কথোপকথন হ'ল ঃ

"আমি যেমন অধিকারী, সেরূপ করব তো!"

"আমি তোমাকে একটি সাধন দেবো, কাল এসো। বাড়ী কোথায়?"

"বাংলা দেশ থেকে এসেছি, ফিরে যাবার ভাড়া নাই।"

"কি ক'রে যাবে?"

"ঠাকুর যা করেন।"

"আমি পাঞ্জাব থেকে আসছি, গুরুদেব পাঠিয়েছেন ঈশ্বর বিশ্বাস করবার জন্য। হাতে কিছু নেই। দেশ পর্য্যটন করছি। কারুর কাছে কিছু প্রার্থনা করি নি। কলিকাতা পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছা আছে।"

"তুমি সংস্কৃত জান, আমার সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা।"

"গুরুদেব এখনও টোল করবার অনুমতি দেন নি।"

"কাল এসো, তাহ'লে একটি সাধন দেব।"

"কখন আসব? সকালে না ভোজনের পর?"

"সকালেই।"

"আহারের কি হবে?"

"ভগবান্ যা ব্যবস্থা করবেন।"

পরদিন সকালে রামশিলা গেলেন। দেখেন সাধুজী বেল খেতে খেতে আস্‌ছেন। তাঁকে নিয়ে সাধু একস্থানে গিয়ে ব'স্‌লেন। সেটা গোরস্থান বলে মনে হ'ল। এঁর মনে সংশয় জাগল, "ইনি হিন্দু না মুসলমান?" সঙ্গে কিছু নাই, কোনরূপ জাতির চিহ্ন নাই। সুন্দর নধর দীর্ঘ দেহ, দাড়ি আছে। পরণে খদ্দর খণ্ড, হাঁটুর ওপর পড়েছে।

প্রশ্ন করলেন সাধুকে, "আপনি হিন্দু, না মুসলমান?"

সাধু ঠিক কিছু বললেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন এ কথা বলছ?"

"এটা গোরস্থান মনে হচ্ছে।"

"না, গোরস্থান নয়।"

পরে স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, তা গোরস্থান নয়।

এঁর হাতে একটি কৌটো দেখে সাধুজী জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ওতে কি?

"ঠাকুর।"

"ফেক্ দেও।"

"ঠাকুর ফেলব কেন?"

এই সময় এক ব্যক্তি আহারের জন্য ডাকলেন। সাধু ব'ললেন, "এই দেখ, রাম খাবার জন্য ডাকছেন।" ইনি যতদূর সম্ভব সত্বর ঠাকুরের পূজো ক'রে নিলেন।

যে সাধু আহারের জন্য আহ্বান ক'রেছিলেন, তিনি বড় বড় রুটি (আর যেন ডাল) দিলেন। খাওয়া হ'ল। পাঞ্জাবী সাধু ক'লকাতা আসবার এবং সংস্কৃত শিখবার প্রস্তাব ক'রলেন। আহারাদির পর স্থির হ'ল, দুজনে একসঙ্গে ডুমুরদহ আসবেন এবং ডুমুরদহে তিনি সংস্কৃত পড়বেন।

উভয়ে নাদরাগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হ'লেন। সাধুজী এক নানক-পন্থী সাধুদের আশ্রমে প্রবেশ ক'রলেন। তাঁরা এঁকে 'কোন শরীর' জিজ্ঞাসা ক'রলে, ইনি ব'ললেন "ক্ষত্রিয়।"

নাদরাগঞ্জে যাদের বাড়ীতে ওঠা হ'য়েছিল, তাদের কাছ থেকে

টাকা ধার ক'রে গয়া ষ্টেশনে আসা হয়। দুজনে গাড়ীতে ত্যালাগু এলেন। তথা হ'তে দিগ্সুই।

এই সাধুর নাম ভগবানদাস। গুরুর নাম শাহান-শা। পাঞ্জাবের লাহোরে তাঁর আশ্রম। ঠিকানা শাহান-শাহী কুটীর, লাহোর। এঁদের "শাহান-শাহী সন্দেশ" বলে একখানি মাসিক পত্র ছিল।

সাধু ব্রজনাথের বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এঁদের দারিদ্র্য দেখে বলেন, "তোমার জন্য টাকার ব্যবস্থা করবো ?" (বোধ হয় সিদ্ধাই প্রয়োগ ক'র্তে চেয়েছিলেন।)

ইনি বলেন, "না, টাকার প্রয়োজন নাই।"

সাধুজী উত্তমাশ্রম যেতেন। শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ স্বামী এবং শ্রীমদ্ মহিমানন্দের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, পদব্রজে কলকাতা যান। নকুলেশ্বরতলায় শ্রীবিপিন ভট্টাচার্য্যের কাছে যান। তিনি যত্ন ক'রে আহারের কথা বলেন। সাধু বলেন, আপনি সন্ত কি না এর উত্তর না দিলে ভোজন করবো না। ভট্টাচার্য্য মশায় নীরব থাকেন, পরে বলেন, "না, আমি সন্ত নই।" ('সন্ত' অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরদ্রষ্টা।) অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সেখানেই তাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন।

সাধু পদব্রজে ক'লকাতা থেকে ফেরেন এবং ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমে আশ্রয় নেন। সেখানে ৪১ দিন মৌন থাকেন। এঁকে স্থান-বিশেষে ধ্যানের সঙ্কেত ব'লে দেন এবং মৌন নিতে বলেন। কিন্তু এঁর তখন মৌন নেওয়ার উপায় নেই। ঘাড়ে সংসার। ধ্রুবানন্দ স্বামী বলেন, "ওর এখন মৌন হ'তে পারে না।" সাধু এঁকে বলেন, "তুমি সাধন ছাড় নাই, তোমার উন্নতির আশা আছে।" তাঁর আদর্শে প্রথমে খণ্ডমৌন আরম্ভ হ'ল। ক্রমে ১ দিন, ২ দিন,

৩ দিন, পরে এক মাস, এইভাবে মৌনকাল বৃদ্ধি করা হয়। সাধু বলতেন, "মৌনের দ্বারা সাধনের ফল সত্বর পাওয়া যায়।" "মন্নাথ" গ্রন্থে ঠাকুর ব'লেছেন, "তিনিই আমার মৌন লইবার আদর্শ।" স্থানবিশেষে ধ্যানের বিষয় তিনি তাঁর গুরুকে জানান, গুরু বলেন, "আর কিছু করতে হবে না, লীলাচিন্তাই সর্ব্বোত্তম সাধন।"

কিছুদিন পর ভগবান্‌দাসজী বিদায় নেন। বলে যান, "বাঙ্‌লা প্রবন্ধ লিখে লাহোরে শাহান-শাহী কুটীরে পাঠাবে। হিন্দী ক'রে আমাদের মাসিক পত্রে ছাপাব।" তা হয় নি।

ঈশ্বর বিশ্বাস করবার জন্য, অর্থাৎ 'ঈশ্বর আছেন, তিনি সকলের চালাবার মালিক' এই বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্য এই পাঞ্জাবী সাধুর গুরুদেব তাঁকে রিক্ত হস্তে দেশভ্রমণে পাঠান। তিনি কারো কাছে প্রার্থনা না ক'রে দেশপর্য্যটন সমাপন করে গুরুদেবের কাছে ফিরে যান।

দেশে ফিরে একবার পত্র দেন, "আমার গুরুদেব ক'লকাতা যাচ্ছেন, অমুক জায়গায় উঠবেন, দেখা ক'রো।" সেখানে গিয়ে জানা গেল, গুরুদেব আসেন নি।

এই সাধুর সঙ্গে পরিচয় এইখানেই শেষ। পরে আরও পত্র দিয়েও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি।

১৩২৯ সনে ২০শে আশ্বিন গুরুদেবের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। গুরুদেব অসুস্থ, শিষ্য সেবায় নিরত। তিনদিন বাহ্যজ্ঞান নাই। চতুর্থ দিনে জ্ঞান এল, তিনি শিষ্যকে ব'ললেন—"এক অপূর্ব্ব দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে বহু মহাপুরুষ একত্রিত হ'য়েছেন। তাঁদের দীর্ঘ ক্ষীরকোমল তনু। সেখানে যেতেই আমার শরীরও তদ্রূপ হ'য়ে গেল। তথায় সভা ব'সেছিল, আলোচ্য বিষয়—কলির

সকল শ্রেণীর সাধকের, সকল অধিকারীর কৃতার্থ হবার পথ কি? একজন মহাপুরুষ ব'ল্‌লেন—"অহিংস হওয়া।" মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট মহাপুরুষগণ শাস্ত্রপ্রমাণসহ স্ব স্ব মত প্রকাশ ক'র্‌লেন। কোন মতই সর্ব্বজনস্বীকৃত হ'ল না। পরদিন যখন আমার (গুরুদেব ব'ল্‌ছেন) পালা এল, আমি শাস্ত্রপ্রমাণসহ বল্‌'লাম,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তখন সকলে সমস্বরে 'হরি ওঁ হরি ওঁ' উচ্চারণ ক'রে সমর্থন ক'র্‌লেন। সকলে অন্তর্হিত হ'লেন।"

অন্তর্লোকের এই ঘটনার পর গুরুদেবের সঙ্কল্প হ'ল নামপ্রচার ক'র্‌বেন, আরব যাবেন, তাতার যাবেন, লোকের দ্বারে দ্বারে নাম বিলাবেন। কিন্তু সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয় নি।

১৩২৯ সনের আরও কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌষ মাস। ইনি 'গৌরকাকা'র মানসিক চণ্ডীপাঠ করবার জন্য আমুদপুর যান। ফুল্লরাপীঠে তাঁর মানসিক অনুযায়ী চণ্ডীপাঠ করা হয়। 'নিতাইকাকা' ছিলেন রেলের গার্ড, তাঁর বাসাতেই থাকা হয়। 'নরেশদাদা', কামালপুরের হেম সরকারের পুত্র প্রভৃতি সঙ্গী ছিলেন।

সেখান থেকে তারাপীঠ দর্শনের জন্য রওনা হ'লেন। 'গৌর কাকা' একটি মোটা 'র‍্যাগ' দেন। সেই কম্বলটি, ঝোলা, কমণ্ডলু, করতাল আর কিছু পয়সা,—এই সম্বল।

মাঘীপূর্ণিমায় নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসব দেখবার জন্য বীরচন্দ্রপুর যান। সেখানে নাম ক'রতে ক'র্‌তে দর্শন করেন। কীর্ত্তন শুনতে গেলেন; কেবল খোলের বাজনা এবং তাল, ভাল লা'গ্‌ল না!



পরিজন সহ শ্রীশ্রীপরমগুরুদেব (১৩৩৭ সাল, ৯ই বৈশাখ, বৈকাল, দিগম্বুই)

একটা ফাঁকা জায়গায় শুয়ে রাত কেটে গেল।

সেখান থেকে নাম কর্‌তে কর্‌তে তারাপীঠ গমন। পথে কয়েকটি স্ত্রীলোক তাদের পরিচিত কোন পলাতক লোক ব'লে সন্দেহ ক'রে নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। পরিচয় পেয়ে তাদের কেউ নয় জেনে স্ত্রীলোকগুলি নিরস্ত হ'ল।

তারাপীঠে উপস্থিত হ'য়ে দর্শনাদি করেন। পাণ্ডাদের বাড়ীতে আহার হ'ল, তাঁরা যত্ন করে খাওয়ান।

তারপর নসিপুর যান। সেখানে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ছিলেন। তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরা এঁর গলায় তুলসীর মালার সঙ্গে রুদ্রাক্ষমালা দেখে এবং তারাপীঠে মার প্রসাদ খেয়ে এসেছেন শুনে এঁকে 'রামানুজ' সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলে বিশ্বাস করেন না।

এর পরের ভ্রমণবৃত্তান্ত সঠিক জানা যায় না। তবে পথে রাণী ভবানীর দেবমন্দির, ডাবুকেশ্বর, কিরীটেশ্বরী দেখে রামনগর যান। কিরীটেশ্বরীতে বহু শিবলিঙ্গ। মা'র মন্দিরের কাছে গগনস্পর্শী বৃক্ষশ্রেণী। চিনি কিনে মার পুজো দেওয়া হয়। তারপর গঙ্গা পার হ'য়ে মুর্শিদাবাদ এবং রামনগর যান। সেদিন কিছু খাওয়া হয় নি। ঠাকুর কি জোটান তাই দেখছিলেন। সঙ্গে পয়সা ছিল ব'লে ঠাকুর জোটালেন না। সেখানে গাড়ীতে উঠে নলহাটীতে ললাটেশ্বরী কোন দিকে জেনে নিয়েই রাত্রেই মার মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হ'ন। মা'র কৃপায় মোড়ে মোড়ে লোক ছিল, তারা পথপ্রদর্শন ক'রে দেয়।

এক বিয়েবাড়ীতে লুচির গন্ধে মন চলে গেল! এই প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্যটি করেন, সেটি উল্লেখযোগ্য—"সারাদিন বেচারার খাওয়া নেই।"

মার মন্দিরে এলেন। দোকানে কিছু মিষ্টি কিনব বলে গেলেন। ঝাঁপ খুললো না। ঝাঁপের পাশ দিয়েই মিষ্টি দিল। পুকুরে এসে সেই মিষ্টি ভোজন ক'রে জল খেয়ে এক খোলা শিবমন্দিরে প'ড়ে রইলেন। সম্বল সেই 'গৌরকাকা'র কম্বল। তা-ই আস্তরণ এবং গাত্রাবরণ। সকালে উঠ্‌লেন। ভৈরবী মা'র সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনি ব'ল্‌লেন, "আমায় ডাক নি কেন, বাবা?" তাঁপ একটি সাদা ভেড়া ছিল। জনশ্রুতি এই যে, মা কোন পুরুষকে ভেড়া ক'রে রেখেছেন।

সেখানে ওপরে কোন মূর্ত্তি নাই। সিন্দুরচিহ্নিত স্থান।

ফুল্লরাপীঠ কচ্ছপাকৃতি একটি ঢিপি। সেখানে প্রসাদ পেয়ে আমুদপুর ফিরে আসেন 'নিতাইকাকা'র বাসায়। পয়সা ফুরিয়ে গেছে, পা কেটে গেছে। উপস্থিত পীঠস্থান-ভ্রমণ এই পর্যন্ত, তারপর ডুমুরদহ ফিরে আসেন।

* * *

ডুমুরদহে 'ব্রজনাথ সমিতি'র উৎসব হ'ল। দিগ্‌সুইয়ে 'সাধন সমিতি'র উৎসবেও অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে এসেছেন পরমগুরু-পুত্র শ্রীমদ্‌ লক্ষ্মীনারায়ণজী। তিনি রামায়ণপাঠে রাম-নামগানে মাতোয়ারা। ইনিও তাতেই মেতে গেলেন। ইনি বলেন "শ্রীমদ্‌ লক্ষ্মীনারায়ণজীর কাছে 'রাম রাম' করতে শিখি।"

নামপাঠে একেবারে আত্মহারা। কিন্তু কর্ত্তব্য ঠিক আছে। ১৩৩০ সনে গুরুর আদেশে প্রথম দীক্ষা দেন বাক্‌সাড়ার শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অবশ্য সাধ্যযোগের দীক্ষা। তাঁর এই প্রাথমিক পর্ব্বের ইতিবৃত্ত বিস্তৃত বিবরণের অপেক্ষা রাখে।

বাক্‌সাড়া হাওড়া জেলার একটি গ্রাম। হাওড়া দিয়ে যেতে হয়। সেখানকার শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বৌদি কালিদাসী, স্ত্রী করুণাময়ী এবং ভ্রাতা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। তিনি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন। গুরুদেব বলেন, "তুমি দীক্ষা দাও।" তিনি বলেন, "আমারই দুঃখ যায় নি, আমি আবার কি দীক্ষা দেব।" গুরুদেব বলেন, "আমি বলছি—দীক্ষা দাও, দীক্ষাদানের প্রয়োজন হয়েছে।" শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে বাক্‌সাড়ায় প্রথম দীক্ষা দান।

মন্ত্রের সম্বন্ধে পরে নিয়ম করেন, ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা করবে ও এক লক্ষ গায়ত্রী জপ সমাপ্ত করার পর দীক্ষা পাবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন মন্ত্র দেওয়া হবে না। মায়েদের এক লক্ষ মহামন্ত্র নাম জপ করার পর দীক্ষা দেবেন। পরে এক লক্ষের জায়গায় চার লক্ষ মহামন্ত্রজপের নিয়ম হয়। তারপর পাঁচ লক্ষ পা যাওয়ার পর, পায়ের জন্য আরও এক লক্ষ বেশী দাবী করা হয়।

বোধ হয় সেই বৎসরই নিত্যানন্দপুরের বটুর ভগ্নীপতি সাহাগঞ্জের ক্ষিতীশ মন্ত্র প্রার্থনা করে। বটু মন্ত্র প্রার্থনা করে ১৩৩২ সনে। শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর তখন মির্জ্জাপুরে। তাঁর অনুমতি চেয়ে পত্র দেন। পত্র পেলে তবে ১৩৩৩ সনে সস্ত্রীক বটুকে দীক্ষা দেন। সে-ও অবশ্য নির্দিষ্টসংখ্যক গায়ত্রী জপ ক'রে তবে মন্ত্র পায়, আর ত্রিসন্ধ্যার সর্ত্ত তো ছিল-ই।

এই বৎসরে-ই গজিনাদাসপুরের পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়ের দীক্ষা হয়। সে ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

১৩৩২ সন, শ্রাবণ মাস। ঠাকুর যাচ্ছিলেন বিয়ে দিতে। চুঁচুড়ার মেছোবাজার ঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। ইমামবাড়া

হাঁসপাতাল বাঁয়ে রেখে পোষ্ট অফিসের কাছাকাছি গঙ্গাভিমুখিন সড়কের ডানহাতি একটি অশ্বত্থগাছ আছে। সেখানে সৌখীনবেশধারী এক যুবক এগিয়ে এসে তাঁর চরণে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে ব'লল, "আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু চোর, জোচ্চর, মিথ্যাবাদী, মদ্যপ এবং লম্পট। আমাকে উদ্ধার ক'রতে হবে, আশ্রয় দিতে হবে।" তিনি বলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

"আজ্ঞা হঁ্যা।"

"বোধ হয় ভুল ক'রছ। তুমি আমাকে আমার গুরুদেব ব'লে ভ্রম ক'রছ।" (তখন তাঁর চেহারা প্রায় গুরুর অনুরূপ হ'য়ে গিয়েছিল। তাই লোকে প্রায়ই ভুল ক'রত।)

"না, আমি আপনাদের চিনি। আপনি ডুমুরদেহের······।" তার অকপট সত্যভাষণে মুগ্ধ হ'লেও তিনি দীক্ষা দিতে সম্মত হন না, বলেন, "আমার নিজের দুঃখ এখনও যায়নি, তোমার দুঃখমোচন ক'রব কি ক'রে"

পঞ্চানন নাছোড়বান্দা। তার কাতরতা দেখে শেষে ব'লতে বাধ্য হ'লেন, "এক লক্ষ গায়ত্রী জপ ক'রে তারপর দেখা ক'রবে।" সে সাড়ে তিনলক্ষ গায়ত্রী জপ ক'রে দীক্ষা নেয়। মাঘ মাসে দীক্ষা হয়। তার সমস্ত পাপক্ষয় হ'য়ে যায়। দেহে সত্ত্বভাব ফুটে ওঠে। নতুন জীবন হয়। প্রতি একাদশীতে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নদীনালা বৃষ্টিবাদল না মেনে সে গুরুদর্শনে ছুটে আস্‌তো। বোল্‌তো, "১৫দিন পরে ষ্টীম ফুরিয়ে যায়। তাই ছুটে আসি।" সে একটি নিরীহ বালকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনন্য গুরুভক্ত হয়।

১৩৩৩ সনের রামনবমীর দিন বহুতীর্থ ভ্রমণের পর সে কাশীধামে দেহত্যাগ করে। তার সম্বন্ধে "মন্নাথ" গ্রন্থে ঠাকুর লিখেছেন :—

"শাস্ত্র বলেন, ৺কাশী-মৃত্যুতে মুক্তি হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ৺পঞ্চানন আবার আসিবে। তাহার গুরুসেবা করিয়া আশা পূর্ণ হয় নাই। সে বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য আদর্শ ভক্ত হইয়া সেবা করিবে। সে আমায় শেষ যে পত্র দেয়, তাহাতে লেখা ছিল :—

চিত্রকূটের সংবাদ পত্রে কি লিখিব। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব।

তাহার মুখে চিত্রকূটের কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

(" মন্মথ ")

এই আদি পর্ব্বের আর একজন শিষ্য শ্রীমন্মথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও এই পর্ব্বের লীলার অন্যতম বিশিষ্ট সহচর। ১৩৩৫ সনে তার দীক্ষা হয়। দ্বিজেনের দীক্ষা হয় ১৩৩৬ সনে, সে রামাশ্রমেই তিন লক্ষ গায়ত্রী জপ করে।

এই সময়ে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয় ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতায় পর্য্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গ সবিস্তার ও ধারাবাহিক বর্ণনা করা সমীচীন।

১৩৩০, ভাদ্র। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের মাতার মাতুল,—তাঁর ১৪ রূপ চণ্ডীপাঠ করবার জন্য ঠাকুর শিবপুর যান। তাঁর ছোট শ্যালকের কথায় স্বলিখিত শ্রীশ্রীনামামৃতলহরী নিয়ে 'উৎসব'-অফিসে যান। 'উৎসব'-সম্পাদক শ্রীরামদয়াল মজুমদার ও তাঁর পার্ষদবর্গ, যথা—কেদার পণ্ডিত মশাই, শরৎকমল ন্যায়তীর্থ, ছত্রেশ্বরবাবু প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন, সকলে প্রবন্ধ শুনে আনন্দিত হ'ন। সেই দিন থেকে মজুমদার মশায়ের স্নেহলাভে ধন্য হন। সে ভালবাসার প্রবাহিনী তাঁর জীবনকাল পর্য্যন্ত একটানা ভাবে প্রবাহিত হ'য়েছিল।

দয়াল মহারাজ বলেন, কেঁদে কেঁদে মা'র নামে আশ্বিন সংখ্যা 'উৎসবে'র জন্য একটি প্রবন্ধ লিখবে। ঠাকুর নামামৃতলহরী রেখে

আসেন। দয়াল মহারাজের সঙ্গে পরিচয়ের খবর শুনে ঠাকুরের গুরুদেব আনন্দ প্রকাশ করেন।

আশ্বিনের সংখ্যার 'উৎসবে' "চোখের জলে মায়ের পূজা" বের হ'ল। চতুর্দ্দিকে প্রশংসা। শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী (উত্তমাশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ) বর্দ্ধমান থেকে পত্র দেন; লেখেন—"অমন করে কেঁদে কেঁদে না ডাকলে মাকে পাওয়া যায় না।" ইত্যাদি।

ছত্রেশ্বরবাবু বলেন, এ প্রবন্ধ পাঠ করে শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ বলেছেন, "লোকটি পণ্ডিত, ভক্ত।" ছত্রেশ্বরবাবু বলেন, "আমার তখন মনে হ'ল আমি ছুটে গিয়ে বলে আসি, সান্যাল মশায় আপনার প্রবন্ধ প'ড়েছেন, ভক্ত পণ্ডিত ব'লেছেন।"

মজুমদার মশায়ের সঙ্গে ভালবাসা দিন দিন বাড়তে থাকে। ঠাকুর মাঝে মাঝে 'উৎসব সৎসঙ্গে' যেতেন। প্রথম বারেই সভায় কেদার পণ্ডিত মশায়ের আদেশে ঠাকুর 'নামামৃত' পাঠ করেন ও নাম সম্বন্ধে কিছু বলেন।

১৩৩১ সন। পূজোর আগে দয়াল মহারাজ বলেন, "আমার ভৃগুসংহিতায় "সর্ব্ববাধাপ্রশমনং······" এই মন্ত্রটি পুটিত করে শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠের কথা আছে।

"সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্‌বৈরিবিনাশনম্॥"

এই মন্ত্রটি পুটিত করে আমার জন্য তোমাকে শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ ক'রতে হবে। আমি তোমার সংসারের ভার গ্রহণ ক'রব।"

ঠাকুর বলেন—গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'লবো।

গুরুদেব মত দেন। ২৮শে ফাল্গুন এই চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়।

১৩৩৪ ; ১৩ই বৈশাখ মজুমদার মশায়ের কাছে যোগের ক্রিয়া নেন। ২১শে আষাঢ় যোনিমুদ্রা। সে প্রসঙ্গ :—

১৩৩৪ সনে 'উৎসব'-অফিসে যোগের সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল। ঠাকুর বোধ হয় বিন্দুদর্শনের কথা বলেন। তদুত্তরে দয়াল মহারাজ বলেন, "এসব গুরুর কাছে কাজ নিয়ে করলে ঠিক হয়।"

ঠাকুর। কাজ দিন।

দয়াল মহারাজ। তোমার গুরুর অনুমতি চাই।

দিগ্‌সুই এসে (ঠাকুর) অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর গুরুদেব বলেন, "তিনি যা দেখাবেন, আমায় দেখিয়ে করবে।"

১৩৩৪ সালের বোধ হয় ১০ই বৈশাখ ঠাকুর ২২নং শ্যামপুকুরে দয়াল মহারাজর কাছে উপস্থিত হ'ন। পূর্ব্বকৃতপাপক্ষয়ের জন্য সাধু ভোজন করাতে হ'বে ব'লে দয়াল মহারাজ ৫৲ টাকা দিতে বলেন। ঠাকুর ৫৲ টাকা দিলেন। তারপর তিনি নাভিক্রিয়া, প্রাণায়াম ও মহামুদ্রা দিলেন। তালব্যমুদ্রা শেখালেন।

ঠাকুর দিগ্‌সুই এসে গুরুকে সমস্ত ক্রিয়া দেখাবার পর ক্রিয়া আরম্ভ করেন।

দয়াল মহারাজ ২১শে আষাঢ় যোনিমুদ্রা দেন।

কিছুদিন ক্রিয়া ক'রে অসুবিধা বোধ ক'রতে থাকেন। বায়ুকে ষট্‌চক্রে কিছুতে নামাতে পারতেন না। বাধ্য হ'য়ে দয়াল মহারাজকে জানালেন। তিনি বলেন, "জপ ক'রে কাজ সেরে রেখে দিয়েছ, নাবা'বে কি করে ? যাও, তোমায় আর যোগ ক'রতে হবে না।"

১৩৩৪ সালের ২৬ বৈশাখ দয়াল মহারাজ ডুমুরদহ আসেন তখন শ্রীরামাশ্রমের বন কিছু পরিষ্কার হ'য়েছে। স্থান দেখে তাঁর অত্যন্ত আনন্দ হয়, বলেন—"এখানে তোমার আশ্রম হ'লে আমি মাঝে মাঝে

এসে থাক্‌ব।" ২৭শে বৈশাখ তিনি সীতানবমী করেন। ব্রজনাথজীর বাড়ীতে নাম হয়। তিনি উপদেশ দেন। ২৮শে রাধারমণজীর বাড়ীতে নাম হয়, তিনি বক্তৃতা করেন। ২৮শে সন্ধ্যার গাড়ীতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক'লকাতা ফেরেন।

১৩৩৫ সন। ইনি প্রথম বিভাগে উপনিষদের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একদিন মজুমদার মশায়ের সঙ্গে ৺কালী সিংহের বাটী যান। যোগেন পণ্ডিত মশায়-কে গাড়ীতে জিজ্ঞাসা করেন, "বৃত্তি পাবার যোগ্যতা কি?" পণ্ডিত মশায় বলেন, "আপনি কোন পরীক্ষা দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। উপনিষদের মধ্য।"

"উত্তীর্ণ হয়েছেন?"

"হ্যাঁ। প্রথম বিভাগে।"

"আপনি বৃত্তি পাবেন।"

(বৃত্তি তিনি পেয়েছিলেন দু'বৎসর মাসিক তিন টাকা ক'রে) তারপর ৺কালী সিংহের বাড়ী যাওয়া হ'ল। একেবারে অন্তঃপুরে। (বোধ হয় তখনকার অধিকারীর নাম—বিজয় সিংহ)। পণ্ডিত মশায় ত্রিপুরারহস্যতন্ত্র পাঠ করেন, তারপর ফিরে আসা হ'ল।

১৩৩৬ সন। রথের দিন মজুমদার মশায় রামাশ্রমে আসেন। পূর্ব্বে এসে ব'লেছিলেন, "তোমার আশ্রম হ'লে আসব।" সেই কথা রক্ষার জন্যই আসেন।

১৩৪০—মৌনের আগে পৌষ মাসে বাবার শ্রাদ্ধবাসরে তর্করত্ন মশাই রামাশ্রমে আসেন।

(ঠাকুরের) কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সে কথা তর্করত্ন মশাইকে জানান। তিনি লেখেন, "তোমার পূর্ব্ব সুকৃত তোমাকে উচ্চস্তরে

স্থাপিত করিতেছে। আমরা তোমায় স্পর্শ করিতে পারি কিনা বলিতে পারি না।"

পৌষী অমাবস্যায় রামাশ্রমে তাঁর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধবাসরে তর্করত্ন মশাই আসেন ও বলেন, "ভালই হয়েছে, চিন্তা নাই। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি প্রতিনিধির দ্বারা করাবে।"

২৫শে পৌষ গুহা খনন আরম্ভ হয়, ২৭শে শেষ। মাঘে মৌন নে'ন। নানা অনুভূতি। প্রণবজপকালীন ঘড়ির আওয়াজ। ৩।৪ দিনের মধ্যে দুই কানে যথাক্রমে পুরুষ ও বামাকণ্ঠে "হরে কৃষ্ণ" নাম। ৫।৬ দিনের মধ্যে বহু যন্ত্রে বহু কণ্ঠে "হরে কৃষ্ণ" নাম দিবারাত্র সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যাকালে আরতির বাজনা জোর হ'ত। ক্রমে দিবারাত্র এই সব নাদ শুনতে শুনতে অসহ্য হ'য়ে উঠলো। পথ ভুল হল কি না সংশয় হয়।

(ঠাকুর) ১৩৪০, মাঘ দয়াল মহারাজকে পত্র লেখেন। তখন তিনি কাশীতে। তাঁর পত্রের উত্তর আসে নাই।

ঠাকুর মাঘ, ১৩৪০ (পঞ্চানন) তর্করত্ন মশায়কে পত্র দেন, তিনি উত্তরে লেখেন, "আমি তোমার মত উচ্চ সাধক নই"......... ইত্যাদি..."আমার যা অনুভূতি আছে তাতে বলছি, পথ ভুল হয় নাই।"

১৩৪১

ঠাকুর ৺কাশী যান। রামপুরায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, "পত্রের উত্তর দেন নাই কেন?" মজুমদার বলেন, "কি লিখেছ বুঝি না। বোধ হয় ও সব যোগবিঘ্ন।"

ঠাকুর। এ কথা কোথায় আছে?

মজুমদার মশাই। হরিবংশে।

হরিবংশ খোঁজা হল। "কৈ, সে কথা তো নাই?"

তখন মজুমদার মশায় বলেন, "তর্করত্ন মশায় ঠিক বলেছেন। আমি শিষ্যকে চাপা দিতে চাই না। ও পথে আমার অনুভব নাই।"

'কথা রামায়ণে'র প্রস্তাবনা ও আরও কয়েকটি দৃশ্য তখন লেখা হ'য়েছে। মজুমদার মশায় ও তাঁর কন্যাগণ (মঙ্গলদিদি, মনুদিদি ও লীলাদিদি) সব শোনেন। ২।৩ দিন 'কথা রামায়ণ' পাঠ হল।

মানুদিদি (মানসকন্যা) বলেন, "আমি যদি কোন থিয়েটারের ম্যানেজার হ'তাম, এই বই অভিনয় ক'রতাম।

...আপনি যেরূপ সীতার চরিত্র ফুটিয়েছেন, এরূপ আমি পারি নি। "শ্রীভরত" লিখেছি···কিন্তু এর কাছে কিছু নয় ব লে মনে হ'চ্ছে।"

শনিবারে সেখানে একটি সৎসঙ্গ হ'ত। ঠাকুর তাতে কিছু বলেন।

১৩৪৪

জগন্নাথের আদেশে নামপ্রচার শুরু হ'ল।

ভবানীপুরে চাতুর্মাস্যকালে ঠাকুর একদিন এক শনিবার 'উৎসব' আফিসে মজুমদার মশায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর ফেরার মুখে মজুমদার মশায় রাস্তার ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে ঠাকুরের বুকে হাত দিয়ে বলেন, "আমার সমস্ত শক্তি তোমায় দিলাম।"

ঠাকুর বলেন, "এমন কথা আর কেহ বলেন নাই। কি অপার্থিব ভালবাসা!"

এই হ'ল মজুমদার মশায়ের সঙ্গে তাঁর মিলন ও ঘনিষ্ঠতার আনুপূর্ব্বিক ও সামগ্রিক বৃত্তান্ত।

* * * *

এখন তিনি সদা 'রাধারমণ সম্মিলনী সমিতি'তে যোগ দিতে

পারেন না। কিন্তু স্বাদেশিকতার অভিব্যক্তি দেখি মাঝে মাঝে। তাই সম্মিলনীর সভায় হয় তাঁর আবির্ভাব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শোকসভায় যোগ দিলেন। গীত হ'ল তাঁর রচিত গান। সভার বিবরণী—

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

চিত্তরঞ্জন বিয়োগে

৩রা আষাঢ় ১৩৩২ মধ্যাহ্নে

ডুমুরদহে এ নিদারুণ সংবাদ আসিবার পর শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি যুবক আগামী কল্য তারিখে যাহাতে গ্রামের দোকান বন্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা করেন। কল্য তারিখে বেলা ৩টার সময়ে শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর মন্দিরে সভা হইবে, এ কথা সকলকে বলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে, তৎপরদিবস ৩টার সময় শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর মন্দিরে গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ও অন্যান্য সকলে সমবেত হন। প্রথমে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়টি শ্রীমদ্‌ বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সভ্যগণ পাঠ করেন। তাহার পর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত নিম্নোক্ত গীতটি সুগায়ক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গান করেন। শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজগোবিন্দ রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগুরুপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীপতি রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবপ্রসাদ হাৎ প্রভৃতি তাহাতে যোগ দেন।

চিত্তরঞ্জন মহপ্রস্থান সবারে কাঁদায়ে করেছে!
বিনা মেঘে আজ হল বজ্রাঘাত কি হবে বাংলাদেশের উপায়॥
দেশের তরেতে সন্ন্যাসী সাজিয়া
দিয়াছ গো সব দেশের সেবায়।
তোমার মত চির দেশবন্ধু
এ ভারত আর পাইবে কোথায়॥

ভারতগগন প্রভায় তোমার
আলোকিত ছিল পূর্ণ শশধর।
কাল-রাহু আজ হয়ে প্রতিকূল
গ্রাসিল তোমায় ওহে কর্ম্মবীর॥

এমন কর্ম্মী আসে নি ভারতে
আসিবার আশা নাহিক হেথায়।
আসে না ফিরিয়া সে রতন আর
যে রতন বারেক চলিয়া যায়॥

খদ্দর-প্রচারে স্ত্রীপুত্রসহিতে
হাসিমুখে নিলে বরিয়া কারায়।
তারকেশ্বর ধর্ম্ম-সংগ্রামে
কত না কষ্ট সয়েছ হায়॥

তুমি হে কর্ম্মী বৈষ্ণব কবি
সকলে মেতেছে একটি কথায়।
তোমার মতন লোক-মাতান
দেশের সেবক নাহি দেখা যায়॥

বলিতে পারি না ওহে মহাপ্রাণ
কত ঋণী মোরা তোমারি পাশে।
কত গুণ তব ছিল গুণময়
না পারি বর্ণিতে ভাষার ভাষে॥

এখনও স্বরাজ পাই নি গো মোরা
কোথা যাবে তুমি স্বরাজের প্রাণ।
এস ফিরে এস জাগাতে মোদের
গাহিতে ভারতে স্বরাজ-গান॥

স্বরাজ-যজ্ঞে তুমি হে ঋত্বিক
জ্বালিয়া আগুন যাইবে কোথায়।
দিয়া পূর্ণাহুতি এ মহাযজ্ঞেতে
যেও তুমি বীর যেথা প্রাণ চায়॥

রহিল আসন শূন্য পড়িয়া
শীঘ্র আসি লহ কর্ম্মের ভার।
পাবে না মুক্তি ততদিন তুমি
যতদিন দেশ না হবে উদ্ধার॥

কত যে বেদনা তোমার বিহনে
জাগিছে পরাণে বলি বা কোথায়।
ওহে দেশবন্ধু গুণের সিন্ধু
বেশী দিন ভুলে থেক না সেথায়॥

গীতান্তে শ্রীমান শিবপ্রসাদ হঠাৎ তাহার বালকহৃদয়ের আবেগময়ী ভাষায় লিখিত দেশবন্ধুর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তদনন্তর ডুমুরদহের গৌরব স্বর্গীয় সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্নের প্রিয় ছাত্র শ্রীমান পুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার স্বভাবসুন্দর সুললিত ভাষায় সকলের মর্ম্মস্পর্শী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে দেশবন্ধুর জীবন, কার্য্য, উদারতা ও ত্যাগ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল।

তাহার পর শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

পরিশেষে পূর্ব্বোক্ত গীতটি গান করতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়টি পাঠ করিয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

তাং ১লা জুলাই ১৯২৫ সাল
১৭ই আষাঢ়, বুধবার
১৩৩২ সাল।

প্রকাশক—রাধারমণ ইউনিয়ন ক্লাব
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রাম—ডুমুরদহ
পোঃ অঃ—নওয়াসরাই
জেলা—হুগলী।

এই সময়েই ১৭ই বৈশাখ থেকে ব্রজনাথজীর বাড়ীতে নামযজ্ঞ আরম্ভ হয়। অর্থাৎ অষ্টম প্রহর, চব্বিশ প্রহর পর্য্যন্ত তারকব্রহ্মনাম চ'লতে থাকে।

অভাবের সংসার কিন্তু উৎসব লেগেই আছে। অনেক সময় ইচ্ছা ক'রে বাড়ীর বড়রা পর্ব্বাদির উপবাস করতেন। ১৩৩২ সনে এক সাধু অতিথিরূপে আসেন. তিনি এই অভাবের সংসারে এমন আনন্দের প্লাবন দেখে অবাক হ'য়ে যান।

"সর্ব্ববাধাপ্রশমনং" পুটিত করে মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হ'য়েছে। চণ্ডীপাঠাদি ক'রতে

৪।৫ ঘণ্টা যেত। অন্য যজমানের কাজ করা প্রায়ই সম্ভব হ'ত না। ফলে সংসারে ভীষণ অভাব উপস্থিত হয়।

সেদিন বৈশাখ মাস, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী। সকলের উপবাস। উপরে ঠাকুরঘরে চণ্ডীপাঠ চ'ল্‌ছে। মা মাঝের ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় গোয়ালাদের একটি ছোট্ট মেয়ে এসে মাকে ব'ল্‌লে, "আঙামা, আঙামা (অর্থাৎ রাঙামা), তোমাদের বাইরের ওয়াকে (অর্থাৎ রোয়াকে) কে সাধু এয়েছেন, দেখ।" মা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখলেন, গেরুয়া আল্‌খেল্লা পরা সুন্দরকান্তি শ্বেতশ্মশ্রু শ্বেতকেশ এক সাধু একতারা নিয়ে গুন গুন ক'রে "রাম রাম" গাচ্ছেন, যেন ভ্রমরধ্বনি ক'রছে। মা মনে ক'রলেন, নারদমুনি এসেছেন। তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি তাঁকে সাদরে বাটীতে এনে পা ধুইয়ে দিলেন। সাধু ব'ল্‌লেন, "ভাত খাব, ভাত রাঁধ, মুগের ডাল কর" ইত্যাদি। মা পাক ক'রে তাঁকে খাওয়ালেন। চণ্ডীপাঠান্তে নীচে এসে ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রলেন।সাধু বলেন, তাঁর নাম মেঘনাদ, আশ্রম দেওঘর।

বিকেলে মা ব'ল্‌লেন, "প্রসাদ দেওয়ার জন্য সুজি ক'রতে হবে। হারিকেনের তেল আনতে হবে। দোকানদার ধার দিচ্ছে না। পয়সাও নাই। কি হবে?"

সীতারাম। মুগ সেদ্ধ কর।

মা। মুগ সেদ্ধ কি প্রসাদ দেওয়া যায়?

সীতারাম। উপায় নাই, কি করা যাবে।

মা। তেলের কি হবে।

সীতারাম। যারা কীর্ত্তন শুনতে আসবে; তাদের হারিকেন নিয়ে পাঠ করা হবে।

মা চুপ ক'রে রইলেন।

মা কিন্তু যেমনভাবেই হোক শেষ পর্য্যন্ত হালুয়া ও হ্যারিকেনের তেলের জোগাড় ক'রলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক'রে পাঠ কার্ত্তন চ'লবে। ভোরে ফুলদোল। পরদিন পূর্ণিমা। প্রাতে চব্বিশ-প্রহরব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্মনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং রাত্রে সত্যনারায়ণের সিন্নি হবে। কিন্তু একটি পয়সাও নাই।

সন্ধ্যার পর প্রথম পাঠ শেষ ক'রে সীতারাম বাড়ীতে প্রবেশ ক'রতেই মা ব'ললেন, "ওরে, উমাপদর মত মা চাল পাঠিয়েছেন।" সীতারাম "চাল কে পাঠিয়েছে ?" প্রশ্ন না ক'রে কাঁদতে লাগ্‌ল, মা-ও যোগ দিলেন। পরে তিনি বলেন, "নিত্যানন্দপুরের বটু চাল এনেছে।"

সমস্ত রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে নাম ও পাঠ চল্‌ল ভোরে ব্রজনাথের ফুলদোল হ'ল। মায়ের মাসিমা (নন্দরাণী) ফুলদোলে ব্রজনাথকে ক'টাকা দিয়ে প্রণাম ক'রলেন। সূর্য্যোদয়ের আগেই চব্বিশ প্রহর আরম্ভ হ'ল। উত্তমাশ্রম থেকে তরকারী এল। লোকজন সেবার অসুবিধা হ'ল না। প্রণামীর টাকায় দুধ, কলা প্রভৃতি এনে সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণের সিন্নি হ'য়ে গেল।

চব্বিশ প্রহরে প্রায়ই শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দজীকে ও যুবকদের নিমন্ত্রণ রাক হ'ত। সেবার ২৪ প্রহরে সাধু মেঘনাদকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। তিনি ব'ললেন, "ওরে, তুই এই বনের মাঝে এত আনন্দ ভোগ ক'রছিস্।"

আর এক দিনের ঘটনা।

দিগ্‌সুইএ শঙ্করের টাইফয়েড। মা ও সীতারাম দেখতে যাচ্ছেন। ঘরে উৎসর্গ চাল আছে, ভোগের চাল নাই। ভোগের কি হবে ? দোকান ধার দেয় না। মার একটু চিন্তিত ভাব দেখে দিদি

ব'ল্লেন, "তোরা যা না, ওপরে কর্ত্তা আছেন, তিনি ব্যবস্থা ক'রবেন।" (কর্ত্তা ব্রজনাথ)। তাঁরা চলে গেলেন। দিদি নাইতে গেলেন। এমন সময় এক সাধু (মেঘনাদ সাধুর বেশধারী) এসে ভগ্নীপতি বাঁড়ুয্যে মশাইকে "ব্রজনাথের ভোগ হবে" ব'লে চাট্টি চাল রোয়াকে ঢেলে রেখে চ'লে গেলেন।

দিদি এলে বাঁড়ুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এ চাল কোথা থেকে এলো?" তিনি ব'ল্লেন, "এক সাধু ব্রজনাথের ভোগ হবে ব'লে দিয়ে গেছেন।" দিদি অশ্রু সংবরণ ক'রতে পারলেন না।

একদিন সেই মেঘনাদ বাবা মাকে বলেন, "দেখরে, তোর ছেলের লীলা আমি এ দেহে সব দেখতে পাবো না, ছোট হয়ে এসে দেখবো।" সীতারাম বলেন,—"অবশ্যই তিনি এসেছেন, এখনও ধরা দেন নাই।"

অপর দিনের কথা। ঘরে কিছু নাই, দিদি ব্রজনাথকে ব'ল্লেন "ব্রজনাথ, গোণ্ডা আষ্টেক পয়সা এনে দাও।" একজন আট আনা দিয়ে ব্রজনাথকে প্রণাম ক'রে গেলেন। দিদি ব'ল্লেন, "আট আনা না চেয়ে এক টাকা চাইলেই হ'ত।" একদিন তিন চারটি গরু মাঠ থেকে আসে নাই, দিদি চিন্তিত, "পণ্ডে গেলে পয়সা লাগবে, পয়সারও অভাব। কি হবে বাবা ব্রজনাথ! গরু ক'টিকে এনে দাও।" খানিক পরে গুট গুট করে গরুগুলি এসে উপস্থিত হ'ল।

আরও একটি ঘটনা।

টোলে ১৯।২০টি ছাত্র। দুবেলা ১০ সের চাল লাগে। মা একদিন ব'ল্লেন, "বাবা ব্রজনাথ! যদি আধমণ চাল দাও তো দুটো দিন নিশ্চিন্ত হই।"

বোধ হয় সেইদিনই রজো পিসিমা এসে মাকে বলেন, "প্রবোধের

মা, দাশু কলুকে বলে এসেছি, ব্রজনাথজীর বাড়ী আধমণ চাল পাঠিয়ে দেবার কথা।"

মা অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্রজনাথের কৃপার কথা ভাবতে লাগলেন।

এই ভাবেই উৎকট অভাবের মাঝে পরম নির্ভরতার সঙ্গে প্রসন্ন ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে এসেছেন।

সেই কঠিন অভাবের দিনে বিজ্ঞানানন্দজী বন্ধুর পাশে আপদে বিপদে সম্পদে সদাই জাগরুক। প্রয়োজনে অর্থ দিতে কোন দিন কার্পণ্য করেন নি। একবার তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"লোকে সাধু দেখতে যায়, এবার গৃহী দেখ্‌তে আসবে।"

গুরুদেব ডুমুরদহে এলেন, শিষ্যটিকে চতুষ্পাঠী ক'রে দিলেন। আত্মজকে ছাত্ররূপে শিষ্যকে দিলেন। আর একটি স্থানীয় ছাত্র হ'ল। শিষ্য গুরুপুত্র ব'লে সঙ্কোচ ক'রতে পারে, সেইজন্য গুরু ব'ল্‌লেন—"একে দিয়ে বেড়া বাঁধাবে।" অধ্যাপক-জীবন পাকাপাকি-ভাবে আরম্ভ হ'ল। 'সনাতনের'[১] সম্পাদকত্ব এসে আশ্রয় ক'রলো। অধ্যয়ন অধ্যাপনা, নাম জপ, সন্ধ্যা, অতিথিসেবা এই নিয়ে চ'লেছে তাঁর জীবন। কালীতলায় জঙ্গলের মধ্যে শিবমন্দির হ'চ্ছে তাঁর সাধনকুঞ্জ। সেখানে ভোরে ও সায়াহ্নে সাধন চলে। ১৩৩৩ সালে ৯ই শ্রাবণ রঘুনাথ দাসের[২] জন্ম।

১৩৩৪ সনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা রামাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

অন্নপূর্ণাপূজার পূর্ব্বদিন গুরুদেব (শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর) ডুমুরদহে এসে রামাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। নাম রামায়ণ প্রভৃতি পাঠ পূজা আরতি ইত্যাদি হয়।

১। একটি মাসিক ধর্ম্মপত্রিকা।

২। শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রজনাথকে রামাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। জগদিদি বলেন—"বাবা, যদি ব্রজনাথ এখান থেকে না ওঠেন?" গুরুদেব বলেন—"আমিও উঠবো না।

রামাশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গুরুদেব শঙ্করকে দিয়ে ব'লেছিলেন, "একে দিয়ে বেড়া বাঁধাবে।" এবার সে আদেশ পালিত হ'ল। রামাশ্রমে বন কাটা হয়। শঙ্কর এবং সীতারাম দু'জনে বাবাজীর ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে রামাশ্রমের পশ্চিমদিক ঘেরেন। পাঁচু ডোম ১০ টাকায় তালপাতা দিয়ে চাল ক'রে দেয়। ছিটে বেড়া দেয়। একরাত্রে উই ধরে। দাসপুর থেকে কিষাণ এনে পঞ্চানন চাল তৈরী করায়।

এই হ'ল রামাশ্রম-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত।

বিপুল উৎসাহে যখন 'চরৈবেতি' লীলা চ'লছে, চলছে অতন্দ্রিত সাধন, সেই সময় মাঝে মাঝে তীর্থদর্শনে বেড়িয়ে পড়েছেন। ১৩৩৫ সনে বেশ একটু তীর্থভ্রমণও হ'য়ে গেল।

৪ঠা চৈত্র ক'রলেন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা। বিদায়ের ক্ষণে তাঁর গুরুর চিরপ্রসন্ন মুখ, মলিন, চক্ষু অশ্রুসজল। ধানবাদে গজিনাদাসপুরের পঞ্চাননের ভ্রাতা মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় ওঠেন। মন্মথও ছিল ভক্তিমান শিষ্য। সেখানে ফটো তোলা হ'ল। পঞ্চানন ধানবাদে উপস্থিত হ'লে দু'জনে গয়া যাওয়া হ'ল। 'সন্তর চাকর' বলে একজন লোক সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, কিন্তু যে বাড়ীতে ওঠার কথা, সেখানে না তুলে অন্য বাড়ীতে ওঠায়। কারণ দেখায় যে, তারা এই বাড়ী কিনেছে এবং সকলে কাশীতে কুটুম্ববাড়ী গেছে। পিণ্ডদানাদির পর গয়া থেকে ৺কাশী যাওয়া হ'ল। পরে গুরুদেব দাশরথি দেবযোগেশ্বরের পত্রে জানা গেল, ঐ লোক ঠকিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছলো। সন্তরা কোথাও যায় নি।

৺কাশী যাবার পথে গাড়ীতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি খালিসপুরায় থাকেন। তাঁর বাড়ীতে ওঠা হ'ল। তিনি ও তাঁর মা যথেষ্ট যত্ন করেন। পরে ১৩৫২ সালে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল।

গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথদর্শন প্রভৃতি সেরে প্রসাদ পেয়ে (সেদিন ছিল দ্বাদশী) একলা বৃন্দাবন যাওয়া হ'ল, সঙ্গী পঞ্চানন স্বগ্রাম দাসপুরে ফিরে আসে।

বৃন্দাবনে গোপালজীর বাটীতে ওঠা হ'ল। বাবাজী এবং মায়ী অত্যন্ত যত্ন করেন। ১৮ দিন বৃন্দাবনে থাকা হ'ল। অগণিত মন্দির, 'রাধে রাধে' রব, চৌকিদার চৌকি দেয় 'রাধে রাধে' বলে—এসব বড় ভাল লাগে। (তখন একটী প্রবন্ধ লেখেন, সেটি 'উৎসবে' ছাপা হয়েছিল) তখন দোলের উৎসব চলছে। দোলের জন্য আনন্দের হাট ব'সে গেছে। অনেক বাজী পোড়ানো হয়। মথুরা গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি দর্শন ক'রে কাশীধামে ফেরা হ'ল।

বৃন্দাবনেই সংবাদ আসে—একটি পুত্র হয়েছে। (এই পুত্রের নাম রাখা হল 'রাধানাথ', নিতান্ত শৈশবেই সে চ'লে যায়)।

বৃন্দাবন থেকে কাশীর পথে খুব জ্বর হয়। পানবসন্ত হ'ল। প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ওঠেন। তারপর রামপুরায় তাঁর সাবানের কারখানায় থাকেন। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা গোবিন্দ খুব যত্ন করেন। তাঁদের সাবানের কারখানা, দু'ভাই সাবান তৈরী ক'রতেন—আর ছোট নরসিংহ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ক'রতেন। এঁদের বাড়ী হ'ল ভূতেশ্বর। প্যারীমোহন সর্ব্বদা 'রাম রাম' ক'রতে ক'রতে কাজ ক'রতেন। তারপর গোঁসাইজীর রামায়ণখানি নিত্য পাঠ ক'রতেন। এঁদের সঙ্গ অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ হ'য়েছিল।

প্যারীবাবু ৺নন্দ ভট্টাচার্য্যের শ্যালক। এর আগে মা .ঠাকরুণ মহাবীর প্রতিষ্ঠা ক'রেন, তাঁর পূজোর ভার অর্পিত হয় ব্রজনাথের বাড়ীর ওপর।

আশুবাবুর—সীতারাম তাঁকে কাকা বলতেন—পুত্র পশুপতি তখন কাশীধামে চাকরী ক'রতেন। সীতারাম তাঁকে স্বতন্ত্র একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রতে বলেন। কারু গলগ্রহ হওয়া তাঁর মনঃপূত ছিল না। স্থান যোগাড় হ'ল। কিন্তু প্যারীবাবুর মধ্যম ভ্রাতা গোবিন্দ আপত্তি ক'রলেন—"কেন আপনি যেতে চাচ্ছেন? গলগ্রহ কিসের? আপনি নিত্য পাঠ কীর্ত্তন ক'রছেন, অন্যত্র ক'রলে টাকা দিত—আমরা তা দিচ্ছি না। আর খাওয়া? তাই বা কি? তাঁদের আগ্রহে সেখানেই থাকতে হ'ল।"

এদিকে গুরুদেব, ৺দেবীবাবুর মাতা, গুরুকন্যা কুটাইদিদি, ধীরেন দাদা ও তাঁর শ্যালিকা সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী আসেন। ৺দেবীবাবুর মাতা পুরশ্চরণ করেন। গুরুদেব ৺কাশীতে থাকলেন। ধীরেন দাদা—অর্থাৎ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—সীতারামের গুরু-ভ্রাতা। সিমলাগড়ে বাড়ী, তখন বৈঁচি ষ্টেশনে চাকরী ক'রতেন।

১৩৩৬ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়। শ্রীমদ্ দাশরথি দেব কল্পবাস করার জন্য প্রয়াগ যান। সঙ্গে ছিলেন দেবীবাবুর মাতা ও মির্জ্জাপুরের দিদি(ইনি শিবালয় ঘাটে থাকতেন, তাঁকে পুরশ্চরণের সঙ্কল্প লিখে দেবার জন্য সীতারামের গুরুদেব নির্দ্দেশ দেন, তিনি সেবার কাশীধামে অবস্থানকালীন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন)। কুম্ভমেলার পর শেষের দিকে মাঘের ২৭।২৮ নাগাদ সীতারাম* সেজদি' (তাঁর গুরুভগ্নী), শাশুড়ীমাতা এবং গুরুকন্যা কুটাই সহ প্রয়োগে উপস্থিত হন। কুটাইদি

---

* প্রবোধচন্দ্রের গুরুদত্ত নাম 'সীতারামদাস'।

ও তিনি সারাপথ মুক্তকণ্ঠে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে যান। প্রয়াগেও দু'জনে মুক্তকণ্ঠে নাম ক'রতেন।

প্রয়াগে কুম্ভমেলার শেষে গিয়েও যা দেখেন সে দৃশ্য অপূর্ব্ব, তাতে প্রাণ ভরে গেল।

যমুনার পরপারে বেণীমাধব দেখে আসা হ'ল। গঙ্গার পরপারে যাওয়া হ'ল। মাটির নীচে ছিল এক প্রকাণ্ড গুহা, সেখানে শুয়ে আছেন এক সাধু। জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। বাইরে একজন 'রাম বল' বলা সাধু রয়েছেন। একজন সাধু গাইছেন ঃ

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিতপাবন সীতারাম॥"

এই নাম।

সেখান থেকে এলাহাবাদে এসে এক ভদ্রলোকের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করা হ'ল। তিনি মির্জ্জাপুরের দিদির আত্মীয়। পরদিন শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সকলে বিন্ধ্যাচল গেলেন। পূর্ব্ববৎ কুটাই ও সীতারাম উচ্চকণ্ঠে মহামন্ত্রকীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে সমস্ত পথ পরিভ্রমণ ক'রলেন। বিন্ধ্যবাসিনীকে দর্শন ক'রে বিন্ধ্যাচল থেকে নামছেন; এমন সময় একটি ৫।৬ বৎসরের কালো মত কুমারী সীতারামকে জড়িয়ে ধরে ব'ললে—"বাবু একটি পয়সা"। সীতারাম কুটাইকে পয়সা দিতে বল্লেন। সে চলে গেল। তারপর মনে হ'ল, "এটি কি সত্যই মানব, না আর কেউ!" এই প্রসঙ্গ স্মরণ ক'রলে সীতারাম এখনও বলেন—"সে আজ বহু বহু বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; তবু সেই কালো মেয়েটির কথা মনে হ'লে······।" তিনি বাক্য শেষ করেন না। আবার এ কথাও বলেন—"তেমন সাধনই বা কি আছে যে মা এসে অমন ক'রে ধরবেন।"

তারপর মির্জ্জাপুর হ'য়ে সকলে কাশীধামে ফেরেন। বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করা হ'ল। রাজঘাটের কাছে বাসা করা হ'য়েছিল। একদিন সুর্ত্তি ও জর্দ্দা দেখে সীতারাম বলেন—"বৌদিদি থাকলে কত আনন্দ ক'রতেন।" বৌদিদি—অর্থাৎ শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বরের সহধর্ম্মিণী) গুরুদেব কন্যাকে ব'ললেন—"কুটাই পান কেন, প্রবোধের পান খেতে ইচ্ছা হ'য়েছে।" পান কেনা হ'লে গুরুদেব নিজ হাতে ক'রে জর্দ্দা সুর্ত্তি দিলেন, সীতারাম পান খেলেন। এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে সীতারাম তাঁর গুরুদেবের অলৌকিক ভালবাসার কথা বলেন—বলেন, "মনে কোন ইচ্ছা হবার আগেই ঠাকুর সে ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে দিতেন।"

দেবীবাবুর মাতা ৺কাশীধামে রইলেন। গুরুদেব দিলদারনগর হ'য়ে তারিঘাটে গেলেন। সীতারামসহ আর সব সঙ্গী দিগ্‌স্থই ফিরিলেন।

সাধনা একভাবেই চ'লছে। সাধনার জন্য একটা স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন বোধ হ'ল। গঙ্গার ধারে বিরাট জঙ্গল কাটা হ'ল। একটা ছোট্ট মত কুঁড়ে হ'ল। ১৩৩৪ সালে ৺অন্নপূর্ণাপূজার পূর্ব্বদিন শ্রীরামাশ্রম প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেল। চারিদিকে তুলসীকানন তৈরী হ'ল।

১৩৩৪ সালে ২৯শে বৈশাখ শ্রীরামদয়াল মজুমদার মশাই এলেন। বলেন—"এখানে তোমার আশ্রম হ'লে আমি মাঝে মাঝে এসে থাকবো।"

রাত্রি ৮৷৯ টা। শ্রীব্রজনাথজীর ঘর থেকে সোজা বাইরের ঘর দিয়ে চ'লে গেলেন শ্রীরামাশ্রমে। সহধর্ম্মিণী লক্ষ্য ক'রছেন—পতি পরম দেবতার গতিবিধি। পরণে লাল চেলী। সহধর্ম্মিণী সহধর্ম্মিণীর দাবি নিয়েই তাঁর অনুসরণ ক'রলেন।

বাড়ীতে বৌমার খোঁজ হ'ল। অন্যে জানে না কমলাদেবীর গতিবিধি। মাত্র গুরুপুত্র জানেন। তাই তাঁকেই যেতে হ'ল রামাশ্রমে। ইনি শান্ত, গুরুপুত্রকে দেখেই ব'ললেন—"বাপ্‌জী এসেছিস্ তো? এই দেখ।"

গুরুপুত্র দেখেন দু'জনে রয়েছেন। বল্‌লেন—"ঠাকুমা আমায় পাঠালেন।" গুরুপুত্র ফিরে এলেন।

ব্রজনাথ বিগ্রহের তিনবার আরতি, পাঠ, ভোগ, পূজা প্রভৃতি নিয়মিতভাবেই চ'লছে। নিয়মিত তিন বেলা আরতি হয় ব্রজনাথের। একদিন আরতি সেরে নেমে এলেন। হাসতে হাসতে ব'ল্‌লেন—'বাড়ীতে ছেলেরা থাকতে মেয়েমানুষ কাঁসর বাজাবে—এর চেয়ে আর আশ্চর্য্যের ব্যাপার কি আছে!' তাঁর এই কথাতেই সকলে সাবধান হ'য়ে গেল। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা, বিমল ও ভগ্নি শৈলবালার কন্যা বাল্যকাল থেকেই ব্রজনাথজীর সেবায় অংশগ্রহণ ক'র্‌ছে। নিয়ম ছিল, আরতির সময় ছাত্রদেরও হাজির থাকতে হ'বে। সামনে কর্ত্তব্য দেখা দিল—ভাগ্নীর বিয়ে ও ভাইপোর উপনয়ন। তাঁর লক্ষ্য সবদিকে। কর্ত্তব্য সমাধা ক'র্‌লেন।

ভাইপোকে নিজের আদর্শে গড়ে তোলার জন্য সন্ধ্যা-পূজাদি শেখালেন। তিলক দিলেন। তাঁর কথামত স্কুলের পাঠ বন্ধ ক'রে সংস্কৃত শেখাতে লাগ্‌লেন। কিছু যজমানের কাজও শিখিয়ে দিলেন।

১৩৩৭ সাল বৈশাখ মাস। বাড়ীর প্রায় সকলেই অসুস্থ। তাই কালীতলায় ব্রজনাথজীর বাড়ীর গ্রুপ ফটো তোলা হ'ল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

১৩ই বৈশাখ সকালে গঙ্গায় স্নান ক'রতে গিয়ে শ্রীমতী কমলা-দেবী একবার পায়খানায় গেলেন। পেটের মধ্যে কি রকম ক'রছে!

আবার একবার। স্নান ক'রে এসে ভোগ রাঁধছেন—আবার পায়খানা; গা'টা ধুয়ে যেমন কাপড় বদ্‌লাবার জন্য মাঝের ঘরে ঢুকতে যাবেন, ঘুরে ধানসিদ্ধের নাদার ওপরে পড়লেন। অজ্ঞান। শ্যামাশঙ্কর প্রভৃতি এসে তুলে মাঝের ঘরে শুইয়ে দিলেন। তারপর বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ডাক্তার এল, ওষুধ এল কাজ হ'ল না। তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে মুক্ত হ'লেন রেখে গেলেন এক কন্যা ও দুই শিশুপুত্র।[১]

শবযাত্রা করা হ'য়েছে। গঙ্গায় দাহ করা হবে। শব নিয়ে নাম নিয়ে সকলে আগে আগে চ'লছে। ইনি পশ্চাতে। পথে বুনুবাবুর সঙ্গে দেখা, হেসে—"ভাল আছ তো বুনু।" বুনুবাবু নির্ব্বাক!

কয়েকদিন পরে একজনের সঙ্গে দেখা হ'লে বল্‌লেন—"মেজো[২] চলে গেল! শান্ত সৌম্য।" কোলের ছেলে অল্পদিনের মধ্যেই মায়ের কোলে স্থান পেল।

পৌষে পিণ্ডশ্রাদ্ধাদি ক'রলেন। নিতে হ'ল শর্য্যা। প্রবল জ্বর, ডান পা ফুলে গেল। প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয়, পরে ছটাকবাবু চিকিৎসা করেন। সব পা'টাই পেকে গেছে, অপারেশন্ ক'রতে হবে। ইনি বিছানায় পড়ে 'রাম রাম' করছেন! অপারেশনের দিন এল। খামারগাছির ডাঃ শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন (ছটাকবাবু) চট্টোপাধ্যায় এলেন। রোগীর ঘর থেকে সবাইকে বার ক'রে দেওয়া হ'ল। ডাক্তার আছেন ঘরে, আর আছেন গুরুপুত্র ও গুরুদেবের জামাতা সুধীর; তিনি এখন সন্ন্যাসী নাম শ্রীমদ্‌গিরিজানন্দ। শেষে সকলকে বার ক'রে দেওয়া হ'ল। রইলেন মাত্র ডাক্তার আর

১। শ্রীমতী জানকী দেবী, শ্রীরঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাধানাথ চট্টোপাধ্যায়।

২ শ্রীঠাকুর সহধর্ম্মিণীকে 'মেজো' বলতেন।

গুরুপুত্র রোগীর ঘরে। গুরুপুত্র ডাক্তারের সহায়তা ক'রছেন। সৌরেনবাবু উরুতে দু'ইঞ্চি ছুরি বসিয়ে দিলেন। পুঁজ কৈ?" একটু চিন্তিত হ'লেন। আর একটু ছুরি চালাতেই প্রবল বেগে পুঁজ বেরুতে লাগলো। ইনি শুধু 'রাম রাম' করেই চলেছেন্—নির্ব্বিকার। ডাক্তার আশ্চর্য্য হ'লেন। ভাবলেন—ইনি মানুষ নন্, দেবতা! সেইদিন থেকে তিনি ভিজিট নেওয়া বন্ধ ক'রলেন এ বাড়ী থেকে।

আবার নীচের অংশে পুঁজ হ'ল। ডাঃ মণিবাবু অপারেশন ক'রলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সারল না ঘা। শেষে পতিতপাবনবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক'রতে লাগলেন। তিনি ব'ললেন—একটু Will-force দিন। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হ'লেন। অস্ত্রোপচার যে কী ভীষণ ক'রতে হ'য়েছিল, তা যাঁরা দেখেন নি কল্পনাও করতে পারবেন না। আগে 'রাম' নাম সাধা জীভ্ হঠাৎ 'নারায়ণ নারায়ণ' আরম্ভ করে। একবার তাঁর মনে হ'ল—'তাহ'লে কি অন্তিমকাল উপস্থিত?' আশ্রমের স্বামীজীকে বলেন, 'নারায়ণ তনুত্যাগে, তবে কি তনুত্যাগের সময় এসেছে?' তিনিও বিমনা হ'য়ে গিয়ে সাম্‌লে নিয়ে বললেন··· "না রে না, রাম নারায়ণ একই কথা।" তিনি ও গুরুদেব দেখতে আসতেন। দীর্ঘ তিন মাসের পর বসতে পারলেন। কিন্তু চলার শক্তি নাই। প্রথমে ঘরে 'বারে' ভর দিয়ে চলতেন; তারপর বগলে লাঠি দিয়ে চলতে লাগলেন। এই অবস্থায়ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিজে ক'রেছেন। বৈদিকসন্ধ্যা কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতিনিধি হ'য়ে ক'রেছেন। নিত্য মহাভারতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন অব্যাহত ছিল। প্রজ্ঞা মহারাজ[১] এই সময়ে এসে গান শুনিয়ে যান "মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।"

১। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্বামী। (বেলুড় মঠ)

অসুস্থ অবস্থায় মায়ের সেবার তুলনা হয় না। তিনি বলেন—"মা'র[১] সেবা, সে সেবার তুলনা নাই। শুয়ে শুয়ে মলমূত্রত্যাগ, মা আমার হাসিমুখে সে সব পরিষ্কার ক'রেছেন। খেতে বসেছেন, বাহ্যে পেয়েছে, খাওয়া ছেড়ে ছুটে এসেছেন (আর খাওয়া হয় নি)। জগতে এমন কিছু নাই, যার দ্বারা সে সেবার প্রতিদান দেওয়া যায়। দেহটা যতদিন থাকবে, সে কথা ভুলতে পারবো না। শঙ্করও যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা দেখাশুনা ক'রতো।"

তিন মাস এককাতে থাকার ফলে কোমর আড়ষ্ট হয়ে যায়, কোমরেরও খুব যন্ত্রণা হয়েছিল। শরীর ঠিক হ'তে অনেকদিন সময় গেল। অনেক অনুভূতিকে দুর্ব্বলতা মনে হয়। 'নাদ' রোগ মনে হ'য়েছিল। বল্‌লেন "একদিন মন উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে উঠ্‌তে লাগল। মনে করি দেহত্যাগ হবে। উপরে যাওয়ার পর শুনলাম কাজ আছে। মন ক্রমে নেমে এল।" অন্যেও ভীত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে দেখতে আসেন। তিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন !

তাঁর জীবন চ'লছে—যেন একটানা অচঞ্চল অনির্ব্বাণ হোমশিখা। সমগ্র জীবনটিই যেন একটি অবিরাম অতন্দ্র নীরন্ধ্র তপস্যা। প্রতিটি পদক্ষেপ একটী তপস্যা ! তপস্যা তাঁকে ক'রতে হয় নি। তপস্যাই তাঁকে আশ্রয় ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছে। তপস্যা তাঁর পিছু পিছু ছুটেছে, তাঁর চরণে লগ্ন হ'য়েছে। তাঁর ছিল না তপস্যার প্রয়োজন, তপস্যারই প্রয়োজন তাঁকে। সে এক বিচিত্র অপূর্ব্ব সাধনলীলা। স্বপাক, মৌন, স্বাধ্যায়, অধ্যাপনা, নিরন্তর ধ্যান, সব একটির পর একটি আবর্ত্তিত হ'চ্ছে। তিনি শুধু সাক্ষী, দ্রষ্টা। নেই আয়োজন প্রয়োজন,

১ শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা, শুধু তপস্যার লীলা নিত্য উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যাচ্ছে। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সাধনার লীলা স্বকীয় প্রয়োজনেই প্রতিমুহূর্ত্তে উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে।

১৩৩৮ সালে ১৬ই কার্ত্তিক স্বপ্নে ব্রাহ্মী দীক্ষা হ'ল। গুরুদেবকে জানালেন। গুরুদেব নিরুত্তর। শ্রাবণ মাসে গুরুকে পত্রে নিজের সংশয়ের কথা জানালেন। উত্তর এল গুরুপুত্র শঙ্করের মুখে—

(১) জগদীশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।

(২) জগৎ পরিবর্ত্তনশীল।

(৩) য্যায়সা দিন নেহি রহে গা।

১৩৩৯ সালে ৩১শে ভাদ্র গুরুদেব তারিঘাটে জপ ক'রতে ক'রতে মহাপ্রয়াণ ক'রলেন।

তাঁর স্থানে মহাদেববাবুর বাটীতে পূজা ক'রতে গেলেন। ইনি পূজক, মহানবমী, রসুলপুর, মহাদেববাবুর বাড়ী। ইনি নিদ্রিত। গুরুদেব স্বপ্নে বল্‌লেন—"আমি ক্ষুধার্ত্ত।" ঘুম ভেঙ্গে গেল। চিন্তা ক'রলেন—'কিসের ক্ষুধা!' ভাসল—আপনি যে ক্ষুধা নিয়ে গেছেন, সে নামপ্রচারের ক্ষুধা। যদি কখন এ কীটানুকীটকে শক্তি দেন, তাহ'লে মিটবে।" এ ক্ষুধা কি শুধু গুরুরই? বাল্যকাল থেকে যে নামপ্রচার চ'লছে, সেটা কি দয়াময়? না একেই বলে গুরুভক্তি?

ভাইপো ও গুরুপুত্রের শিক্ষার ভার তো ছিলই, এবার পুত্রের শিক্ষার ভার তার সঙ্গে যোগ হ'ল। পুত্রের পাঠ পাঠশালায় চ'ল্‌তে লাগলো। অধ্যাপনা ও বিশ্রামকালে কাছে রাখতে লাগলেন পুত্রকে। "রাম" নাম জপ ক'রতে শেখালেন। ভাইপোর কিছু পরিবর্ত্তন এল। বাড়ীতে পড়াশুনা হয় না ব'লে বাইরে পড়তে চ'লে গেলেন।

তিনি নিয়মিত বাইরের ঘরে চৌকিতে বসে পড়াতেন। ছাত্ররা

মাটীতে কম্বল বা মাদুর পেতে ব'সতো। প্রথমে এক অধ্যায় গীতা পাঠ ক'রে তবে পড়াশুনার কাজ আরম্ভ হ'ত। প্রথমে পড়াতেন, লেখাতেন। তারপর পড়া ধরতেন। পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে ছাত্রদের সন্ধ্যা শিখতে হ'ত।

মধ্যাহ্ন আহারের পরই পুত্রকে ডাকতেন। তিনি শুয়ে বিশ্রাম ক'রতেন (নিদ্রা নয়)। পুত্রকে রামায়ণ প'ড়ে শোনাতে হ'ত। অনেক ভক্তচরিত্রও শোনাতে হ'ত। আর একটী বইয়ে 'শ্রীরাম রাম রাম' ছাপা ছিল, তার কয়েক পাতা পড়তে হ'ত। তারপর ইনি পড়াতেন, কাছে থাকৃতে হ'ত। উপনয়নের আগেই মুখে মুখে বহু দেবদেবীর প্রণাম ও ধ্যান শিখিয়েছিলেন।

ছেলেদের শাসন করতে হ'বে। মারা চ'লবে না। "যে বেশী ছেলে মারে, তার হাতে ভোগ নেবে না সীতারাম"—এক সময় একজনকে ব'লেছিলেন। নিজে শাসন ক'রতেন, হয় বাগানে গাছে বেঁধে রাখতেন, নয় হাতে ইট দিয়ে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তাও বিচার ক'রে তবে শাসন। একটা বিশেষ নিয়ম ছিল—"ছেলে যত অন্যায়ই করুক, খাবার সময় কিছু বল্তে পাবে না কেউ।" ছেলে তো ছেলেমানুষ, ভয়ে বুড়ো পর্য্যন্ত কাঁপতো।

কি যেন খুঁজছেন। "একি, এত আম কোথা থেকে এল ?" অমুক পেড়ে এনেছে।

ইনি—"কেন না বলে পেড়ে এনেছে ? এখনই তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

তথাস্তু। শিশুপুত্র আম কুড়িয়ে এনেছে ; প্রতিটি আম পরীক্ষা করছেন। শেষে বল্লেন—"দেখো বাবা, যেন পেড়ে এনো না।"

সাধকজীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন

মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্টতা। কলির বেদব্যাসরূপে বহুপূজিত সনাতন ধর্মের স্তম্ভ তর্করত্ন মশায় ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্রের মত দাপ্যমান।

সন ১৩৩৯, 'বঙ্গবাসী'র আশ্বিন সংখ্যায় তর্করত্ন মশায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মা'র উদ্দেশ্যে রচিত এই প্রবন্ধে বহু ব্যথা নিবেদিত হয়। সীতারাম সে প্রবন্ধ প'ড়ে তাঁকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একটি পত্র দেন, লেখেন,—"শাস্ত্রপাঠ ক'রলে, স্বধর্মে অবস্থান ক'রলে, মানুষের কি দুঃখ দূর হয় না? সনাতন ধর্মের যিনি স্তম্ভ, তাঁর তবে এ ব্যথা কি জন্য?" তিনি পত্রের উত্তর দেন। এই প্রথম পত্রালাপ।

এর অনেক আগেই দর্শন হয়। সীতারাম তখন পুরাণ পড়েন। একবার ভাটপাড়ার শরৎ ভট্টাচার্য্য মশায়ের বাড়ী গেলে (শরৎ ভট্টাচার্য্য সিমলাগড়ে তন্ত্রধারকতা ক'রতেন), তাঁর পুত্র তর্করত্ন মশায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, "ইনি সর্ব্বদা 'রাম রাম' করেন।" তা শুনে তর্করত্ন বলেন—'রাম রাম' করা ভাল, তবে ব্রাহ্মণের শাস্ত্ররক্ষা করা দরকার।"

তারপর ১৩৪০ সনে দর্শন ও মিলন। সীতারাম চাতুর্মাস্যব্রত পালন ক'রছেন। ত্রি-সন্ধ্যা জপ-ধ্যান, নিত্য হোম, নিত্য তিলতর্পণ ইত্যাদি নিষ্ঠাভরে অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। কিন্তু মন্ত্ররক্ষা ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। প্রণবপুটিত মন্ত্র ছিল, প্রথম প্রণব উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র গড়াতে থাকে। শেষে অবস্থা এমন হ'ল যে মন্ত্র রাখা আর যায় না। একথা তর্করত্ন মশায়কে জানান হোল। তর্করত্ন মশায় লেখেন—"তোমার পূর্ব্ব সুকৃত তোমাকে উচ্চস্তরে স্থাপিত করিতেছে, আমরা তোমায় স্পর্শ করিতে পারি কি না, বলিতে পারি না।"

পৌষী অমাবস্যায় তর্করত্নমশায় রামাশ্রমে আসেন। স-সঙ্গী স্বামী ধ্রুবানন্দগিরি রামাশ্রমে এসে তাঁর অভ্যর্থনা করেন এবং নিজ আশ্রমে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তর্করত্ন মশায় ব্রজনাথের বাটী হ'য়ে উত্তমাশ্রমে যান। সীতারামকে বলেন—"ভালই হয়েছে, চিন্তা নাই।" শ্রাদ্ধসন্ধ্যাদি প্রতিনিধি দ্বারা করাবার উপদেশ দেন। সীতারাম শ্রাদ্ধ করতে অপরাগ, যেহেতু কর্ম্মের অবসান হ'য়েছে। বোধ হয় সেইজন্য তাঁর কাজ করার জন্য তাঁর পিতার শ্রাদ্ধের দিন তর্করত্ন মহাশয় ডুমুরদহে পদধূলি দেন। এই হ'ল প্রথম মিলন।

১৩৪০ সন, ২০শে ফাল্গুন, তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'দিগ্ সুই সাধন সমিতি'র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'বর্ণাশ্রম স্বরাজ সংঘে'র অধিবেশন হয়। মেড়ে টোলের অধ্যাপক শ্রীবামনদাস পণ্ডিত মশায় এবং শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ আসেন।

তর্করত্ন মশায় ও সাংখ্যতীর্থ মশায় বক্তৃতা করেন। ১২ চৈত্র (১৩৪০) 'বঙ্গবাসী'তে তার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

১৩৪১ সন, সীতারাম কাশী যান। তর্করত্ন মশায়ের সঙ্গে মান সরোবরে দেখা করেন।

বোধ হয় ১৩৪৩ সনে তর্করত্ন মশায়কে নাম ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের কথা লেখেন। তর্করত্ন উত্তর দেন—"কি প্রয়োজন?" তাঁর উত্তর পাবার পর লেখেন—"আমি তোমায় 'যোগানন্দ' উপাধি দিলাম। ইচ্ছা হয়ত নামরূপে ব্যবহার ক'রতে পার।" তিনি পত্রে কখনও 'যোগীরত্ন' পাঠ লিখিতেন।

এই হ'ল তর্করত্ন মশায়ের সঙ্গে মিলনের ইতিবৃত্ত।

* * * *

১৩৪০ সালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। উত্তমাশ্রমের তদানীন্তন

অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরির জন্মভূমি, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রামজীবনপুর গমন। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি যাবার আদেশ ক'রে-ছিলেন। স্বামীজি আগেই গিয়েছিলেন। পরে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কেশবানন্দ গিরির সঙ্গে সেখানে যাওয়া হয়।

(ডাক্তারবাবু) বোধানন্দই উদ্যোগী, তাঁর প্রার্থনায় শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরির জীবনী ক্ষুদ্রাকারে লেখেন; সেটি মুদ্রিত হয়েছে।

লোকে লোকারণ্য। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'—রব। সীতারামকে দেখে শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরির আনন্দের অবধি ছিল না। সন্ধ্যার পর সভা হ'ল। স্বামীজি তাঁর শ্বশুরকে (এঁকে তিনি আদর করে 'শ্বশুর' বলতেন) কিছু ব'লতে আহ্বান করেন। উঠে ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। কিন্তু ব'লতে ব'লতে হঠাৎ খাই হারিয়ে গেল! কোন কথা আর এল না! তখন অসহায়ভাবে গিরিমহারাজকে ব'ল্‌লেন—"বসি"। তিনি বল্‌লেন—"বসো"। সভার মাঝে খাই হারানো বোধ হয় সেই প্রথম।

পরদিন:—বিষ্ণু (একটী ফর্সা রোগা যুবক) বলছেন—"কি দাদা, কাল কি হ'ল?"

"কি জানি ভাই, এ রকম তো হয় না।"

গিরি মহারাজ ব'ল্‌লেন—"ভাব বেশী হ'লে ভাষা থাকে না।"

সে'বার গিরিমহারাজ যে এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত লীলাভূমি এঁকে দেখানো, যাতে ইনি তাঁর জীবনী লিখতে পারেন। বিভিন্ন জায়গার ফটো নেওয়া হ'ল, যাতে ব্লক করে জীবনীর সঙ্গে দেওয়া যায়। কেশবানন্দজী একটি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি কয়েক জায়গার ফটো তোলেন।

পরে একবার কথায় কথায় গিরি মহারাজ বলেন—"দেখ, তুই

ভিন্ন আমার জীবনী কেউ ফোটাতে পারবে না।" এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে তিনি অনেক পরে ব'লেছিলেন, "কিন্তু আমি তাঁর জীবনী লিখতে পারি নি।"

ধ্রুবানন্দ গিরি ব'ল্লেন—"আমার আঁতুড়ঘরে তুই চণ্ডী পাঠ কর। এই আদেশের কারণ ছিল। বৎসর বৎসর শ্রীমদ্ উত্তমানন্দ স্বামীর তিরোভাব-উৎসব উপলক্ষ্যে চণ্ডীপাঠের ভার এঁর ওপর থাকতো। এঁর চণ্ডীপাঠের সুখ্যাতি ছিল। ইনি চণ্ডীপাঠ ক'রতেন, এঁর যথেষ্ট আনন্দ হ'ত। শ্রোতারাও শুনে আনন্দ ক'রতেন। যাক্।

চণ্ডীপাঠ তো আরম্ভ ক'রলেন। ওদিকে কাছেই বালিকারা গিরি মহারাজকে মধ্যে রেখে বন্দনাগান আরম্ভ ক'রল। এঁর আশঙ্কা হ'ল, "পাশে এই রকম গান হ'চ্ছে, আনন্দ পাবো না।"

কিন্তু মহাপুরুষের জন্মস্থানের অপূর্ব্ব মহিমা। বোধ হয় শক্রাদি মাহাত্ম্যের পর সমস্ত শরীরে ক্রিয়া হ'তে লাগ্‌লে। হস্তাদি কখনও ঊর্দ্ধে কখনও পার্শ্বে, এইরূপে উঠতে লাগ্‌ল। জীবনে চণ্ডীপাঠ বহু ক'রেছেন, কিন্তু সর্ব্বশরীরব্যাপী ভাবতরঙ্গ কখনও খেলা করে নি! যথেষ্ট আনন্দ হ'ল।

পরে কৃষ্ণানন্দ বলেন—"এরূপ ভাব দেখানো ভাল হয় নি।" কিন্তু সে ভাবে এঁর কোনও স্বাধীনতা ছিল না।

এর আগের দিন সভায় এঁর রচিত গান গাওয়া হ'য়েছিল :—

যে দেশের আলো দেশ উজলিল।

নমো নমো নমঃ সে দেশচরণে॥"

সেখান থেকে সকলে মিলে স্বামীজি মহারাজের মামার বাড়ী যাওয়া হয়! স্বামীজির 'শ্বশুর', সম্পর্কে তাঁর মাসীমা, তাঁরা এঁর বেহাল হ'লেন। তাঁরা খুব আনন্দ ক'রতে লাগ্‌লেন। কেশবানন্দ

অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরির জন্মভূমি, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রামজীবনপুর গমন। স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি যাবার আদেশ ক'রে-ছিলেন। স্বামীজি আগেই গিয়েছিলেন। পরে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কেশবানন্দ গিরির সঙ্গে সেখানে যাওয়া হয়।

(ডাক্তারবাবু) বোধানন্দই উদ্যোগী, তাঁর প্রার্থনায় শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরির জীবনী ক্ষুদ্রাকারে লেখেন ; সেটি মুদ্রিত হয়েছে।

লোকে লোকারণ্য। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'—রব। সীতারামকে দেখে শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দ গিরির আনন্দের অবধি ছিল না। সন্ধ্যার পর সভা হ'ল। স্বামীজি তাঁর শ্বশুরকে (এঁকে তিনি আদর করে 'শ্বশুর' বলতেন) কিছু ব'লতে আহ্বান করেন। উঠে ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। কিন্তু ব'লতে ব'লতে হঠাৎ খাই হারিয়ে গেল! কোন কথা আর এল না! তখন অসহায়ভাবে গিরিমহারাজকে ব'ল্লেন —"বসি"। তিনি বল্লেন—"বসো"। সভার মাঝে খাই হারানো বোধ হয় সেই প্রথম।

পরদিন :—বিষ্ণু (একটী ফর্সা রোগা যুবক) বলছেন—"কি দাদা, কাল কি হ'ল ?"

"কি জানি ভাই, এ রকম তো হয় না।"

গিরি মহারাজ ব'ল্লেন—"ভাব বেশী হ'লে ভাষা থাকে না।"

সে'বার গিরিমহারাজ যে এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত লীলাভূমি এঁকে দেখানো, যাতে ইনি তাঁর জীবনী লিখতে পারেন। বিভিন্ন জায়গার ফটো নেওয়া হ'ল, যাতে ব্লক করে জীবনীর সঙ্গে দেওয়া যায়। কেশবানন্দজী একটি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি কয়েক জায়গার ফটো তোলেন।

পরে একবার কথায় কথায় গিরি মহারাজ বলেন—"দেখ, তুই

ভিন্ন আমার জীবনী কেউ ফোটাতে পারবে না।" এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে তিনি অনেক পরে ব'লেছিলেন, "কিন্তু আমি তাঁর জীবনী লিখতে পারি নি।"

ধ্রুবানন্দ গিরি ব'ল্লেন—"আমার আঁতুড়ঘরে তুই চণ্ডী পাঠ কর। এই আদেশের কারণ ছিল। বৎসর বৎসর শ্রীমদ্ উত্তমানন্দ স্বামীর তিরোভাব-উৎসব উপলক্ষ্যে চণ্ডীপাঠের ভার এঁর ওপর থাকতো। এঁর চণ্ডীপাঠের সুখ্যাতি ছিল। ইনি চণ্ডীপাঠ ক'রতেন, এঁর যথেষ্ট আনন্দ হ'ত। শ্রোতারাও শুনে আনন্দ ক'রতেন। যাক্।

চণ্ডীপাঠ তো আরম্ভ ক'রলেন। ওদিকে কাছেই বালিকারা গিরি মহারাজকে মধ্যে রেখে বন্দনাগান আরম্ভ ক'রল। এঁর আশঙ্কা হ'ল, "পাশে এই রকম গান হ'চ্ছে, আনন্দ পাবো না।"

কিন্তু মহাপুরুষের জন্মস্থানের অপূর্ব্ব মহিমা। বোধ হয় শক্রাদি মাহাত্ম্যের পর সমস্ত শরীরে ক্রিয়া হ'তে লাগ্‌লে। হস্তাদি কখনও ঊর্দ্ধে কখনও পার্শ্বে, এইরূপে উঠতে লাগ্‌ল। জীবনে চণ্ডীপাঠ বহু ক'রেছেন, কিন্তু সর্ব্বশরীরব্যাপী ভাবতরঙ্গ কখনও খেলা করে নি! যথেষ্ট আনন্দ হ'ল।

পরে কৃষ্ণানন্দ বলেন—"এরূপ ভাব দেখানো ভাল হয় নি।" কিন্তু সে ভাবে এঁর কোনও স্বাধীনতা ছিল না।

এর আগের দিন সভায় এঁর রচিত গান গাওয়া হ'য়েছিল :—

যে দেশের আলো দেশ উজলিল।
নমো নমো নমঃ সে দেশচরণে॥"

সেখান থেকে সকলে মিলে স্বামীজি মহারাজের মামার বাড়ী যাওয়া হয়! স্বামীজির 'শ্বশুর', সম্পর্কে তাঁর মাসীমা, তাঁরা এঁর বেহাল হ'লেন। তাঁরা খুব আনন্দ ক'রতে লাগ্‌লেন। কেশবানন্দ

তারাজুলি নদী, শ্মশান প্রভৃতির ফটো তোলেন। আরও কয়েক জায়গায় যাওয়া হ'ল যেখানেই যান, আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হ'তে থাকে, আর আসবার সময় মায়েদের চোখের জলে বিদায় নিতে হয়। যে গ্রামে যাওয়া হয়, সেখানে আনন্দের স্রোত এবং যে গ্রাম ত্যাগ করা হয়, সেখানে অশ্রুর বন্যা ব'য়ে যায়। এই প্রথম ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে এ ব্যাপার দেখা গেল। পরে অবশ্য এটা দৈনন্দিন ব্যাপারের মত হ'য়েছে।

এবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

১৩৪০ সনে আরও জোর করে সাধনায় নেমে পড়লেন। চাতুর্মাস্য কালে হবিষ্য চলছিল আগে থেকেই। এবার নিত্য হোম ও বৈশ্বদেব বলি, ক্রমে নিত্য তর্পণ, পূজা জপ ধ্যানাদি তো বটেই, পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে।

মন্ত্র রক্ষা করা কঠিন হ'ল। প্রণবপুটিত মন্ত্র ছিল। প্রণব উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে লাগলো। মন্ত্র রাখা যায় না। ১৩ই শ্রাবণ কলসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র গ্রহণ ক'রলেন।

কাজ বন্ধ হওয়া দেখে গুরুকন্যার ভয় হ'ল, বল্‌লেন—"কাকামণি, ডাক্তার দেখান।" ডাঃ শ্রীদীনবন্ধু ঘোষের কাছে গেলেন। রোগী দেখে ডাক্তার বল্‌লেন—রোগ নয়, সমাধির পূর্ব্বাবস্থা।

চাতুর্মাস্য গেল। পৌষে গোপনে রামাশ্রমে গুহা খোঁড়া হ'ল। মকর-সংক্রান্তিতে মৌন নিলেন। গুরুপুত্রের ওপর ভার পড়ল ব্রজনাথ গ্রন্থাগারের ও চতুষ্পাঠীর। অন্য সব কাজের ভার ছাত্রদের উপর রইল।

চলছে প্রণবজপ। ঘড়ির আওয়াজ এল। মাত্র ৩।৪ দিন হয়েছে। দুই কাণের কাছে বামাকণ্ঠে ও পুরুষকণ্ঠে 'হরে কৃষ্ণ' নাম চল্‌ছে। ৫।৬ দিনের মধ্যেই বহুযন্ত্রে বহুকণ্ঠে দিবারাত্র—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

নামকীর্ত্তন আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যাকালে আরও কত রকম বাজনা হ'ত। অনেক সময় নামের দল আসছে মনে হ'ত।

চিন্তা এল, পথ ভুল হয় নি তো। মাসের মাঝামাঝি গঙ্গার ধার দিয়ে গোপনে উত্তমাশ্রমে স্বামীজির কাছে গেলেন। তিনি সব শুন্‌লেন। কিছুক্ষণ স্থির হ'লেন। বল্‌লেন—"পথ ভুল হয় নাই, তোকে ঠাকুর সমস্ত রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।" ইনি মৌনে ফিরে এলেন। ২২।২৩শে পৌষ গায়ত্রীজপের চেষ্টা ক'রলেন, আকাশ এসে উপস্থিত। আবার উত্তমাশ্রম। স্বামীজি—"তুই বিরাটের মধ্যে গিয়ে পড়লি।" মৌনভঙ্গের পর তর্করত্ন মশাইকে লিখলেন সব। উত্তর এল "তোমার পথ ভুল হয় নি, এখন প্রণব অথবা নাদ, কোন পথ অবলম্বন করা বিধেয় দেখতে হবে।" হাওড়ায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের কাছে গেলেন।

প্রবোধচন্দ্র—"মন্ত্র চলে গেল, ইষ্টদর্শন হ'ল না?"

বিজয়বাবু—"মহাকাশে হ'বে, খুব সাবধানে অগ্রসর হও।" আর কত সাবধান হবে প্রভু?

রসুলপুরে পূজা করতে গেছেন জন্মাষ্টমীর রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—তাঁকে আশ্রমের (১) ঠাকুর বলছেন—"আমার কাছে আয়, উপদেশ দিব।" ফিরে এসে গেলেন। আশ্রমের ঠাকুর উপদেশ দিলেন। "ধারণার সঙ্কেত কার্য্যকরী হইল না। প্রাক্তন সাধনাই এটাকে অবশভাবে টানিয়া লইয়া চলিল।" (১৩৪১)

১। শ্রীধ্রুবানন্দগিরি মহারাজ।

আশ্রমের ঠাকুরের স্নেহের তুলনা নেই। এঁকে পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যাত্ম-আলোচনা চল্‌ত। আদর ক'রে আশ্রমের ঠাকুর 'শ্বশুর' বলেন তাঁকে; তাঁর ছেলেমেয়েদেরও সেইমত সম্বোধন করতেন, মেয়েকে বউ, ছেলেকে সম্বন্ধী। ব্রজনাথজীর বাড়ী যেন তাঁরই (আশ্রমের ঠাকুরের) বাড়ী ছিল। সে কি অপূর্ব্ব স্নেহ! এই সময় 'কথা রামায়ণের' আবির্ভাব হয়। ৺কাশীধামে শ্রীবলভদ্র দাস 'শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর' দিলেন। ইনি মাথায় করে নিলেন।

অনুভূতির ব্যাখ্যার জন্য বহু লোকের কাছে গেলেন। প্রায় লোকই বুঝলেন না। বুঝলেন মাত্র দু'তিনজন। একজন উল্‌টে ব'ল্‌লেন—"তোমার অনুভূতি নেই।" ইনি সবই শুনেন অজ্ঞের মত। অন্তরে উদয় হ'ল—"আর কারুর কাছে যাস্‌ না। অনুভূতি নেই তো কি আছে?"

যথাকালে পুত্রের উপনয়ন ও কন্যার বিবাহ দেওয়া দরকার। কর্ত্তব্যের তাড়না এল। পাত্রের সন্ধান চলতে লাগলো। ফাল্গুনে পুত্রের উপনয়ন হ'য়ে গেল। সেই সুযোগে আরও তিনটি ছেলের উপনয়ন হ'ল। বৈদিক সন্ধ্যাদি শেখাতে লাগলেন পুত্রকে। নিত্য শিবপূজা, নারায়ণপূজা করাতেন পুত্রকে। তিলক দিলেন। লক্ষ্মীপূজাও শেখালেন। অমরকোষ পড়াতে আরম্ভ ক'রলেন। অনেক সময় সঙ্গে রাখতেন পুত্রকে; তুলসীবাগান, ফুলবাগান করা, বেড়া বাঁধার সময়ও।

পাত্রের সন্ধান মিল্‌ল। ১৩৪২ সনে শ্রাবণ মাসে কন্যার বিবাহের ঠিক হ'ল। গায়েহলুদের আগের দিন সংবাদ এল, পুত্রের মাতা দেহ ত্যাগ করেছেন, বিয়ে হবে না। এদিকে সব জোগাড়। আশীর্ব্বাদও হ'য়ে গেছে। বাড়ী কুটুম্বের কোলাহলে মুখর হ'য়ে উঠেছে। তাই তো? উপায়? মাতা ভেবেই আকুল। ইনি মা'কে শান্ত ক'রলেন, ব'ল্‌লেন—"পাত্র যেখানেই থাকুক না কেন, তিনদিন

পরে যে দিন আছে, সেইদিনে বিয়ে দেব। তুমি মা কাউকে ছেড় না।" ইনি তখনই বেরিয়ে পড়লেন।

পাত্রের সন্ধানে কোলকাতায় এলেন। উদ্দেশ্য, যারা বাজার করতে গেছে, তাদের ঘটনা জানানো, আর আসামে একটী পাত্র আছে, সেখানে যাওয়া। আসাম যাওয়া হ'ল না। খন্যানে হাজির হ'লেন। পাত্র গোরক্ষপুরে চাকরী করেন। পাত্রের পিতা টেলিগ্রাম ক'র্লেন। ইনি ভাবী বেয়াইকে এনে মেয়ে দেখিয়ে দিলেন। যথা সময়ে বিয়ে হয়ে গেল। সালঙ্কারা কন্যা দান কর্লেন। বরাভরণও দেওয়া হ'ল। ইনি ধীর, স্থির, অচঞ্চল।

শরীর বেশ গোলমাল ক'রছে। কলিকাতায় মামার বাড়ী চিকিৎসার জন্য গেলেন। চিকিৎসা চলছে। আশ্রমের ঠাকুরটিও পদধূলি দিতে ভুল্লেন না। রাধারমণবাবু[1] ভুজেন্দ্রবাবুকে[2] নিয়ে হাজির হ'লেন। ভুজেনবাবু দীক্ষা চাইলেন। 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র জপের কথা ব'ল্লেন। সাধনসঙ্কেত কিছু দিলেন। ভুজেনবাবু ১০ লক্ষ তারকব্রহ্ম নাম জপ ক'রতে চাইলেন। ইনি শূদ্রকে দীক্ষা দিতে রাজী হ'লেন না। ব্রাহ্মণকে ৪।৫ লক্ষ গায়ত্রী জপ ক'রে দীক্ষা নিতে হ'ত। প্রথম শূদ্রশিষ্য, তাঁর খেলার সাথী "মিন্তা" (জগদিদির মেয়ে) আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়। এর মধ্যে বেয়াইটীও মন্ত্র নিলেন। বেয়াই তাঁকে আশ্রয় ক'রলেন।

১৩৪৩ সন এল। ক্রমে সব কাজই অচল হ'য়ে এল। পড়াবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা রইল না। পড়াতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাঠ বন্ধ হ'য়ে যায়।

১। শ্রীরাধারমণ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস, পি।

২। রায় সাহেব শ্রীভুজেন্দ্র নাথ সরকার।

বাইরের ঘর। হরিবাসরের মঞ্চ ভাঙ্গছেন; "মা…ও মা…"শব্দে মা এলেন। ইনি—"মা, তোমার ছেলে রাজা হ'বে, দেখ মাথায় জোড়া টিকটিকি পড়েছে। তবে একটা সাদা, একটা কালো। কাজেই সাধুও হ'বে, রাজাও হ'বে।" মৌন নেওয়া স্থির হ'ল। সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করবেন। কর্ত্তব্য স্মরণ হ'ল। গুরুপুত্রকে টোল ক'রে দিলেন। পুত্র হ'ল ছাত্র। বাড়ী এলেন—পুত্রকে সব প্রজা-বাড়ী দেখিয়ে দিলেন; ব'লেন—"এরা ব্রজনাথজীর প্রজা।" টোলের ছাত্রদের অন্যত্র যেতে ব'ল্লেন! নিজের অক্ষমতার কথা জানালেন। মৌনের কাল এল।

আগে একমাস ক'রে মৌন চলত। এবার হ'ল অনির্দ্দিষ্টকাল। বেশ পরিবর্ত্তনের ঠিক হ'ল। ত্রিবেণীতে দীক্ষাস্থানে দুই বেয়াই-এ গেলেন। কলসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রলেন। কাপড় ছোট হ'ল, কৌপিন হ'ল। নাম হ'ল 'ওঙ্কারনাথ'। এই নাম ধ্যানকালে আসে। এখন গ্রহণ করলেন। তারপর গেলেন আশ্রমের ঠাকুরের কাছে। তিনি একটা নতুন কাপড় থেকে কৌপিন ও বহির্বাস ক'রে দিলেন এবং বল্লেন—আজ থেকে তোমার নাম ওঙ্কারনাথ। ফিরে এলেন। 'সীতারামদাস' নাম গুরুদেব অনেকদিন আগে দিয়েছিলেন।

মৌন গ্রহণের দৃশ্য, অপূর্ব্ব অনুপম। না দেখলে তার কিছুই অনুভূত হ'বে না। রাত্রে নাম পাঠ শেষ হ'ল। রামজীর শীতল হ'ল। প্রসাদ নিলেন। সকলে প্রসাদ পেলেন। একদিকে মেয়েরা একদিকে ছেলেরা ব'সে আছে। প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলাপ ক'রতে লাগলেন। কিভাবে চল্‌তে হবে, তাও ব'লে দিতে লাগলেন। মুখে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সকলে প্রণাম ক'রলেন, জয় দিলেন। ৺ব্রজনাথজীউর বাড়ী ঘুরে এসে তিনি ধীরে ধীরে পেছুতে লাগলেন।

সকলের চোখে জল। গাছপালাগুলো আকুতি জানাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই খিল্ দিলেন। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্‌লো! পাখীর কলরবে গাছপালার ক্রন্দন শ্রুত হ'ল।

আরম্ভ হ'ল মৌন—কাষ্ঠমৌন। আধ্যাত্মিক জগতের বিচিত্র রহস্য আবির্ভূত হল। কত নাদ, কত জ্যোতি এলো এবং গেল, শাস্ত্রে তার ভগ্নাংশেরও ভগ্নাংশমাত্র উল্লিখিত আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর নেই ভ্রূক্ষেপ। সাধনার বহুপূর্ব্বে বুঝিবা এদেহধারণেরও আগেই তিনি ছিলেন সিদ্ধ, পূর্ণ। তা না হ'লে—কি আর ছ'বছর বয়সে ঘটে সাক্ষাৎদর্শন, অথবা ছাব্বিশে পুনশ্চ দর্শন, আলাপন, স্পর্শন; ছাব্বিশেই পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এ হেন সিদ্ধাতিসিদ্ধের কেন আবার সাধনার অভিনয়? সবের আগে সাধনা পরে সিদ্ধি, এঁর আগে সিদ্ধি, পরে সাধনা।

এঁর সাধনা কার জন্য? আমাদের জন্যই এত কঠোর সাধনা। আমাদের উদ্ধারের সহজ সরল পথ দেখাবার জন্য। কিন্তু প্রভু! তোমার এত কষ্ট দেখা যায় না। কাজ নেই উদ্ধারে। তুমি যদি ভাল থাক ত' নরকও অনেক ভাল।

মৌন চল্‌ছে। ১লা ফাল্গুন স্বপ্নে গুরুদেব জানালেন—ইনি কোন সম্প্রদায়। গুরু একটি চিত্র দেখালেন, বল্‌লেন—"তোমার এই ভাব, অর্থাৎ সেব্য-সেবক ভাব।" তারপর বল্‌লেন—"নাম প্রচার করতে হবে।" স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। মৌন চল্‌ছে। সে যে কত নাদ, কত জ্যোতি, কত বিচিত্র সুরে কীর্ত্তন, তা বর্ণনা অতি সুদুষ্কর। মাঝে মধ্যে বেরিয়ে এসে মাথায় জল দিচ্ছেন। চল্‌ছে সাধনা। ১৮ই ফাল্গুন কানের কাছে ট্যাম্‌টেমি বাজিয়ে অনবরত বল্‌তে লাগল—"নেচে নেচে আয়রে তোরা, ঋষি তুমি ঝাঁপিয়ে

পড়।" এই আদেশেই মৌনত্যাগ হ'ল—১৯শে ফাল্গুন। তাঁর ভাষায়—"জয়গুরু নাদই কৃতার্থ করেছে। একদিন ভাস্‌ল, এই সম্প্রদায়ের নাম হ'বে 'জয়গুরু সম্প্রদায়'। তাই এই সম্প্রদায়ের নাম হ'ল 'জয়গুরু সম্প্রদায়'। এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। এটা...... 'জয়গুরু সম্প্রদায়ে'র নামকরণের কারণ এই 'জয়গুরু'......এই জয়গুরুনাদকে জয়গুরু সম্প্রদায় আখ্যা দিয়েছিলাম।" 'জয়গুরু সম্প্রদায়'—এই শব্দের মধ্যে দু'টো রহস্য আছে—প্রথম এ সম্প্রদায়ের সাধনা গুরুপ্রধান ; দ্বিতীয় রহস্য—পথ নাদময় অর্থাৎ লয়যোগ। নাদ অর্থাৎ অপর প্রণব, পরপ্রণবে নিয়ে লয় ক'রে দেবে। তারই নাম পরম পদ। তাই কাম্য। বোধহয় হয় জয়গুরু নাদই 'জয়গুরু সম্প্রদায়' এ নামের কারণ।

রাত্রে রান্নাঘরে বসে সাধনার সব কথা ব'ল্‌লেন। দিদি ও মা ছিলেন, তাঁরা জন্মান্তর পর্য্যন্ত জেনে নিলেন। সেখানে আরও দু'জন ছিল। তাঁর ছোট ভগ্নী রান্নায় ব্যস্ত, আর তাঁর বালক পুত্র নিদ্রায় আর ক্ষুধায় কাতর হয়ে উনানের দিকে তাকিয়ে বসে। রহস্য চাপাই পড়ে গেল।

রামাশ্রমে মৌনকালে এল নামপ্রচারের আদেশ, কিন্তু যেমন তেমন আদেশকে গ্রাহ্য করবার পাত্র ত' নন এই ভক্তকুলশিরোমণি। সাধনার অনন্তলোকপরিক্রমা শেষ করে, চরাচর বিশ্বের যাবতীয় রহস্যনির্ণয়ের পর তিনি ৺পুরীধামে প্রত্যক্ষ আদেশের জন্য মৌনগ্রহণ স্থির ক'রলেন। এখন আর ৫ লক্ষ জপের বালাই নেই। এলেই দাক্ষা। ভুজেন প্রথম শূদ্র-শিষ্য (আনুষ্ঠানিক ভাবে)। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক দীক্ষা পেলেন এই সুযোগে ; "......এমন দিন আর হ'বে না।"

১৩ই চৈত্র দোলের দিন ডুমুরদহ, দিগসুই, সিমলাগড় প্রভৃতি স্থানে নামপ্রচারের কথা ব'ল্‌লেন। সব ব্যবস্থা চ'লতে লাগ্‌ল। বড় বড় 'নিশান' তৈরী হ'তে লাগ্‌ল।

ইনি ৺পুরীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সঙ্গী নারায়ণজা (বেয়াই), অনাথ[১], জগবন্ধু[২], পরমানন্দ (হাবু—ত্রিবেণী), গৌর[৩]। ৺পুরীধামে ধর্ম্মশালায় থেকে ১৩ই চৈত্র সর্ব্বত্র নাম প্রচার আরম্ভ। ইনি ৺পুরীধামে 'খুন্তি' নিশানধরার লোক ভাড়া করে প্রচার করলেন। তারপর সকলে চ'লে যায়। রইলেন দুই বেয়াই, পুরীধামে স্বর্গদ্বারে ছাতামঠের সামনে ঘর ভাড়া নিলেন।

চৈত্রসংক্রান্তির (মহাবিষুব) দিন নিলেন মৌন। সঙ্কল্প— 'সাক্ষাৎ দর্শন ও আদেশ; নয় নির্ব্বিকল্পসমাধিযোগে দেহত্যাগ।' ১৩৪৪ সন ১১ বৈশাখ এলেন জগন্নাথদেব সমাধিকালে গোলাকার জ্যোতির মধ্যে স্বয়ং! আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ব'ল্‌লেন ঠুটো হাত নেড়ে, "যা-যা, নাম দিগে যা"। মৌন ত্যাগ হ'ল। তখন থেকেই সুরু হ'ল নাম প্রচারলীলা। "এতদিনে হ'ল বুঝি মোর পারের উপায়!"

১। শ্রীঅনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। শ্রীজগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীগৌর মুখোপাধ্যায় (দিগসুই)॥

৷ তৃতীয় বিলাস ॥

রওনা হলেন ৺পুরী থেকে। উদয়গিরি অস্তগিরি পাহাড় দু'টায় যাওয়া হ'ল, ভুবনেশ্বরেও গেলেন। তারপর ক'ল্‌কাতায় রাধারমণ বাবুর বাসায়। শুনলেন্—প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাকে তীরস্থ করা হ'য়েছে। ছুট্‌লেন নিমতলায়। মৃত্যুকালে নাম দিলেন। 'মাতা'ই (প্রবোধ বন্দ্যোর) প্রথম নাম নিলেন। নাম নিয়ে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে।

৺কাশী-মাহাত্ম্যে শাস্ত্র বলেন—"শিব মৃত্যুকালে নাম দিয়ে উদ্ধার করেন।" সেটা ক'জনই বা জানে, বা দেখে। এ লীলা কি তারই পরিপূরক নয়?

তারপর দিগসুই এলেন। নামপ্রচারের ধুম পড়ে গেল। রাধারমণ বাবু প্রধান উদ্‌যোগী। দিগসুই-এর ছেলেরা ত আছেই, প্রথম দিগ্‌সুই প্রচারে পুরঞ্জয় যোগদান করেন। গিরিজাবাবু ক'লকাতা থেকে এলেন। ৺পুরী যাবার আগেই রাধারমণ বাবু রমেশকে[১] দিয়ে কয়েকটি নিশান লিখিয়েছিলেন। রমেশ ১৮৲ টাকা নেয়।

(১) "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

(২) "সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"

১। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা)

(৩) "শ্রীমদ্‌রামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপদ্যে।"

(৪) শ্রীমতে রামচন্দ্রায় নমঃ।

(৫) শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ।

(৬) শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ।

দিগসুই থেকে ডুমুরদহ, সিমলাগড়, ইছাপুর, শম্ভূপুর প্রভৃতি প্রচার চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। যেখানে যান, সব যোগাড় আপনি আপনি হ'য়ে যায়।

ভুজেন, দুর্গা[১], গিরিজা[২], ভূপেন, রাধারমণ প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহে ৫৮ নং শাঁখারিপাড়া, ভবানীপুরে ৫০৲ টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া করা হ'ল। ভাড়া ভুজেন দেবে, ঠিক হ'ল। উদ্দেশ্য চাতুর্মাস্য করা।

১৩৪৪ সালে প্রথম চাতুর্মাস্য আরম্ভ হ'ল। ইনি আর নারায়ণজী (বেয়াই) গেলেন। মা, পুত্র, শান্তিদেবী (দাসপুর) আরও অনেকে গেলেন। ভাইপো, জামাই মাঝে মাঝে আসেন। দ্বিজেন[৩], গৌর অনাথ সঙ্গী হ'য়েছিলেন। নামে অনেকেই যোগ দিতেন। বাড়ী-ওয়ালা একটু বিরক্তি বোধ ক'রতেন। তিনি ও তাঁর পুত্র দীক্ষা নেন পরে।

৺পুরীতে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের কাছে যান। ইনি—"সঙ্কীর্ত্তন নাদ শাস্ত্রে নাই।"

পণ্ডিতমশাই—"শাস্ত্র মাত্র দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন। নাদ অনন্ত প্রকার, 'যোগং যোগেন জানীয়াৎ'।"—বল্‌লেন এবং খুব আনন্দ ক'রলেন।

১। শ্রীদুর্গাপদ ঘটক।

২। শ্রীগিরিজা সরকার

৩। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ইনি 'উৎসব' অফিসে মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দেখা হ'ল। খুব আনন্দ। একদিন 'উৎসব' অফিস থেকে যখন ভবানীপুর যাচ্ছেন, তখন মজুমদার মশাই ফুটপাতে নেমে এসে এঁর বুকে হাত দিয়ে ব'ললেন—"আমার সমস্ত শক্তি তোমায় দিলাম।" সে সময় মজুমদার মশায়ের গুরুপুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র স্মৃতিতীর্থও (ভাটপাড়া) উপস্থিত ছিলেন।

চিৎপুর নূতনবাজারে সত্যানন্দ মহারাজ ও কালীঘাটে হীরালাল গোয়েঙ্কা বর্ষব্যাপীনাম আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে চিৎপুরে নামে ও কালীঘাটে নামে যান। কখন মজুমদার মশায়ের, কখন শ্রীমতী পান্নাদেবীর বাড়ী যান। নাম, পাঠ ঠিক চ'লছে। ভবানীপুরের বাড়ীটির নাম হ'ল "তুলসীদাস আশ্রম"। বহুলোকের যাতায়াত। তাঁর এক শিষ্যের ভয় হ'ল। এত লোকজন। তাঁর অনিষ্ট না হয়, (সেই শিষ্যটি) রমণবাবুকে বলেই ফেল্লেন কথাটা।

রমণবাবু—"ঠাকুর প্রত্যাদিষ্ট।"

শিষ্যটি—"সে কথায় বিশ্বাস কি ?"

রমণবাবু—"দেখুন, মানুষের ওঁচা পুলিশ, পুলিশের ওঁচা সি, আই, ডি,। আমি সেই সি, আই, ডি, ; আপনি আমারও ওঁচা।"

নবরাত্র নামযজ্ঞের ব্যবস্থা হ'ল, ৺দুর্গাপূজার সময়। মঞ্চ সাজাতে এল রমেশ, ঢাকায় বাড়ী। ইনিই প্রথম নিশান তৈরী করেন। মঞ্চ হ'য়ে গেল। নাম চল্ছে। কোন ভক্তের এক অদ্ভুত অবস্থা এল। নিজে শাঁখ বাজিয়েই হুঙ্কার দিয়ে ভীষণ লাফ দিতেন।

অন্নপূর্ণা নামে একটি ভক্তিমতি মহিলা আস্তেন। তিনি কয়েকখানি ঠাকুরের বই নিয়ে গিয়ে সুভাষ (বসু) বাবুর মাতাকে দেন। সুভাষ বাবুর মাতা বই পড়ে এসে হাজির। ব'ল্লেন—আশা মিট্লো না। তখন

৺দয়ালমহারাজের নিকট 'কথা রামায়ণ' পাঠ হ'চ্ছিল বন্ধ হ'য়ে গেল। বাড়ীতে নিয়ে পাঠ শুন্‌লেন। সুভাষবাবুর মাতা গান্ধীজীর সঙ্গে ঠাকুরের দেখা করাতে চেষ্টা ক'রলেন। আলাপ হ'ল না, মাত্র দর্শন হ'ল।

পান্নাদেবী প্রায় আসতেন। তাঁর ছেলে, বৌ প্রভৃতিকে মন্ত্র দেওয়ার কথা ব'ললেন। ঠাকুর মন্ত্র দিলেন। তাঁরা ভক্তি-বিভোর। অপূর্ব্ব ভক্তি।

একদিন বাগবাজার থেকে বরানগরে যান। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য ও পুত্র। সেখান থেকে নাম নিয়ে বেলুড় মঠে গেলেন। গেটে আটকান হ'ল। নাম যেতে পারবে না। ঠিক হ'ল, কেউ ভিতরে যাবে না। ফিরে পড়লেন। ভিতর থেকে একজন স্বামীজি ডাকলেন। ভিতরে যাওয়া হ'ল। শেষে যত্ন ক'রে অনেক প্রসাদ দিলেন দক্ষিণেশ্বরে মাতৃদর্শনের পর সেই প্রসাদ নেওয়া হ'ল।

চাতুর্মাস্যের শেষের দিকে ইনি পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে 'সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়ে' পড়াতে পাঠাবেন, ঠিক করলেন। ভাইপো শুনলেন, প্রতিবাদ ক'র্‌লেন। ভাইপোকে বোঝালেন অনেক, কিন্তু বুঝতে নারাজ। ব'ল্‌লেন—"এখন আমার আমল, যা ভাল বুঝবো ক'রব। তোর আমল এলে বুঝে নিস্।" ইনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন। পিতার মতই পুত্রের মত। ইনি পুত্রকে 'সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়ে' পাঠালেন। এখানেও সনাতন ধারার অনুবর্ত্তন।

চাতুর্মাস্যের পর পান্নাদেবীর বাড়ীতে গেলেন। একমাস থাকলেন। ২৪ প্রহর' হ'ল। নাম পাঠ নিয়মিত চ'ল্‌ছে। খুবই আনন্দ চল্‌ছে। অনাথবাবু বিপন্ন হ'লেন। তাঁকে রক্ষা ক'রলেন।

কোন্নগর মাতৃ-আশ্রম থেকে নিমন্ত্রণ এল সেখানে গেলেন।

নাম খুব চ'লছে। আশ্রমের ঠাকুরও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে আশ্রমের ঠাকুর হঠাৎ ব'ল্‌লেন—"শিষ্য নিয়ে কি তোর সঙ্গে শেষটায় আমার মনোমালিন্য হ'বে?"

ইনি—"কি রকম?"

তিনি—"তোর শিষ্য অনাথ বলে,—পাঁকে-পড়া গুরুর কাছ থেকে এদের উদ্ধার করুন।"

অনাথ বাবু—"না, আমি বলিনি।"

ইনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ব'ললেন—"আপনি কি ব'ল্‌ছেন? আমি আপনার বিজ্ঞান। আপনারই কাজ করছি।" পা আর ছাড়েন না শেষে উঠে দাঁড়াতেই দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কান্না। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শেষে আশ্রমের ঠাকুর ব'ল্‌লেন—পঞ্চম ভূমিকায় অনেকদিন……। মহাত্মা তাই ক্ষণিকের সত্য উদ্‌ঘাটন ক'রলেন। বাগবাজারেই ফিরলেন।

ডুমুরদহে এলেন। খুব নাম চ'ল্‌ছে। চন্দ্রমাধব[১], প্রাণকৃষ্ণ[২], ফটিক,[৩] রমেশ, অমর[৪] প্রভৃতি মিলে নাম ক'রছেন। সে কি নামের গর্জ্জন। এই সময়ে অনেকেরই মন্ত্রচৈতন্য হয়। ভাইপো কিছু পরীক্ষা চান। মা অনুরোধ ক'রলেন। ইনি পরীক্ষা দিলেন। ভাইপো মন্ত্র নেন। সাধনভজন আরম্ভ হ'ল।

মৌনভঙ্গের পর বেরুলেন প্রচারে। চল্‌লেন গ্রামের পর গ্রাম। আরম্ভ হ'ল উদ্ধারলীলা, শুধু মানুষ নয়, বিগ্রহ, মন্দির, এমন কি স্থাবরজঙ্গমও।

১। শ্রীচন্দ্রমাধব নাথ। (ভবানীপুর)

২। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। (হাওড়া)

৩। শ্রীফটিক মুখোপাধ্যায়, পান্নাদেবীর পুত্র।

৪। শ্রীঅমর দত্ত।

তারাগুণের গাজনের শিবমন্দির তৈরী হ'ল। অন্য চারিটি অপূজিত শিবের পূজার ব্যবস্থা হ'ল। ভার নেন লোকনাথ আলালনাথ।

এল ১৩৪৫ সন। এবার চাতুর্মাস্য ডুমুরদহে। চারিদিকে নামের ধূম লেগেই আছে। অনন্তচতুর্দ্দশীর দিন 'বড়দি' শ্রীরামাশ্রমে উর্দ্ধ-লোকে গমন ক'রলেন। এবার পূজায় ১০ দিন নাম-যজ্ঞ হ'ল। চাতুর্মাস্যের পর তীর্থপরিক্রমা চ'ল্‌লো। নামপ্রচার তো আছেই।

সনৎকুমারকে[১] ডুমুরদহে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। পূজাদি নাম প্রভৃতি চালাতে হবে ত'। তিনি এসে যোগ দিলেন।

যথারীতি পৌষমাসে সংক্রান্তিতে মৌন নিলেন। মৌনান্তে প্রচার চ'লছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়সংস্কার, অপূজিত দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থাও চ'লছে। ডুমুরদহে ও তারাগুণের পতিত গাজন তুললেন, আনন্দের প্রবাহ ছুটলো।

নিমন্ত্রণ এল বাগড়ীর ৺তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ে পুত্রের উপনয়নের। চ'লেছেন সদলে নাম ক'রতে ক'রতে মসজিদে নাম বন্ধ ক'রে প্রণাম ক'রলেন। একটি উত্তেজিত মুসলমান—নিয়ে আয় তো তলোয়ারখানা—ব'লে, চেঁচিয়ে উঠলো। ইনি নির্ব্বিকার।

ভাইপোর বিবাহের কাল এল। বিবাহ দিতে হবে। ঠিক হ'ল বিবাহে এঁরা যা দেবেন, তাই নেবেন। পাছে কন্যাপক্ষদের অসুবিধা হয়, সেইজন্য বরযাত্রীদের বেয়াইবাড়ীতে ভাল ক'রে জল খাইয়ে নিলেন। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। কাছেই কন্যাপক্ষের বাড়ী। নাম ক'রতে ক'রতে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন। দেখলেন মুখ, ডাকলেন "গৌরীমা"[২] ব'লে।

১। শ্রীসনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীমতী গৌরী দেবী।

১৩৪৬ সালে রথযাত্রার জন্য ৺পুরীধাম যাত্রা ক'রলেন। কটকে এবার নামতে হ'ল। তারপর রথযাত্রার সময় পুরীতে এলেন। "আন্তর-বাণী"—"নাম প্রচার কর, নাম-প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ ক'রেছিস—ইত্যাদি।" এই রথযাত্রায় এক অভিনব ব্যাপার হ'য়ে গেল। স্থান পেলেন সবার উপরে। সংবাদপত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'রল প্রধানরূপে। ইং ২২।৬।৩৯ ষ্টেট্স্ম্যান নিম্নলিখিত সংবাদটী পরিবেশন করেন—

Swami Yogananda[১]
Attends car festival
At Puri

From our correspondent

Puri, June 20. Swami Sitaramdas Omkarnath Yogananda of Tribeni, Hooghly is one of the many religious leaders who visited Puri during car festival.

The Swami is the exponent of a doctrine called "Tarak Brahma Namkirtan," according to which the name and qualities of God are recited over and over again as, he thinks, people of the present age are not capable of meditation or Yoga which was practised in ancient times by Rishis.

The Swami is a Sanskrit scholar and well versed in Vedas and Upanishads.

১। 'যোগানন্দ' নাম—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মশাই দেন।

He will leave for Calcutta after the car festival is over.

At Cattock he addressed a public meeting at the 'Binapani Club.'

চ'ল্‌ছে নাম প্রচার। চাতুর্ম্মাস্য চিতের মা'র পড়া। নাম ছাড়াও তাঁর অন্য এক বিলাস। রাজকীয় বিলাস। সদাব্রত, অন্নদান ব্রত। সকলকে প্রসাদ পেতেই হবে। অন্নপ্রসাদ না নিয়ে কেউ ফিরতে পারবে না। অনাহূত রবাহূত, দীন হীন সবই তাঁর নর-নারায়ণ। কুকুরটি পর্য্যন্ত নারায়ণ। তাদেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাদের কাউকে বলেন 'লালনারায়ণ', আবার কাউকে বলেন 'কাল নারায়ণ'।

দীক্ষিতেরা অন্নপ্রসাদ না নিলে বলেন—"মন্ত্র ফেরত দে।" ইনি দীক্ষা দেন বলেন—"তোরা সীতারামের সন্তান।" ডাকেন "বাবারা মায়েরা" বলে।

পাঠ ক'রতে ক'রতে সমাধিস্থ হ'য়ে যান। হঠাৎ দেখা গেল, মাথায় সাপ ফণা ধরে রয়েছে। সকলে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। সমাধির ব্যুত্থানে সর্পমহারাজ যথাস্থানে চ'লে গেলেন। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিও হ'য়েছিল।

এই চাতুর্ম্মাস্যে একদিন দেখা গেল, অনেকে এসেছেন। ভোগ হ'য়েছে। প্রসাদে কিছুই হবে না (কুলাবে না)। মা নাতি১কে, পুত্রের (এঁর) কাছে পাঠালেন। ইনি কুটিরে বসে শাস্ত্রপাঠ ক'রছেন। ব'ললেন—"যা, যাচ্ছে সীতারাম।" এলেন—"জয় গুরু মহারাজ কি জয়" দিলেন। ব'ললেন—"নে, সব বসিয়ে দে।" সব

১। রঘুনাথকে।

বসে গেল। সকলেই পরিতৃপ্ত। কর্ম্মীদের জন্য কিছু অবশিষ্টও রইল।

একটি অতিথি এলেন। বিশ্বনাথ[১] তাঁকে সমাদর ক'রলেন। স্থান নেই কোথাও, শুতে দেওয়া হ'ল পাকশালে। ইনি জানতে পারলেন, নিয়ে এলেন ঘরে। বিশ্বনাথকে ব'ললেন—'সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।'

এক শিষ্যের শবদেহ মঠে নামান হ'ল। ইনি স্পর্শ ক'রলেন শবদেহ, ব'ললেন—"যাও রোগক্লিষ্ট সন্তান, নূতন দেহ ল'য়ে এসে নাম প্রচার কর।" আর একজন সম্বন্ধে বলেন—"শাস্ত্রে বলে ৺কাশীতে মুক্তি হয়। কিন্তু পঞ্চানন আমায় চিত্রকূটের কথা শোনাবে ব'লেছে। তাকে আসতে হ'বে, চিত্রকূটের কথা শোনাতে হ'বে।" এই শিষ্যটি ৺কাশীধামে শ্রীরামনবমীর দিন গুরুনাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ করেন। এঁর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

চাতুর্মাস্যের শেষে গ্রামে গ্রামে নামপ্রচার ও দেবোদ্ধারলীলা চলছে। যাঁরা সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা ত' আছেনই। জগন্নাথ (তারাগুণ), হরনাথ (মাকড়দহ), অসীমানন্দ ও রমেশ যোগ দিয়েছেন পায়ে হেঁটে মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম। খাবার চিন্তা নেই, সব আপনিই জুটে যাচ্ছে তিনি সদাব্রত ক'রছেন। ইদিলবাটি যাচ্ছেন শ্রীবিভূতি ঘোষের বাটী, সঙ্গে মগরার সুধীরের দলও আছে, সঙ্গী ২৯ জন। বিভিন্ন যন্ত্রে নাম কীর্ত্তন চ'লছে। বর্দ্ধমান থানার কাছে গিয়ে হাজির হ'লেন।

১। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

কনষ্টবল—"থানায় যেতে হবে আপনাদের।"

থানায় ঢুকলেন। সঙ্গে গেলেন, বৰ্দ্ধমান হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীকুমার মিত্র। মুসলমান দারোগা, এঁকে দেখেই চেয়ার দিলেন ব'সতে। ভদ্র ব্যবহার ক'রলেন।

দারোগা—"সিগারেট নিন।"

ইনি—"সীতারাম ওসব খায় না।"

শ্রীকুমারবাবু—"ইনি আপ্-টু-ডেট সাধু নন।" ইনি হাস্লেন। বাইরে জল আর ভেতরে নাম সমান তালে চ'ল্তে লাগল। জল ছেড়ে গেল, শ্রীকুমারবাবু সকলকে নিয়ে গিয়ে জলযোগ করালেন। ইনি ব'ল্লেন—"ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্য। জলে সকলকে নেয়ে যেতে হ'ত।" বাংলায় তখন 'লীগ্ মিনিষ্ট্রী'। গেলেন দেবোদ্ধার ক'রতে। ভীষণ-জঙ্গল। গ্রাম থেকে অস্ত্রাদি নিলেন। পরিষ্কার আরম্ভ হ'ল। সর্পের গর্জ্জন এল। ব'ল্লেন—"নাম কর, আর কাজ কর।" নামও চ'লেছে, কাজও হ'চ্ছে সর্পকুল ভাল ছেলের মত অপসরণ ক'রতে লাগল। সব ব্যবস্থা হ'ল। যাত্রা ক'রলেন গ্রামান্তরে।

এক ডাক্তার প্রশ্ন ক'রলেন—"আপনি এত শিষ্য ক'রছেন কেন? অন্য মহাপুরুষেরা ত' এত শিষ্য করেন নি।" ইনি "শঙ্করাচার্য্য অনেক শিষ্য ক'রেছিলেন। ঠাকুরের যাকে দিয়ে যে কাজ করাবার ইচ্ছা হয়, তাকে তাই আদেশ দেন।"

একবার এক কিশোর পত্র দেয় যে, সে বিনা কারণে তিরস্কৃত হ'চ্ছে। ইনি উত্তর দিলেন—"হিংসা না ক'রলে বাঘও হিংসা করে না।" কিশোর পত্র প'ড়ল। নিরস্ত হ'ল, কিন্তু মর্ম্মে গেল না অর্থ।

মৌনকাল এল। ডুমুরদহে রামাশ্রমে মৌন। মৌনে সাধন-

রাজ্যে তত্ত্ব আপনি এসে হাজির হ'চ্ছে। ইনি দ্রষ্টামাত্র। নানা-গ্রন্থের আবির্ভাব হ'চ্ছে। পরাবাণী হ'চ্ছে কেবলই—"তুই নাম প্রচার কর্। মুক্তপুরুষ! নামপ্রচার কর্। তুই মুক্ত ওরে গগনের মত।"

একদিন স্বপ্ন দেখ্ছেন, নবগ্রামে খুব নাম হ'চ্ছে। ঘুম ভাঙ্গল, নামে বিভোর। এ ঘটনা কি নবগ্রামের দু'টী অনন্ত-কালোদ্দিষ্ট নাম-যজ্ঞের সূচনা নয়?

ডুমুরদহ পঞ্চবটীতে ব'সে লিখছেন। হঠাৎ তাকালেন—'পায়ের একহাত তফাতে সাপের ফণা'। (ডানপা ছড়ানো থাকে) নড়বার উপায় নেই। ইনি "তুমি ত' সেই গো" বলে প্রণাম ক'র্লেন, তিনিও অন্তর্হিত হ'লেন।

১লা চৈত্র মৌনভঙ্গ হ'ল। নামপাঠ চ'ল্ছে। ডুমুরদহের নামের দলের নাম ছিল 'সুরলহরী'। প্রত্যহ নাম নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ চ'লছে। মৌনকালে 'সুরলহরী' বাইরে থেকে নাম শুনিয়ে যেত নিয়মিত। দলের প্রধান 'প্রেমানন্দজী'[১]।

১৩৪৭ সনের ১লা বৈশাখ চড়ক উপলক্ষ্যে 'তারাগুণে' গেলেন। নামের লীলা চ'লছে বেশ। মধ্যাহ্নে লোকনাথের[২] বাড়ীতে ভোগের ব্যবস্থা। ভোগ হল। এখন থেকে চড়কলীলা আরম্ভ হ'ল।

পরদিন দিগ্সুইয়ে এলেন। শ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণজীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি খুব আনন্দ ক'র্লেন বল্লেন এর উদ্দেশ্যে,—"যখন অধর্ম্মের প্রাবল্য হয়, তখন ভগবান্ যে কোন শরীর ধারণ ক'রে ধর্ম্মসংস্থাপন করেন।" ইনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

১। শ্রীসনৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

চাতুর্মাস্যের কাল এল। চিতার মার পড়ায় রামানন্দ মঠ হ'য়েছে। নতুন মঠে চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ হ'ল। নাম চ'লেছে। পাঠ প্রভৃতিও নিয়মিত হ'চ্ছে। ক্রমে দীক্ষার্থী ও নামকারী বেড়েই চ'লেছে। সদাব্রত ছাড়া তো কখনই নন।

একটা ছেলে নাম ক'রে ফিরছে, মুখে 'হরেকৃষ্ণ' নাম, পথে হ'ল সর্পাঘাত। অবস্থা খারাপ। সব চেষ্টা শেষ হ'য়ে গেছে। খবর এল। ইনি গেলেন। সব শুনলেন। নামের দুর্নাম সহ্য হ'ল না। ক্ষতস্থান স্পর্শ ক'রলেন, বিষ চ'লে গেল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল—"কি রকম হ'ল ?"

—"সীতারাম কিছু জানে না।"

ডুমুরদহ থেকে সংবাদ এল। নাতি হ'য়েছে (ভাইপোর পুত্র) তার নাম দিলেন 'গুরুদাস'। সংজ্ঞা হ'ল—'বড় অতিথি'। "ছেলে-মেয়েরা অতিথি। আদর কর, যত্ন কর, মানুষ কর, কিন্তু তাদের উপর আশা ক'রনা। কখন চ'লে যাবে, ঠিক নেই। হয়ত টেনে নিয়েছ—পুত্ররূপে এসেছে। আর সকলেই আছি ধর্ম্মশালায়। কখন কাকে চ'লে যেতে হ'বে ঠিক নেই। এই ত সংসার।"

রামাশ্রমে ইটের দেওয়াল খড়ের চাল হ'ল। নামের জন্য টালির চালা হ'ল। কিন্তু বহুকষ্টে অনুমতি নিতে হ'ল।

চাতুর্মাস্যের শেষে নানাস্থানে ঘুরে ডুমুরদহে মৌন নিলেন। মৌন-কালে গ্রন্থের পর গ্রন্থের আবির্ভাব চ'ল্ছে। পরাবাণী (দৈববাণী) নামপ্রচার করার জন্য সদাই তাগাদা দিচ্ছে। কাজ চ'ল্ছে। ৺কাশী-ধামে ও তারিঘাটে আশ্রমের কথা ভাস্লো। ১লা চৈত্র মৌন-ভঙ্গ হ'ল। যথারীতি প্রচার আরম্ভ হ'ল। একটী নতুন সঙ্গী হ'ল। অপূর্ব্ব তার কণ্ঠ। নাম বসন্ত মল্লিক। ইনি বলেন 'সদানন্দ'।

তার সকল যন্ত্রে অধিকার দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। একেবারে সদাশিব।

এখন থেকে আর একটি নতুন লীলা আরম্ভ হ'ল। লীলাটি কন্যাদায়-উদ্ধারলীলা। সূচনা হয়েছে ভাইপো থেকে। তারাগুণের নরেনের[১] সঙ্গে ডুমুরদহের কুড়োবাবুর[২] মেয়ের বিয়ে—ইনিই মধ্যস্থ। ব্রজনাথজীর বাড়ী বর রইল। কন্যাপক্ষকে দান-আদি দিলেন। নিজে উপস্থিত থেকে বিয়ের মন্ত্রের অর্থ পর্য্যন্ত ব'লে দিলেন।

ডুমুরদহে চাতুর্মাস্য চ'লছে। নবদম্পতি পাঠ শুন'ল। বর বিদায় দিলেন। নামপাঠ চলে, সদাব্রতের কোন ব্যতিক্রম নেই। এবার নাম ৩০ দিন ব্যাপী হ'ল। একটি শিষ্য চ'লে যেতে চায় সঙ্গ ছেড়ে। শেষে অনুমতি দিলেন। চ'লে গেল। বল্‌লেন—"হরি হরি, হায়, বালক বুঝিতেছে না কি ভুল করিল। ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হ'ক।"

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন ক'রলেন—"যোগভ্রষ্ট, ধনীর গৃহে অথবা যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে, তবে ভরতরাজা কেন মৃগযোনি প্রাপ্ত হ'লেন।"

ইনি—"বিধি দুই প্রকার, সমান্য ও বিশেষ। সামান্য—ধনী বা যোগীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে। আর বিশেষ বিধি—'যং যং বাপি', যে যেভাব স্মরণ ক'রে দেহত্যাগ করে, সে সেইভাব প্রাপ্ত হয়। ভরত রাজা মৃগস্মরণে দেহত্যাগে মৃগদেহ পেয়েছিলেন।"

আশ্রমের ঠাকুরের[৩] আদেশে এবার মৌন হ'ল না। ডুমুরদহে 'হল্ট' হয়েছে, সেটাকে পাকপাকি ক'রতে হবে। যাত্রীর দরকার'।

১। শ্রীনরেন মুখোপাধ্যায়।

২। শ্রীরোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। ইনি শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দগিরি মহারাজকে আশ্রমের ঠাকুর বলেন।

তাই আশ্রমের ঠাকুর নিজে ডুমুরদহে রইলেন, শ্বশুরটি[১]কেও ধরে রাখ্‌লেন। তাঁর মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল।

ব্রজনাথজীর বাড়ী দোল। উৎসবে গ্রাম মেতে উঠেছে। নাম গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে উত্তমাশ্রমে হাজির হ'ল। আনন্দঘন মূর্ত্তি 'ধেই ধেই' করে নাচ্‌ছেন। ফেরা হ'চ্ছে, বল-খেলার মাঠে এসে নামের জয় দেওয়া হ'ল। নাম থামল। ইনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা ক'রলেন—"যার যার গায়ে রং লেগেছে, ব্রজনাথজীর বাড়ী তার তার নিমন্ত্রণ।" আবার নাম ধরা হ'ল। ব্রজনাথজীর বাড়ীতে নাম শেষ হ'ল। সকলে প্রসাদ পেলেন।

গ্রাম থেকে গ্রামে নামপ্রচার ক'রছেন। এসে উপস্থিত হ'লেন পাণ্ডুয়ায়। পাণ্ডুয়া থেকে এক যায়গায় যাচ্ছেন। গরুর গাড়ীতে উঠলেন। ধরলেন অসীমানন্দজী[২] ও তদীয় পত্নী লীলাদেবী। আজ তাদের বাড়ী যেতে হবে, কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। ইনি—"সীতারাম বলেছে যখন যাবে। এখন সেখানে যাবে।" তাঁরা স্নেহের দাবী নিয়ে এসেছিলেন। ইনি—"কথা দেওয়া হ'য়েছে। নয়ত সীতারাম মিথ্যাবাদী হ'বে। বাক্ ব্রহ্ম, তার অপব্যবহার হবে।" রাজি হ'লেন না।

প্রচার অবসরে এলেন 'চিতার মার পড়া'য়, ড্যামরা থেকে ডাক এসেছে নাম নিয়ে যেতে হ'বে। কলেরা—মহামারী-আকার ধারণ ক'রেছে। প্রার্থীকে কখনও করেন না বিমুখ। নামের দল গেল। গ্রাম থেকে মড়া বেরুনো বন্ধ হ'ল। হঁ্যা, এইখানেই না নামকারীদের উদ্দেশ্যে ঢিল ছোঁড়া হ'য়েছিল ?

১। আশ্রমের ঠাকুর এঁকে শ্বশুর বল্‌তেন।

২। শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বেলুন)

এবার ইচ্ছা হ'ল খুলনা-প্রচারে যাবেন। হরেন বিশ্বাস, মাধব ও বসন্ত মল্লিক প্রার্থনা করে। তারা আগে ঘুরে এসেছে। রথের আগে যাওয়া হয়। রথের দিন পাটকেলঘাটা বাজারে 'জগন্নাথ-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থান ও আশ্রম করে দেয় রাজেন[১]। গুণ্টুরে নাম প্রচারে গিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। নামের দল নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে বিশেষ পয়সা নেই, কিন্তু প্রচার করতে হ'বে তাই হেঁটেই চল্‌লেন বেশীর ভাগ রাস্তা। পথে একদিন কিছুই প্রায় জুট্‌লো না। ছোলা ভিজিয়ে খেয়ে দিন কাটালেন সকলে। তারপর দিন থেকেই খাদ্যসামগ্রী প্রচুর আসতে লাগল। পাটকেলঘাটা পার কুমিরার (খুলনা জেলা) হরেন ও তার পিতা শিষ্য, সেখানে থাকা হ'ত ; প্রচার চ'ল্‌ছে গ্রামে গ্রামে। সেই সঙ্গে ভাষণ দিতেও ভুলছেন না। সেখানে শিষ্য নেই, তথাপি খুব ভালভাবেই প্রচার চ'লছে। একবার খুলনা-প্রচার থেকে ফিরবার সময় নৌকা উল্টে গেল। সকলে জলে পড়ে গেলেন। সব কোন রকমে উদ্ধার হ'ল। ইনি বললেন—"কাল দোকানে ছিলি, তাই সবাইকে স্নান করতে হ'ল।"

এবারেও 'আশ্রমের-ঠাকুরে'র আদেশে ডুমুরদহে চাতুর্মাস্য হ'ল। রামাশ্রমে ৩০ দিন ব্যাপী নাম হয়। আশ্রমের-ঠাকুরের কৃপা ও বিজ্ঞানানন্দজীর আনুকূল্য যথেষ্ট ; শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। নাম, পাঠ ও নরনারায়ণ সেবা চ'ল্‌ছে। সারাদিন বিশ্রাম নেই। রাত্রেও হারিকেন নিয়ে ঘুরছেন, কে খেয়েছে না খেয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর কে কে কোথায় শুয়েছে, সে সন্ধান নেন।

একদিন সকালবেলা দেখা গেল, শ্রীব্রজনাথজীর বাড়ীর সব দরজা

১। শ্রীরাজেন ঘোষ।

খোলা। মা চম্‌কে উঠ্‌লেন, বাসনপত্র সব চুরি হ'য়ে গেছে। ছেলেদের খেতে দেবেন এমন পাত্র নেই। পাতা কেটে নিয়ে কাজ চ'ল্‌ছে। কয়েকদিন পরে মা গিয়ে তাঁকে জানালেন চুরির কথা।

উত্তর এল—"চাইলে তোমরা দেবে না মা, তাই চুরি ক'রেছে।"

তিনি নির্ব্বিকার। কোন সহানুভূতির চিহ্ন তাঁর চোখেমুখে দেখা গেল না। মা বাধ্য হয়ে চুপ ক'রলেন।

৺জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বছরেই মঠে যান। এই জগদ্ধাত্রী পূজা রাধারমণবাবুর মাতা প্রথমে ডুমুরদহে করেন ১৩৩২ সনে।

প্রথমে ১৩৪৬ সালে 'রামানন্দ-মঠে' রাধারমণ বাবুর মা জগদ্ধাত্রী পূজার সঙ্কল্প করেন। পরে রাধারমণ বাবু রামানন্দমঠের জন্য স্থান দেন ব'লে চিরদিন রমণবাবুর মা'র নামে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা হবে—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পূজার আগের দিন একটা বিশেষ ব্যাপার হয় প্রতি বছরই—'মগরা-আক্রমণ'। সে এক অপূর্ব্ব লীলা। হাজার হাজার লোকে নিয়ে জি. টি. রোড ধরে চলেছে নামের দল। বড় বড় ধ্বজা, ছোট ছোট ধ্বজা, বহুযন্ত্রের ভীড় লেগেছে। উদাত্তকণ্ঠে মঙ্গল[১] নাম ধরেছেন, হয়েছেন মূল-গায়েন। সঙ্গে সকলে গাইছে। আনন্দের সীমা নেই শ্রীসীতারামদাসজীর। নামের দিকে মুখ ক'রে করতাল বাজাচ্ছেন নেচে নেচে। সামনে হাত তুলে নৃত্য ক'রছে বালক-বালিকারা। ইনি এক পা এক পা ক'রে নৃত্য ক'রতে ক'রতে পেছু হাঁটছেন। যেন সকলকে গুছিয়ে নিতে চাচ্ছেন। —যারা হাত তুলে তোমাকে ডাকে, তাদের কি এইভাবে কাছে রাখা তোমার স্বভাব? সারা মগরা প্রদক্ষিণ ক'রে মঠে এলেন।

১। শ্রীমঙ্গলাচরণ চক্রবর্ত্তী (বেলুন)

পরদিন ৺জগদ্ধাত্রীপূজা। ভাঁড়ারে প্রায় কিছুই নেই। সকাল হ'ল, পূজার কাজ আরম্ভ হ'ল। চারিদিক থেকে জিনিষপত্রে ভাঁড়ার পূর্ণ হ'য়ে গেল। হাজারে হাজারে লোক প্রসাদ পেয়ে গেল। আনন্দের হাট বসে গেল। বিজয়া-শেষে দেখা গেল, ভাঁড়ার শূন্য।

ব্যথিতকণ্ঠে একজন ব'ল্লেন—"ভরে' বলেছে,—দু'বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ ক'রবে সীতারাম। নীচ কুলে জন্মাবে।"

ইনি "আমার কাছে কোন সংবাদ আসে নি। নীচ কুলে জন্মাবার কারণ দেখি না।"

চাতুর্ম্মাস্য চ'ল্ছে রামেশ্বরপুরে। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। ইনি সদাব্রত ক'রেই চ'ল্ছেন। এ সংবাদ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষমহলের কাছে গেল। তাঁরা সাহায্য ক'রতে এগিয়ে এলেন। ইনি বল্লেন—খাই দাই হরিনাম করি, হিসাবের ধার ধারি না। আমি হিসেব-টিসেব দিতে পারব না, বাপু! যত দেবে, খাইয়ে দেব।" তাঁরা ব্যর্থমনোরথ হ'লেন। সরকারী পয়সার হিসাব ত' চাই।

নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মত নামপ্রচার চ'লেছে। ক্রমে প্রচার বাড়ছে। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য সবদিকে আছে। পুত্রের বিয়ের বয়স হ'য়েছে। সম্বন্ধ আস্ছে। সম্বন্ধ এল বাগড়ী থেকে। ইনি বল্লেন "ও মেয়ে ঘরে এলে সীতারাম······হ'বে।" মেয়ের বাবার কাছে পড়েছিলেন। ধন্য আদর্শ!

মৌন থেকে উঠেই মাকে ব'ল্লেন "মেয়ে যেখানেই থাক, ২৮শে আষাঢ় সীতারাম বিয়ে দেবেই রঘুনাথের।" শেষে বিয়ের ঠিক হ'ল। আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেল। বিয়ের দু'দিন আগে গুরুপুত্র এলেন দেনা-পাওনার কথা ব'ল্তে। ইনি "মা'র কাছে যা!" গুরুপুত্র বক্তা, আর সব শ্রোতা।

বিয়ের নিমন্ত্রণের জন্য বলে দেওয়া হ'ল। যে যাকে দেখবে, নিমন্ত্রণ ক'রবে। পুরোহিত করা গেল না। আদেশ ক'র্‌লেন বরকে (পুত্র)—"তুই নান্দিমুখ ক'রবি। বিমল কাজ ক'রবে। সীতারাম বসে থাকবে। হ'লও তাই। কাজ হ'ল সকলে বেরিয়ে পড়লেন। বর বেরিয়েছে, অমনি নামল বৃষ্টি। সবাই অধীর হয়ে উঠলেন্। বল্‌লেন—"জয় দে—।" 'জয় শ্রীগুরুমহারাজজীউ কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল, জলও থেমে গেল। নামের দল নিয়ে নৌকায় চড়ে চ'ল্‌লেন বিয়ে দিতে। অবশ্য ভাইপোকে বরকর্ত্তা ক'রে দিয়েছিলেন। ভাইপো তাতে রাজি নন্। কিন্তু কথা রক্ষা ক'রতে হ'ল। বিবাহ-বাসর দিগসুইয়ে গুরুবাড়ীতে। বরযাত্র শ' পাঁচেক। তাঁদের ব্যবস্থা অপূর্ব্ব। বিয়ে দিয়ে নব পুত্রবধূকে নিয়ে এলেন। নববধূর নাম দিলেন 'শ্রী'[১]। বাড়ীতে এসে তুলসীর মালা দিয়ে নববধূর মুখ দেখলেন। প্রথমা বধূকেও[২] একগাছি তুলসীর মালা দিলেন।

বহুলোক সমাগম। কোথাও জায়গা নেই। বাড়ীর পাশের বাড়ী, বাগানবাড়ী সবই জনসমুদ্র। শেষে ব্রজনাথজীর বাড়ীর কাছ থেকে কালীতলা পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে ডু'লাইনে লোক বসে গেল। এইভাবে রাত্রি ৮।০ পর্য্যন্ত খাওয়ানো-দাওয়ানো চ'ল্‌ল। কাজ হ'য়ে গেল। ডাকা হ'ল সব দেখতে। একটি একটি ক'রে সব জিনিষ দেখতে লাগ্‌লেন। লিপ্‌ষ্টিক নিয়ে "এটা কি করে?"

"ঠোঁটে মাখে।"

সাবান সেণ্ট্ সব দেখিয়ে পুত্রকে ব'ল্‌লেন "সব ব্রজনাথজীকে

১। শ্রীমতী শ্রীদেবী।

২। ভাইপো বউ।

দিয়ে মেখো। অলঙ্কার থেকে তোমার দুই দিদিকে কিছু দিও। বউদি'কেও দিও।"

সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। তবু কোথায় যেন ফাঁক রইল! বড় বউকে আরও কিছু দেওয়া দরকার। মাও[১] বেশ তৃপ্ত নন্। শেষে জেনে নিয়ে 'বাঁক' গড়িয়ে দেওয়া হ'ল সেই গয়না থেকেই, ধন্য তোমার কর্ত্তব্যচিন্তা! প্রাপ্য দেওয়া হ'ল।

এল 'বড় অতিথি'র উপনয়নের সময়। উপনয়নের দিন ঠিক হ'ল। নিমন্ত্রণপত্র মায়ের নাম দিয়ে ছাড়া হ'ল। কিন্তু তাতে কি হ'বে। তাই গ্রামে গ্রামে প্রতিনিধি ক'রেছিলেন, বললেন—"যার সঙ্গে যার দেখা হ'বে, উপনয়নের নিমন্ত্রণ করে দিবি।" তাই হ'ল। 'ধীরানন্দজী,' কেশিয়ার হ'লেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। না দেখ্‌লে অনুমান করা যায় না। এঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে—অর্থ স্পর্শ না করা। নিজে টাকা-পয়সার ধার ধারেন না। একবার একজন ব'ল্‌লেন—"ওমুক টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করে।"

ইনি—"প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রছে। অন্যের নিলে জেলে দেবে, তাই সীতারামের নিয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রছে।"

—এ-হ'ল ১৩৫৭ সালের কথা।

রামাশ্রমে, ইনি—"দেখেছিস্, 'সুধার ধারা'র সমালোচনা?"

ভাইপো—"ও আর কি হ'য়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেখুন।"

ইনি—"কারুর এক পুরুষের নয়। তোদেরও হবে না, কে ব'ল্‌লে?"

চাতুর্মাস্য আর মৌনকালেই কেবল একত্র থাকেন। বাকি সময় সঙ্গীদের নিয়ে নামপ্রচার ক'রে বেড়ান। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে

১। শ্রীঠাকুরের মা।

৺পুরীধামে এসে প'ড়লেন। কয়েকদিন থাকলেন। স্বভাব হ'চ্ছে প্রতি দেবালয় ও প্রতি মঠে গিয়ে প্রণাম করা। কাজেই এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই।

১৩৫১ সালে দিগ্‌সুই চাতুর্মাস্য অন্তে ৺কাশী ও অযোধ্যা যান। সঙ্গে অমর ও নারায়ণ (বেহাই) ছিলেন। সেখানে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

১৩৫২ সালে ভুজেন সরকার, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ক্ষিতীশ-চন্দ্র রায়চৌধুরীর উদ্‌যোগে কটকে তেলেঙ্গাবাজার রঘুনাথমন্দিরে চাতুর্মাস্য হয়। এখানে ৫০ দিন নাম হয়। তখনকার উড়িয়া সংবাদপত্র (মণি-মঞ্জু—৩য় ভাগ) প্রধান স্তম্ভে এই বিবৃতি প্রচার করেন।

১৩৫৩ সালে ডুমুরদহে চাতুর্মাস্যে ৬১ দিন নাম চলে।

১৩৫৪ সালে দশেড়ে (বাঁকুড়া) চাতুর্মাস্যে ৩ মাস নাম চলে।

১৩৫৫ সালে একলকীতে (বর্দ্ধমান) চাতুর্মাস্য হয়। এখানেও ৩ মাস নাম চলে।

১৩৫৬ সালে ৺পুরীধামে চাতুর্মাস্যে ১০৮ দিন নাম হয়।

১৩৫৭ সালে দিগ্‌সুই চাতুর্মাস্যে ৪ মাস নাম চলে।

১৩৫৮ সালে ৺পুরীধামে মৌন গ্রহণ করেন। দিগ্‌সুই সাধন-সমিতির সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় ৺পুরীধামের মৌন থেকে সঙ্গ নেন। প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকৃতেন।

১৩৫৯ সালে গণপুরে চাতুর্মাস্য হয়। অগ্রহায়ণে নবদ্বীপ প্রচার ও আসাম প্রচারে যান। এই সনেই ওঙ্কারেশ্বরে প্রথম মৌন নেন্।

১৩৬০ সালে মেমারীতে চাতুর্মাস্য হয়।

মৌনকাল এল। এবার মৌন ওঙ্কারেশ্বরে ১৩৬০ এর মাঘ থেকে

১৩৬২ সালের বৈশাখ পর্য্যন্ত মৌন থাকার পর মৌনভঙ্গ হ'ল। বহুলোক গেলেন। একজন কানাডা থেকে এলেন, নাম 'সিসিল মিড'। তিনি এসেছেন ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের যৎকিঞ্চিৎ আহরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরিক্রমা ক'রেও মনোমত গুরু না পেয়ে অগত্যা দেশে ফিরতে উদ্যত হ'য়েছেন। এমন সময় কলিকাতা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে সংবাদ পেয়ে কল্‌কাতা থেকে ওঙ্কারেশ্বরে ঠাকুরের চরণপ্রান্তে এসে শরণ প্রর্থনা ক'রলেন। তিলক, মালা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন্ সাহেব। সাহেব বাংলা জানেন না। তাই একজন 'দো-ভাষী' হ'লেন। একজন ব'ল্‌লেন—"ওঁকে সোজা জিজ্ঞাসা করা হ'ক, উনি কি চান!" হল তাই। জানা গেল, জানতে চান অধ্যাত্মজগতের সংবাদ। সীতারাম চুপ। ভক্তেরা ব'ল্‌লেন—"আপনার কাছ থেকে কেন ফিরে যাবে?" ইনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর প্রার্থনাপূরণের ইঙ্গিত ক'রলেন। সাহেব প্যাণ্ট পরেই বসলেন গুহায়, তাঁকে কাজ দিলেন। সাহেব উঠে এলেন।

প্রশ্ন এল—What have you got ?

সাহেব—O Light ! Light !

হ'ল জ্যোতি-দর্শন। পূর্ণ হ'ল অভিলাষ। পাতায় অন্নপ্রসাদ নিয়ে সাহেব যাত্রা ক'রলেন। শিখে নিলেন 'হরেকৃষ্ণ' নাম। সাহেবটি কানাডায় ইংরাজি সাহিত্য ও সঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন।

১৩৫৯ সালে গণপুর চাতুর্মাস্য। একটি যুবক এল, ব'ললে—"আমি আপনার কথামত নাম করেছি, তুলসীতলার মাটী মেখেছি, কৈ আমার হাত সারলো? নাম টামে কিছু হয় না!"

ইনি—"ঠিক করেছিস ?"

যুবক—"নিশ্চয়ই।"

ইনি—"সারবেই সারবে।" কয়েকদিন পরে দেখা গেল, সব ভাল হ'য়ে গেছে।

চাতুর্মাস্যে অনেকেই আসছে! একটি যুবক এসে ব'ললে—"বাবা! মন কিছুতেই সংযত হ'চ্ছে না।"

ইনি ব'ললেন—"বয়সের দোষ।" অবশ্য পরদিন তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

চ'লছে পাঠ দুপুরবেলা। ইনি "এ জন্মের কাজ দেখে বলা যায়, গত জন্মে কি ছিল, আগামী জন্মে কি হ'বে।"

প্রশ্ন এল—"তা'হলে এ জন্মে যে চুরি করছে, সে গত জন্মে চোর ছিল এবং আগামী জন্মে চোর হবে। তাহ'লে ধর্ম্ম ক'রে কি হ'বে ?"

ইনি—"এর মধ্যে একটা কথা আছে। যারা ভগবদ্-আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রারব্ধ ক্ষয় হ'চ্ছে। আগামী জন্মের জন্য আর সঞ্চয় হ'চ্ছে না—এই হ'ল ধর্ম্ম আশ্রয় করার লাভ।"

এক দম্পতিকে ডুমুরদহে প্রফুল্লের বাড়ীতে ওঙ্কারেশ্বরে যাবার দিন দীক্ষা দেন। তারপর মৌনকালে তাঁর পিতামাতার সন্ধান করেন, ধ্যানে দেখেন সেই দম্পতিই তাঁর পিতামাতা। পরে গোপালপুর চাতুর্মাস্যে তিনি প্রকাশ করেন—এই দম্পতিই মাতাপিতা[১] ছিলেন।

১৩৫৯ সালেই হুগলী কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক আশ্রয় নেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহামহোপাধ্যায়ের

১। ৺প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়। ৺মাল্যবতী দেবী।

সঙ্গে ১৩৩০ সাল থেকে আলাপ ছিল, এই সময় থেকে বিশেষভাবে আপনার করে নেন।

মেমারীতে মধুসূদন বেদতীর্থ আশ্রয় নেন। "শ্রীঅনন্তবাবা"র মন্ত্রচৈতন্য হয়।

১৩৫৫ সালে মৌনের পর ১৩৫৬ সালের বৈশাখে দক্ষিণদেশ প্রচারে যাওয়া হয়। চাতুর্মাস্য হয় পুরীতে। দক্ষিণদেশের প্রায় সমস্ত তীর্থ—সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কাঞ্চী, কুম্ভকোণ, তাঞ্জোর, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া হয়। সঙ্গে সেবা, গোবিন্দ, প্রণব, ধীরানন্দ, ধ্যান, সদানন্দ[1] প্রভৃতি।

১৩৫৬ সালে মৌন ৺কাশীধামে একমাস ক'দিন। তারপর হরিদ্বার কুম্ভমেলা—শ্রীমৎ সত্যানন্দ তীর্থ মহারাজের নিকট থেকে নামপ্রচার হয়; সঙ্গে গোবিন্দ, ধীরানন্দ, সেবানন্দ, সাধনানন্দ, তারাপদ[2] প্রভৃতি।

১৩৫৭ সালের বৈশাখে হরিদ্বার থেকে ঝান্সী, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ওঙ্কারেশ্বর। রাজার কাছে প্রস্তাব করে আশ্রমের কথা গোবিন্দ, ধীরানন্দ। পরে নাসিক চার সম্প্রদায় আখড়ায় থাকা হয়—শ্রীদীনবন্ধু দাস মোহান্ত। সেখান থেকে বোম্বাই পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে থাকেন। এখানে শিবজী ভাই, প্রহ্লাদ, নারায়ণ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়। ১৮ দিন বোম্বাই থাকা হয়। পরে পুণা ষ্টেশনের কাছে ধর্মশালায় থাকা হয়। থালিন্দী ও তুকারামের জন্মস্থানে যান। পরে কিষ্কিন্ধ্যা, পণ্ঢরপুর, গুণ্টুর রামনামক্ষেত্রম্ হ'য়ে ৺পুরী আসেন। পথে ছেলেদের ডায়েরী লেখা বাক্স চুরি যায়।

১। শ্রীবসন্তকুমার মল্লিক।

২। শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় (চুঁচুঁড়া)।

১৩৬০ সালে কৃষ্ণমূর্ত্তির আহ্বানে রাজোল যাওয়া হয়। সঙ্গে 'সম্পাদক দাদা', জয়ন্তী প্রভৃতি।

১৩৬০ সালে গুন্টুরে আহুত হ'য়ে যাওয়া হয়। সপরিবারে পদ্মলোচন[১] ও বেদতীর্থ[২] সঙ্গে যান।

১৩৬০ সালে মেমারী চাতুর্মাস্যকালে আঙ্গলকুড়ুরুর দাশশেষজী 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'[৩] দেন।

১৩৬২ সালে শ্রীজয়ন্তী মুখোপাধ্যায় 'নামপ্রেমী ঠাকুর' এঁকে দেন।

এবারে গোপালপুরে চাতুর্মাস্য। বহু লোকের যাতায়াত। কলিকাতার ঠাকুর মহামহোপাধ্যায় মেমারীতে ও গোপালপুরে এসেছিলেন। বহু বিশিষ্ট লোকও আসছেন। চাতুর্মাস্যে লক্ষ তুলসীদান হ'ল এবারের বৈশিষ্ট্য,—নাম আর সদাব্রত ত আছেই।

নাতনির (ভাগ্নীর মেয়ে) বিয়ের ঠিক ক'র্‌লেন। মা এঁকে বিয়েতে থাকৃতে ব'ল্‌লেন। বিয়ের সব ভারই এঁর। শ্রীব্রজনাথজীর বাড়ী থেকে বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল। প্রচুর জনসমাগম। বরপক্ষও এঁর আশ্রিত। ইনি সকলকে ব'ল্‌লেন—"বরপক্ষের যেন আদর-যত্নে ত্রুটি না হয়। আজ তাদের এটা পাওনা। সকলে এঁর আদেশ মাথায় নিয়ে কাজ ক'রছে। বরপক্ষ আগে এসে এখানে তিনুর[৪] বাড়ীতে আছেন। সেখানেই নান্দীমুখ-আদির অনুষ্ঠান তাঁরা ক'রেছেন। এখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাচ্ছে।

১। শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় (বালি)।

২। শ্রীমধুসূদন বেদতীর্থ।

৩। 'স্তবকুসুমাঞ্জলি'—সদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

৪। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা হ'ল। ইনি আর একটি বরের ঠিক ক'রলেন। সেই লগ্নেই বিয়ে হ'বে। এসে হাজির হ'লেন পুত্রবধূর কাছে।

"আমায় কিছু গয়না দে। কাণের কিছু দিতে হ'বে, আর একটা আংটি।" পুত্রবধূর কাছ থেকে নিলেন 'রাধাকৃষ্ণ দুল', আর হাতের আংটি। সব নিয়ে সোজা পুত্রের কাছে হাজির—"আমি এই সব নিয়ে এলাম। তোর হাত দেখি।" পুত্র হাত এগিয়ে দিল।

ইনি ব'ল্‌লেন—"আংটিটা দে।" আগের আংটিটা দেখিয়ে ব'ল্‌লেন—"এটা কোন্ আংটি?"

পুত্র—"গায়ে হলুদের আংটি।"

ইনি—"এটা রেখে দে।" দ্বিতীয়টি নিলেন।

আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সকলকে দেখালেন। কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। একসঙ্গে দু'টো বিয়ে হ'য়ে গেল। ছাওনা-তলায় নাতনী ও নাতজামাইকে বল্‌লেন—"ভবতারণ চক্রবর্ত্তী"র উপাখ্যান[১] স্মরণ কর। দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল তারাপদ'র[২] বাড়ীতে। ইনি এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াত লাগিয়ে দিলেন।

দেখতে এলেন বরযাত্রদের খাওয়াবার ব্যবস্থা কেমন হ'য়েছে। নিজে দেখে শুনে খাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'লেন। সেদিন গ্রামের ব্রাহ্মণ বলা হয় নি। পরদিন আবার গ্রামের ব্রাহ্মণদের ভোজন করালেন।

তাঁর একটা চিরদিনের অভ্যাস লেখা। কলম চলে একটু ফাঁক পেলেই। যন্ত্রস্থতায় মাত্র দর্শনশাস্ত্র উদ্‌ভাসিত হয়, তা নয়। নাটকও তাঁর রচনাবলীর মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে বসে আছে। ইনি শুধু নাটক লিখেই নিশ্চিন্ত নন্—সেই নাটক কখনও

১। উপাখ্যানটী শ্রীশ্রীঠাকুর-রচিত মাতৃপূজায় আছে।

২। ৺তারাপদ মিত্র।

ভদ্রেশ্বরের ছেলেরা, আবার কখনও দিগ্‌সুইয়ের ছেলেরা, কখনও বা ডুমুরদহের ছেলেরা, আরও অনেক জায়গার ছেলেরা মাঝে মাঝে অভিনয় ক'রতে ছাড়ে না।

১৩৬২ সালে বালিতে অভিনয় হচ্ছে—'শিব-বিবাহ'। তার আগে মদনমোহনতলায় যান, বহুলোক সমাগম হয়। আলমবাজার বেদ-বিদ্যালয়ে যান। এইরূপ অনেক স্থান ঘুরে বালি এলেন। এবার গোপালপুরে চাতুর্মাস্য হয়। অভিনয় করছে ডুমুরদহের ছেলেরা, প্রধান প্রফুল্লকুমার[১]। ইনি প্রথমেই সাজঘর-টর দেখে নিলেন। ষ্টেজে উঠ্‌লেন—'জয় জয় গুরুদেব বিধি' গান হ'ল। ইনি একটু ভাষণ দিলেন। নেমে প'ড়লেন ষ্টেজ থেকে।

এখন দর্শকের ভূমিকায় নামলেন। নবদ্বীপের ঠাকুর,[২] শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বহু অধ্যাপক, বহু জ্ঞানী গুণী লোক আছেন। ইনি নিজে অভিনয় দেখছেন; আবার মাঝে মাঝে কাছে যিনি আছেন, তাঁকেও দেখাচ্ছেন। মাঝে মাঝে সমাধিও হ'চ্ছে। এইভাবে সারা রাত কেটে গেল্।

তিনি দীক্ষা দেন। প্রকৃত অধিকারীকে সিদ্ধযোগ। সে দীক্ষা একেবারে সিদ্ধযোগ। যে যোগ আগেই সিদ্ধ হয়ে আছে—আর সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখে না। তবে যা করতে হয়, তা মনকে সৎকাজে লাগিয়ে রাখার জন্য, নয়ত মন অসৎ কাজ করতে উদ্যত হবে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটবে—অবশ্য তিন জন্মের বেশী নয়, সে যেখানেই যাক্, আর যাই করুক।

১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় (ডুমুরদহ)।
২। শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।

॥ চতুর্থ বিলাস ॥

এখন প্রচারের রীতি বদ্‌লে গেছে। ইনি বলেন—"সীতারাম গাড়ী ক'রে প্রচার করে।" 'মায়িকে' প্রচার চ'লেছে। জলে, স্থলে প্রচার আরম্ভ হ'য়েছে। এখন প্রধান সঙ্গী সেবক কিঙ্কর সেবানন্দ, কিঙ্কর গোবিন্দ। সেবানন্দজীর বিভাগ হ'ল—জলটল দেওয়া, ঠাকুর ঘরটর পরিষ্কার করা, তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখা। কিঙ্কর গোবিন্দজীর বিভাগ হ'ল—প্রচার বিভাগ, যোগা-যোগাদি। আর আর সঙ্গীরা যখন যেমন দরকার হয়, সেই-ভাবে কাজের সহায়তা করেন। ঠাকুরের ভার ধ্যানানন্দজীর উপর।

সদাব্রত চ'লছেই। চাতুর্মাস্যের ত' কথাই নেই। কিন্তু হালুই-করের রান্না চ'লবে না। সব ব্যবস্থাই করতে হয় তাঁর 'বাবাদের মায়েদের'। ভোগের রান্নার জন্য তাঁর মা যতদিন ছিলেন, স্বয়ংই লেগে যেতেন। সঙ্গে অবশ্য সাহায্যকারিণী থাকত। ভোগের রান্না খুব আচারনিষ্ঠ হওয়া চাই।

মৌনকাল এল। এবার মৌন ওঙ্কারেশ্বরে। দীর্ঘ দিন চ'লে গেল, মৌনভঙ্গ হ'ল না। মা আর স্থির থাকতে না পেরে ওঙ্কারেশ্বরে গেলেন। এই সময় উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা। গোবিন্দজীর চেষ্টায় বিশেষভাবে নামপ্রচার চ'লছে। খুব বড় তাঁবু প্রভৃতি হ'য়েছে। বাংলার অনেক ভক্ত কুম্ভমেলায় যোগদান করে কৃতার্থ হচ্ছেন। মা সোজা গিয়েই বেলতলায় সীতারামজীর নিকট উপস্থিত। সীতা-

রামজী প্রণাম ক'রলেন। ইঙ্গিত ক'রলেন—হাত-পা ধুয়ে জল খেতে। মা'টি সে পাত্রী-ই নন।

মা—"তুই কথা না কইলে, আমি কিছু খাব না।" মাতৃভক্ত সীতারাম কথা ব'ললেন। মা'কে একমাস কাছে রাখলেন। লোক সঙ্গে দিয়ে বহু তীর্থও করালেন! শেষে ব'ললেন—"মা, তুমি এখানে এখন থাক।" মা নারাজ। অনেক দিন হ'ল। শ্রীব্রজনাথজীর সেবার কি হ'চ্ছে, তাই তিনি ভাবছেন। ব'ললেন—"ব্রজনাথজীর সেবার অসুবিধা হবে, আমি থাকতে পারবো না।" মা ডুমুরদহে ফিরলেন। সচ্চিদানন্দজী এই সময় আশ্রয় নেন।

মা-এর যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গেই মৌন আরম্ভ হ'ল। মৌন কঠোরতর হ'তে কঠোরতম হ'য়েছে। সংবাদের আদান-প্রদান একেবারেই বন্ধ।

এইবারেই শ্রীসত্যধর্ম প্রচার সঙ্ঘের শ্রীগুরুপূর্ণিমার উৎসব ডুমুরদহে হয়। ডুমুরদহে আসার অল্পদিনের মধ্যেই মা অসুস্থ হ'লেন। অসুখ বেড়ে চ'লেছে। মায়ের প্রবল বাসনা হ'ল, তিনি ছেলেকে দেখেন। টেলিগ্রাম গেল পর পর তিনখানা। কোন ফল হ'ল না। সংবাদ এল, তিনি কিছুই নিচ্ছেন না। এদিকে তিনি মাকে মৃত্যুকালে দেখা দিলেন। মাত্র মাকে নয়, সেই সঙ্গে পুত্রকেও দেখা দিয়েছিলেন —দিন দুপুরে। মা অনন্তলোক যাত্রা ক'রলেন।

মৌনেই মার মহাপ্রয়াণের সংবাদ দেবযানে পড়েন। মৌন-ভঙ্গের পর পুত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। ব'ললেন—"হাঁরে? সত্যই তুই দেখেছিলি সীতারামকে? ঠাকুরের কি লীলা! তিনি সীতারামের রূপ ধরে মাকে দেখা দিলেন!" বল ত' প্রভু এটি কার লীলা?

ভাইপো, ভাইপো বউ, পুত্র ও পুত্রবধুকে সান্ত্বনা দিয়ে দীর্ঘপত্র লিখলেন—জানালেন সমবেদন।

১৩৬৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে গুরুমাতা, গুরুদেবের অগ্রজা ও কন্যা ওঙ্কারেশ্বরে গিয়ে মৌনভঙ্গ করালেন। তারপর বৃন্দাবন, কাশী, নাগপুর, আঙ্গলকুদুরু, গুন্টুর প্রভৃতি ঘুরে পুরী আসেন। সেখান থেকে ২০শে পৌষ কলিকাতায় উপস্থিত হন। হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, কোন রকমে সকলে তাঁকে নিয়ে···ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। তিনি সেদিন তথায় ৭০০ দীক্ষা দেন। পরদিন ডুমুরদহ লোকে লোকারণ্য, দিবাভাগে তিনি কোন রকমে ৺ব্রজনাথজীর ছাতে উঠে জনতার হাত হ'তে আত্মরক্ষা করেন। সন্ধ্যার পর ক'জনকে দীক্ষা দেন। রাত্রেই দিগ্সুই যান।

২৩শে চিতার মা'র পড়ায় ১৩০০ লোককে দীক্ষা দেন। ২৪শে নবগ্রাম যান। সেখানে দীক্ষা দিতে পারেন না। এখানে ১৩৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'অখণ্ড নাম' চলছে। শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ২৪শে কিছু দীক্ষা দেন। ২৫শে মেমারী হেমাঙ্গিনী মঠে যান। ২৬শে জাখ্রা 'কেদারনাথ আশ্রমে' যান। খুব জ্বর। সস্ত্রীক পদ্মলোচন তাঁকে নিয়ে বালি যান। পরদিন তিনি ৺পুরীধামে গিয়ে একমাসের জন্য মৌন নেন। মৌনান্তে শ্রীমদ্ চিন্ময়ানন্দজী দোল-পূর্ণিমায় নগরসঙ্কীর্ত্তনে (কলিকাতা) যোগদান করবার জন্য প্রার্থনা করেন। ডাক্তার ও শিষ্যগণের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন, শ্রীতুষারকান্তি প্রভৃতি ভক্তগণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন।

দিগ্সুই আসেন। 'মাদার', 'পরমানন্দ', 'প্রণব-পারিজাত', প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলির কথা হয়। এর পূর্ব্বে মৌনকালেই মাসিক

পত্রগুলি প্রকাশের কথা জানিয়ে দেন। দোলের দিন উড়িয়া ভাষায় জয় জগন্নাথ প্রকাশিত হয়।

এবার সঙ্গে সচ্চিদানন্দ ও সেবানন্দ ছিল। এখানকার কার্য্যান্তে সকলে ময়ূরভঞ্জের দিকে রওনা হন। ওদিকে ব্যবস্থা ছিল 'গোবিন্দজী' দলবলসহ ময়ূরভঞ্জে নামপ্রচারে যাবেন। তাই হয়। এঁরা বালেশ্বরে নামেন, গোবিন্দজী এসে এঁদের নিয়ে যান। ক'দিন এখানে নামপ্রচার ক'রে যাবার সময় জ্বর হয়। জ্বর অবস্থাতে কটক আসেন। সেখান থেকে ক্ষিতীশ[১] এবং যোগমায়া দেবী মোটর গাড়ী ক'রে নীলাচল আশ্রমে নিয়ে আসেন। নিউমোনিয়া হয়। যাহোক শ্রীমতী লক্ষ্মীমা উপস্থিত হন। ভগবৎকৃপায় শীঘ্রই রোগমুক্ত হ'য়ে যান। বিঠু, জগু প্রভৃতির উপনয়নে উপস্থিত থাকবার আদেশ ছিল মাতার। বাংলায় তা অসম্ভব বিবেচনায় ৺পুরীধামে নীলাচল আশ্রমে তাদের উপনয়নের ব্যবস্থা করেন। দিগসুই হ'তে গুরুদেবের অগ্রজা, কন্যা, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র এবং বহু লোক উপস্থিত হন। উপনয়ন সম্পন্ন হ'লে সকলে বাংলা আসেন।

ইনি গোবিন্দজী ও ধীরানন্দজীকে নির্জ্জন সাধনার জন্য ওঙ্কারেশ্বর যাবার কথা বলেন। গোবিন্দজী চলে যান। পরে ধীরানন্দজী ওঙ্কারেশ্বরে আর রমানন্দজী কানপুর মৈথিলী মঠে যান। এই সময় থেকে এই দু'জন সঙ্গ ত্যাগ করেন।

ইনি সচ্চিদানন্দ, সেবানন্দ, বর্দ্ধমানের শম্ভু[২] ও তাঁর পুত্র এবং

১। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী।

২। শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রফুল্লকে[১] নিয়ে আঙ্গলকুড়ুরু যান। সেখানে শ্রীমদ্দাশশেষজী মহারাজ ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক বিরাট শ্রীরামপট্টাভিষেক যজ্ঞ করেন। সিমলাগড়ের শ্রীধীরেন মুখোপাধ্যায় মশাইও যোগদান করেন।

যজ্ঞান্তে কয়েকস্থান ঘুরে ইনি পুরী আসেন। সেখানে ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে সভাপতি হ'বার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্তকে পাঠান। তিনি স্বীকৃত হন। যথাসময়ে শালখিয়ায় বিরলের[২] বাড়ী উপস্থিত হন। সেখান থেকে রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে যোগদান করেন।

পরে বাংলার কয়েক স্থান, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা স্থানে প্রচার করতঃ চাতুর্মাস্যের পূর্ব্বদিন মগরায় আসেন। মগরায় চাতুর্মাস্য হয়।

তিনি জগৎকল্যান করেই চ'লেছেন। মৌন, নামপ্রচার, চাতুর্মাস্য বৎসরের পর বৎসর আবর্ত্তিত হয়ে চ'লেছে। সঙ্গীরূপে সচ্চিদানন্দজীর আবির্ভাব হয়েছে ওঙ্কারেশ্বরে।

১৩৬৫ সালে মগরায় চাতুর্মাস্য। মহাধুমধাম চ'ল্‌ছে, ১৬।১৮ মণ চাল ত' আছেই। বিশেষ দিনে ২৮।৩০ মণ পর্য্যন্ত রান্না হয়। প্রধান উদ্যোক্তা বিজয়[৩], ব্রহ্মনারায়ণ প্রভৃতি। দীনবন্ধু[৫] ত' আছেনই। মগরায় শরীর অসুস্থ হয়। খরচ হ'ল চার মাসে মোটামুটি লাখ দেড়েকের মত। শেষে এখানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা

১। ডুমুরদহ।

২। শ্রীবিরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীবিজয়কুমার দে।

৪। শ্রীব্রহ্মনারায়ণ কুমার।

৫। ডাঃ শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ।

করলেন এবং অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামযজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। মগরায় জীবনে প্রথম সিনেমা দেখেন—ভক্তের প্রার্থনায়।

২৭শে পৌষ দিগ্‌সুই-এ অভিনয় হ'ল। তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। ২৯শে পৌষ দিগ্‌সুই 'রামনাম মন্দির' প্রতিষ্ঠা হ'ল। ১২৫ কোটী রামনাম লেখা খাতা আছে। রামসীতা, লক্ষণ, মহাবীর বিগ্রহ আছে। এই কার্য্য এই প্রথম হ'ল। শাস্ত্রে বিধি আছে। প্রয়োগ হয় নাই। গুরুপাটের মর্য্যাদা বাড়ালেন। এটা হ'ল গুরু-সেবা। মেমারী হেমাঙ্গিনী মঠে মন্দির হ'ল। সেখানে শ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীমতি রাইকিশোরী প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। শ্রীগুরুদেবের অগ্রজা দিগ্‌সুই 'রামনাম' মন্দির ও মেমারীর শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন গুরুপত্নী।

কলিকাতার ঠাকুর মহামহোপাধ্যায় দিগ্‌সুই ও মগরায় আসেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালিপদ ভট্টা-চার্য্য এঁকে খুব স্নেহ ও শ্রদ্ধা করেন। তাঁরা মগরা ও দিগসুই-এ আসেন।

সইয়ের বিয়ে দিতে হ'বে, পাত্রের সন্ধান হ'ল। সইয়ের বয়স ১৩ বৎসর। সয়াটিও জোগাড় ক'রলেন ১৭।১৮ বছরের। নিজে উপস্থিত থেকে বিয়ে দেবেন। যদিও সামাজিক কাজে সাধারণতঃ থাকেন না। বিয়ের দিন এল। গুরুদেবের বাড়ীতে আছেন। ক্রমে সেস্থান জনসমুদ্র হয়ে উঠল। বিয়ের সব জিনিষপত্র দেখছেন —আনন্দ আর ধরে না। নিজেই বাংলায় পদ্য ও একটি সংস্কৃত কবিতা লিখলেন এবং পুরঞ্জয়ের দ্বারা আর একটি বাংলা কবিতা রচনা করালেন।

এই ফাঁকে আর একটি মেয়ের বিয়ের ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন। সইয়ের কাছ থেকে কাপড়-চোপড় নেওয়া হ'ল। এখন গয়না চাই

ত'। ধরলেন পুত্রবধূর হাত "'শ্রী' তোর হাতে কি আছে?" পুত্রবধূ হাত এগিয়ে দিলেন। পরে তাঁর লক্ষ্মীমার[১] কাছে গেলেন। তিনি নিজের হাতের চুড়ী খুলে দিলেন। তিনি তাই নিলেন। পুত্র এসে হাজির, ধরলেন তাঁকে "তোর হাতে কি আছে?" লক্ষ্মীমা বললেন "তোমার ভাইটীর[২] হাতে আংটি আছে।" 'ভাইটিকে' ডেকে আংটি দেওয়া হ'ল। 'শৈল'র[৩] বাটীতে এই বিয়ের সব ব্যবস্থা হ'ল।

সইয়ের বিয়ে আরম্ভ হ'ল। নিজে কাছে বসে রইলেন। মন্ত্রের অর্থও কিছু কিছু বলে দিলেন। বিবাহকালে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্র নাথ ও শ্রীহরিনারায়ণ বেদতীর্থ উপস্থিত ছিলেন। বেদতীর্থ বেদমন্ত্র পাঠ করেন। সইয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। সই শ্বশুরবাড়ী গেল। ইনিও সয়ার বাড়ী গিয়ে সদলে উপস্থিত। বৌভাত, ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ খেতে হ'বে ত? মহাধুমধাম লেগে গেল। নাম, ভাষণ, ছায়াচিত্র দেখান চল্‌তে লাগল। তিনদিন পরে চ'ললেন প্রচারে।

শীর্ণদেহ, দীর্ঘজটা, বুকে গুরুপাদুকা, দেড়হাত কাপড়, আহারের বিশ্রামের অবসর নেই। গুরুর হ'য়ে কাজ করে চ'লেছেন। "এটা যন্ত্র, গুরুদেব (ঠাকুরটি) যন্ত্রী। এতে এটার কিছু বাহাদুরী নেই।"

অপূর্ব্ব লীলা! অর্থ চাই তার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। চাকরি, তারও দরখাস্ত নেওয়া হ'চ্ছে। মেয়ের বিয়ে, কোন চিন্তা নেই। সকলকেই কিন্তু সঙ্গে থাকতে হ'বে। মানীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। পণ্ডিত;—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

১। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী (বালি)।

২। লক্ষ্মীমা'র বড় পুত্র।

৩। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (দিগসুই)।

একবার বৃন্দাবনে ব্রজবাসীগণকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। তাঁরা এলেন ইনি পা ধুইয়ে জটা দিয়ে পা মুছে দিলেন। শিষ্যরা অধীর হ'য়ে উঠল! কর্ত্তব্য ক'রছেন। এর নাম কি মর্য্যাদারক্ষা? তাই কি তোমার নাম মর্য্যাদা পুরুষ? কোন শিষ্য চায় খাতির, তাকে খাতিরই ক'রলেন।

প্রভু, এটা কি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" নয়?

দিন দিন শিষ্যসংখ্যা বাড়তে বাড়তে অসংখ্যের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান দলে দলে এসে আশ্রয় (দীক্ষা) নিচ্ছে। তিনি চির-নির্ব্বিকার, নিত্যপ্রসন্ন। শিষ্যেরা কত কথা ব'লে বেড়ায়, কত প্রবন্ধ, কবিতা, স্তোত্রের আকারে প্রশস্তি রচনা করে, তিনি নির্ব্বিকার। তাঁর জীবনের দু'টি রহস্য প্রকাশ করা চল্‌বে না; তা যদি কর ত' সীতারামকে পাবে না। আর যা বল্‌বে বল, যা ভাববে ভাব, যা লিখবে লেখ 'যদ্ রোচতে তৎ কুরু' ভগবান্, অবতার, জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, সিদ্ধ মহাপুরুষ, যা বলবে বল। কত ছোট তুমি তাঁকে ক'রবে। তিনি অণুর অণু হ'য়েই আছেন অথচ বৈষ্ণব-বিনয় বলতে যা বুঝি, তার সঙ্গে তাঁর এভাবের কত প্রভেদ। ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁর গৌরব অতিরঞ্জন ক'রবে? সে সাধ্য তোমার কৈ? কতটুকু ভক্তি তোমার ঐ ক্ষুদ্র আধারে ধরবে? তার আবার উচ্ছ্বাস? পথের কুকুরটি তাঁর ইষ্টদেব, জেলখানার গেটের সামনে দণ্ডবৎ—প্রণাম ক'রছেন। কলকাতার বিরাট ড্রেন দেখে প্রণাম ক'রছেন; বল্‌ছেন—"তুমি আছ, তাই কলকাতা আছে।" রেল-ষ্টেশন হ'ল ডুমুরদহে; তিনি তাঁর দিব্যদেহ প্রসারিত করে প্রণত হ'লেন তার সামনে। নবদ্বীপে একটি টিনের কুটিরে এক সাধু বসে বিড়ি ফুঁকছেন; তাঁর চরণে ভাগবত তনু ভূলুণ্ঠিত করে

দিলেন। হতবাক্ সাধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, বিড়ি ফুক্‌তে ভুলে গেলেন। তৃণের চেয়ে ছোট যিনি হ'য়েই আছেন, তাঁকে কত ছোট ক'রবে! শিষ্য অভিমান ক'রে লিখ্‌ছেন "আমার প্রাণের ঠাকুরকে মূর্খ ভক্তের দল শেষটায় অমুক ঠাকুর বানাতে চায়। এ ব্যথা, এ লজ্জা রাখ্‌বো কোথায়।" তিনি লিখ্‌লেন "অমুক ঠাকুর! বলিস কিরে? তাঁর শিষ্যের পদরজ হ'লে সীতারাম ধন্য হয়।" অথচ দীনাতিদীন, তৃণাদপি হীন ঠাকুরটির আর একটু অদ্ভুত দিক্—তাঁর প্রতিষ্ঠাবিষয়ে নিঃশঙ্কতা। প্রতিষ্ঠাবিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়া সহজ। প্রতিষ্ঠাভীতি ত' অনেক মহাপুরুষের দেখা যায়। তাঁদের শিষ্যদের গুরুর কথা ব'ল্‌তে বারণ। এই ঠাকুরটির সকল বিষয়েই সমান রুচি এবং সমান অরুচি। নিন্দাস্তুতি দুই-ই তাঁর কাছে রুচিকর, দুই-ই অবান্তর। আসুক নিন্দা, তিনি ভারী খুসী, কৌতুকে সমুজ্জ্বল। এলো স্তুতি ত' ভারী মজা। আঁট নেই কোনটাতেই। ভয় নেই কোনটাতেই। উভয়কেই কোল বাড়িয়ে দিচ্ছেন। গরলকে সমগ্র দেহের অণু-পরমাণুতে গ্রহণ ক'রছেন, প্রতিষ্ঠা-গরলকে অমৃতে পরিণত ক'রছেন। এঁর কাছে গরলও অমৃত, অমৃতও গরল। প্রতিষ্ঠাকে অবলীলাক্রমে হজম করা আর বোধ হয় কখনও দেখা যায়নি, দেখা যাবে না। তাঁর প্রতিষ্ঠাকে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠা ব'লে নেন্ না। তিনি জানেন, এ আমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা। বলেন—তাঁর নাম নিয়ে আছি, তাই এত লোক ছুটে আস্‌ছে। সব গৌরব তাঁর অর্থাৎ ঠাকুরের, তাঁর নামের। বলেন "আজ যদি একটা অপকর্ম ক'রে ফেলি, কাল আর কেউ মুখদর্শন ক'রবে না।" শিষ্যেরা বলেন করুন দেখি অপকর্ম, দেখি কত ক্ষমতা।

—আমি বলি, করুন না তিনি অপকর্ম, অপকর্ম মহাধর্মে পরিণত হ'বে। তাঁতে আশ্রয় পেলে অপকর্মও মহৎপুণ্যরূপে বিবেচিত হ'বে—।

মৌনকালে প্রতি উপনিষদের সাধন-প্রণালী তাঁকে আশ্রয় ক'রছে। সমাধির ফাঁকে ফাঁকে চলে কলম। সামনে আছে খাতা, হাতে কলম, লেখা স্বতঃই উৎসারিত হ'চ্ছে। প্রয়াস নেই, প্রস্তুতি নেই, চিন্তার অবকাশ বা প্রয়োজন নেই, লেখনী তার কাজ করে চ'লেছে। খাতার সাদা পাতাগুলিতে সত্য স্বয়ং আবিভূর্ত হ'চ্ছেন। তিনি যেন যন্ত্র, যেন সাক্ষী—এইমাত্র। কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদির বালাই নেই, সারি সারি লেখাগুলি সুবিন্যস্ত হ'য়ে চ'লেছে, কত গ্রন্থ থেকে কত সব উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ হ'চ্ছে, তিনি যেন উপলক্ষ্য মাত্র। আমরা শুনেছি বেদ অপৌরুষেয়, বেদবাণী রচিত নয়, স্বতঃই ব্যক্ত। এসব কথা আমাদের মত লোকের চট্ করে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যাঁরা এই ঠাকুরটির লেখার লীলারহস্য অবগত আছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সত্যকে দর্শন, শ্রবণ, উদ্‌ঘাটন করেন মাত্র—সত্য রচনা করা চলে না। যা রচিত হয়, তা অসত্য। যে বাণী অপৌরুষেয়, সেই বাণীই সত্য। যা উদ্‌ভাবিত, তা সত্য নয়, যা উদ্‌ভাসিত, তাই সত্য।

এইভাবে ঠাকুরটির লেখনীর মুখে গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদির অভিনব ভাষ্য নির্গলিত হ'ল। কত ছন্দে, কত ভাবে, কত ভঙ্গিমায় পরম সত্য তাঁর চরম অভিব্যক্তি লাভ করলেন এঁর যন্ত্রস্থতায়। কত গ্রন্থ-ই ত লেখা হ'ল, আর কত লেখা হ'চ্ছে সে সবের কতটুকু বা এ যাবৎ মুদ্রিত হ'য়েছে। অধিকাংশই আছে পাণ্ডুলিপি। একদিন সব ছাপা হবে। কিন্তু সেদিন সত্যজাগ্রত পাঠক-বর্গের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে কি রোদনভরা হাহাকার নির্গত হবে না?

কিন্তু তাই ব'লে তিনি আমাদের মত অনধিকারীর প্রতি উদাসীন নন্। অনধিকারীদের জন্যই তাঁর বেশী কৃপা, উৎকণ্ঠাও বেশী। পাতকীর মনের সব গ্লানি ভুলিয়ে দেবার, মুছে দেবার জন্য বলেন— 'মহাপাতক ক'রবে না, তবে কলিতে এসেছ কেন? তাহ'লে ত' সত্যযুগে জন্মালেই পারতে।" কিন্তু প্রসঙ্গটি বিস্তারিত বর্ণনা করাই বোধ হয় সমীচীন। আজ হ'তে বহু বৎসর আগে ৺কাশীধামের ঘটনা।

"কে?" চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর।

বাবা কি তা হ'লে কোন আঘাত পেলেন?

ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন প্রণবানন্দ। দেখেন,—শায়িত ঠাকুরের পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক—বেশভূষায় মনে হয় উচ্চপদস্থ, মুখে চোখে আধুনিক শিক্ষার সুস্পষ্ট ছাপ।

'চুপ ক'রে রইলে যে? কে তুমি?' পুনরায় ঝাঁঝাল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন ঠাকুর।

'আমি', উত্তর দিলেন আগন্তুক।

'আমি কে?'

'পাপী।'

"পাপী, কি পাপ ক'রেছ?'

'করিনি এমন পাপ নেই।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন ঠাকুর। কি পাপ করেছ শুনি। ব্রহ্মহত্যা? নরহত্যা? ভ্রূণহত্যা? স্বর্ণস্তেয়? পরদার? এই সব? না, আর কিছু করতে পেরেছ?"

ভদ্রলোক স্তম্ভিত। ঠাকুর বললেন, "তা হ'লে আর পাপ কি ক'রলে? মিথ্যা ব'লবে না, চুরি ক'রবে না, পরদার ক'রবে না, তবে

কলিতে এসেছ কেন? তা হ'লে সত্যযুগে জন্ম নিলেই পার্‌তে! মাভৈঃ। চালাও রামনাম। যা কিছু ক'রেছ উড়িয়ে দাও রাম নামের তোপে। শ্বাসে শ্বাসে চলুক রাম রাম রাম—।* একবার কথা প্রসঙ্গে বল্‌'লেন—"যে ভাল আছে, তার জন্য সীতারামের কি দরকার? সীতারাম খারাপের জন্যই। তাদের তাই বেশী কাছে কাছে টেনে রাখি। অনেক সময় কাছে নিয়ে শুই। চোখের আড়াল হ'লে অপকর্ম ক'রে ফেলে।

কানপুরে একটা ব্যাপার হ'ল। একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, সুমার্জিত ভদ্রলোক এঁর কাছে এসে নিবেদন ক'র্‌লেন—আমি নাস্তিক, আমার পিতা নাস্তিক এবং পিতামহ নাস্তিক ছিলেন, আমাদের নাস্তিকের বংশ। আমার শান্তি এবং আনন্দ লাভের কোন পথ আছে কি? উনি ব'ল্‌লেন—নিশ্চয়ই আছে বাবা। তারপর তাকে একান্তে ডেকে কিছু ব্যবস্থা দিলেন। এঁর কাছে নাস্তিকও আসেন এবং নাস্তিকের ব্যবস্থাও ইনি করেন। কিন্তু নাস্তিক্যনীতি ত্যাগ ক'রতে আদেশ করেন না। ত্যাগের জন্য চিন্তা ক'র্‌তে হয় না, যেটা ছাড়াবার প্রয়োজন, সেটা আপনিই ছেড়ে যায়; ত্যাগ স্বতঃই তাকে আশ্রয় করে।

এ অভয় মিথ্যা স্তোক নয়, সরল ঋজু অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু নামের এত কি সামর্থ্য আছে? অবশ্যই আছে। তাঁর শ্রীমুখ হ'তে ত' মিথ্যার লেশও বার হ'তে পারে না। একথা যিনি একবার তাঁকে দর্শন ক'রেছেন, তিনিই স্বীকার ক'র্‌বেন। তা ছাড়া তাঁর বাণীর, তাঁর উপদেশের পিছনে রয়েছে সমগ্র জীবনের সাধনা এবং তপশ্চর্য্যা; এমন একটি কথাও বলেন না, যা তাঁর নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভূত

* স্তবকুসুমাঞ্জলি, দ্বিতীয় প্রবাহ, পৃঃ ৫০।

সত্য নয়। তাঁর একটি গ্রন্থে শাস্ত্রের মহিমা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ব'লেছেন "ইহা শোনা কথা নহে, ইহা পড়া কথা নহে, ইহা দীর্ঘ জীবনের অনুভূত মহাসত্য।" তাঁর এই ব্যাখ্যাটি সকল মন্তব্য এবং বক্তব্য সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। শোনা কথার, পড়া কথার ধার তিনি ধারেন না, তাঁর কারবার "অনুভূত" "মহাসত্য" নিয়ে। মাত্র 'অনুভূত' সত্যপ্রকাশ করেন ব'লেই তাঁর বাণীর এই অমোঘ শক্তি।

মাতৃভক্তি দর্শনীয়। রোজ পূজার শেষে মাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা ক'র্‌তেন, পাদোদক পান ক'র্‌তেন। মা যা ব'ল্‌তেন, তাই শান্তশিষ্ট শিশুর মত পালন ক'র্‌তেন। বহির্বাস বস্ত্র ত্যাগ ক'রে-ছিলেন শুনে মা ছুটে গেলেন ডুমুরদহ থেকে। মা বলামাত্রই লক্ষ্মী ছেলেটির মত সুরসুর ক'রে মায়ের দেওয়া কাপড় পরে ফেলেছিলেন।

কত ব'ল্‌বো? ত্যাগ কল্পনার আওতায় আসে না। মৌনকালে ডাইরীতে লিখে জানালেন—"যদি দেহ চলে যায়, কাঠের বাক্স ক'রে ভাসিয়ে দিবি, নির্বিকল্প সমাধি হ'লে ৪।৬ দিন দেখে মাথায় অল্প অল্প গরম জল ঢালবি। দেহে পচন আরম্ভ হ'লে তবে দেহ সরান হবে।" প্রফুল্ল ও ধ্যানানন্দজী ডুমুরদহে সংবাদ দিলেন। গুরুপুত্র ও ভাইপো এলেন। মৌনেরও অবসান হ'ল।

একটা কথা আছে—'আগে আদেশ পালন ক'র্‌তে হয়, তারপর আদেশ করার অধিকার হয়।' এ লীলাও অপূর্ব্ব অনুপম। কি ক'রে আদেশ পালন ক'রতে হয়—যিনি তাঁকে দেখেন নি, তিনি কল্পনাও ক'রতে পারবেন না। এক যুগের অধিককাল এই মহাযোগী মহেশ্বর যে নিরলস অতন্দ্রিত জীবনযাপন ক'রে চ'লেছেন, অন্য কোন জীবনমুক্তের পক্ষেও বোধ হয় তা অনুমান করা সম্ভব নয়। অথচ

তাঁর এই বিশ্রামবিহীন দৈনন্দিন কৃচ্ছ্রসাধন—এ-ও দেখি শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ এবং স্বাভাবিক। কখনও মনে হবে না এতটুকু কঠোরতা, এতটুকু কৃচ্ছ্র-প্রয়াসের লক্ষণ আছে তাঁর এই অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে। তাঁকে আশ্রয় ক'রে কঠোরতাও রমণীয়তা অর্জন ক'রেছে। কৃচ্ছ্রসাধন লীলাবিলাসে রূপান্তরিত হ'য়েছে—"মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।"

তাঁর বাণী হ'ল—মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার ঈশ্বরকে ডাকবার, তাঁকে লাভ ক'রবার অধিকার আছে;—হও হীন, হও নীচ, হও পাপী, হও তাপী—তবু তোমার পথ আছে; সে পথ হ'ল নামের পথ।—উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে নাম কর। তা হলেই তুমি ভগবানের দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হবে। তিনি বলেন—'অতীতের দিকে চেয়ো না; যা হ'য়ে গেছে, তার আর চারা নেই; সে কথা ভেবে বিচলিত হইও না। আছে বর্ত্তমান, তার সদ্ব্যবহার কর, শুধু নামকে আশ্রয় কর, তা হ'লেই সব হবে। মাত্র নাম ক'র্‌লে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'র্‌বে। অন্য কোনও সাধনের দরকার হবে না। তাঁর আর একটি বাণী—শাস্ত্র সত্য, শাস্ত্র-পথ প্রহরীবেষ্টিত রাজপথ, এই নিরাপদ পথে বিচরণের চেষ্টা কর। তিনি বলেন,—মাতৃপিতৃসেবা পুত্রের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, নারীর ধর্ম পতিসেবা, শিষ্যের কর্তব্য গুরুসেবা। যে পুত্র 'আমার পিতা জগৎপিতা, আমার মাতা জগন্মাতা' এই বোধে পিতৃ-মাতৃ সেবা করে, তার নেই অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন। যে নারী "আমার পতি নারায়ণ" এই জ্ঞানে পতিসেবা করে সেই পতিব্রতার স্বতন্ত্র সাধনের কোন প্রয়োজন হয় না। শিষ্য মাত্র গুরুসেবার দ্বারাই কৃতার্থ হ'তে পারে, অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা তাকে ক'র্‌তে হয় না। তাঁর আর একটি উপদেশ—'যে যা কর, তা অন্তর দিয়ে

কর। কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিও না। কর্ম্ম প্রাণ-মন দিয়ে কর, কিন্তু কর্ম্ম-ফল ভগবানে সমর্পন কর। কর্ম্ম আরম্ভ করার আগে ভগবানের কাছে শক্তি প্রার্থনা কর, অন্তে ফল তাঁতে অর্পণ কর। যদি চাকুরীর ক্ষেত্রে ফাঁকি দাও, তা হ'লে শ্রীভগবানের কাছেই ফাঁকি দেওয়া হবে। এইভাবে চিন্তার ধারা প্রকাশ ক'রেছিলেন এক সময়। এই প্রকারে কর্ম্ম ক'র্লেই নিত্য উপাসনা করা হয়। যা নিজের ভোগের জন্য কর, তাই পাপ। যা ভগবানের প্রীতির জন্য কর, যা জনগণের হিতার্থে কর, তাই পুণ্য। যাতে চিত্তের দৈন্য আনে, তাই পাপ। যাতে চিত্তের ঔদার্য্য আনে, তাই পুণ্য।'

এক সময় ব'লেছিলেন—"ওদের জীবনধারা বিচার কর্লে লোকে ব'ল্বে মহাপাপী। সীতারাম কিন্তু ওদের মহাধার্মিক মনে ক'রে। ধর্ম্ম ব'লতে সীতারাম প্রাণটা বোঝে কিনা? ওদের প্রাণ বড়।" তার চিন্তায় একথাও জেগেছে—যারা দেশের সেবা করে, তারাও ধার্মিক—তারা প্রণবের প্রথম পাদের সেবা করে। কেউ শুধু অধর্ম্মই ক'র্তে পারে না, ধর্ম্মও অজ্ঞাতসারে ক'র্বেই। কালের মধ্যে যেমন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি আছে, তেমনিই প্রতি মানুষের জীবনেও এই চারকাল খেলা করে। ভালকে বাড়াতে থাক্লে খারাপ আপনিই সরে যাবে, খারাপের জন্য কাউকে চিন্তা ক'র্তে হবে না। এঁর পথ হ'ল অর্জ্জনের, বর্জ্জনের নয়। তাঁর মূল বক্তব্য হ'ল—চিত্তকে ঈশ্বরের অভিমুখী করা। সৃষ্ট্যুন্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী কর। বড় বড় আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁর অভিপ্রেত নয়। ছোট ছোট আশ্রম চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ায় আস্থা তাঁর বেশী। অধ্যাত্ম-সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ, সকল দিকে বিচ্ছুরণ, তাঁর উদ্দেশ্য ব'লে প্রতীয়মান হয়। প্রতিটি গৃহ আশ্রম হ'ক, এই যেন তাঁর লক্ষ্য। প্রতিটি গৃহস্থ জীবন্মুক্ত হ'য়ে

সমাজ সংস্কার রক্ষা করুক, ব্রহ্মবিদ হ'য়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম্মে নিমগ্ন থাকুক—এই যেন তাঁর আদর্শ। ব্রহ্মজ্ঞানকে তপোবনের সম্পদ না ক'রে প্রতি গৃহের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত করাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য। ঘরে ঘরে জনক বিরাজ করুক, প্রতিটি ব্যক্তি "ধর্মব্যাধ" হোক, এই যেন তাঁর ব্রত।

এটা তাঁর লীলার অপর একটা দিক্। ভাইপো মৌন নিয়ে তপস্যা ক'র্‌ছেন ৺পুরীতে। সীতারামজীকে সাক্ষাৎ দর্শন দেবার ব্যবস্থার জন্য পত্র দিলেন। উত্তর এল—

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তস্তু শীঘ্রং সিদ্ধিং ন কাময়েৎ।
কালেন দুরিতক্ষয়ে স্বয়মেব প্রজায়তে॥

যোগ অভ্যাসে রত হ'য়ে তাড়াতাড়ি সিদ্ধি কামনা ক'র্‌বে না। পাপক্ষয় হ'লে সিদ্ধি স্বয়ংই সাধককে প্রাপ্ত হ'ন।

কঠোর মৌন চলছে ওঙ্কারেশ্বরে, কোন সংবাদের আগম নির্গম নেই। ভাইপো এর অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। ৪।৫ মাস ধরে বহু চেষ্টা ক'রে কিছু করা গেল না। বাধ্য হ'য়ে তাঁর শরণ নিতে হ'ল—অর্থাৎ সাধনকালে তাঁর কাছে পাঠাতে হ'ল ভাইপোকে। কেউ যেতে পারবে না তাঁর কাছে, এই হ'ল আদেশ। শেষে তাঁর গুরুপুত্রের শরণ নেওয়া হ'ল। তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। তাঁর অবাধ গতি—তিনি যে গুরুপুত্র।

মৌন নিয়ে লিখে কথা চ'ল্‌ছে। গুরুপুত্র মৌনভঙ্গের আব্দার ক'র্‌লেন। ইনি "আমি তোকে শ্রদ্ধা করি।" গুরুপুত্র—'ওকথা বলছেন কেন?" সেদিন এইভাবে কেটে গেল। আশ্রমে অন্য ঘরে রইলেন তাঁরা দুজনে।

পরদিন সকালে রোজের মত গুরুপুত্র গেলেন। পা ধরে মৌনত্যাগের প্রার্থনা ক'রলেন, তিনি মৌনত্যাগ ক'রে বাইরে এলেন। গুরুপুত্র জয় দিলেন, সকলে বিস্ময়ে ছুটে এল, কৃতার্থ হ'ল।

গুরুপুত্র আবার আব্দার ক'র্‌লেন—"এবার এখানেই (ওঙ্কারেশ্বরেই) চাতুর্মাস্য হোক্।"

ইনি—"তুই যখন বল্‌ছিস, তাই হোক।" সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু" প্রয়োগ দেখালেন। গুরুপুত্রকে পড়িয়েছেন, কিন্তু গুরুপুত্র, গুরুপুত্রই। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাই।" ১৩৬৫ সালে ওঙ্কারেশ্বরে চাতুর্মাস্য হয়। তারপর কাশী প্রভৃতি স্থান ঘুরে বাংলায় এসে প্রচার চ'ল্‌তে থাকে।

রাত্রে সংবাদ এল, ঠাকুর রাণীগঞ্জে অসুস্থ। লক্ষ্মীমা তখনই যাবার জন্য তৈরী, কিন্তু সঙ্গী পেলেন না। ঠাকুরের কথা আলোচনা হ'চ্ছে। একজন বল্‌লেন—"সদানন্দদার দুঃখ হয়েছিল যে, পাতকুয়াটা নষ্ট ক'রে দিল, ঠাকুরকে আর আনা যাবে না। ভোগের জলের ব্যবস্থা নেই। তাই ঠাকুরটি নিজেই হাজির হ'য়েছেন।" ভোর না হ'তেই লক্ষ্মীদেবী যাত্রা ক'র্‌লেন।

বহু লোক আছে। ২।৩ জন ডাক্তারও আছেন। একজন এসে প্রণাম ক'র্‌ল। ঠাকুরটি ব'ল্‌লেন—"এটার অসুখ-টসুখ কিছু নয় সীতারাম। এরা সব কটা ভা বউয়েরা এরকম ক'রে কোনদিন পাইনি। আর রাণীগঞ্জের ছেলেরা ত' পায় না—তাই।"

এই লোকটি শুধু একবার ঠাকুরের মুখের দিকে আর একবার কাল রাত্রে আলাপকালে যিনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

শরীর অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন তাঁকে ধরে রাখা হ'ল। এরই

মধ্যে কত গল্প, কত হাসি, কত কি চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। বামুনপাড়ার অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামের ট্রাষ্টি ডিড্‌-ও রেজেষ্ট্রি হ'ল।

একদিন খেলার সখ হ'ল। খেল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন—মটর গাড়ী, পুতুল, ঝুমঝুমি নিয়ে। শেষে ছেলে-আদর আরম্ভ হ'ল পুতুল নিয়ে—"গোপাল গোপাল সোনার গোপাল, আমার মাণিকধন। আমার মাণিকের কাল রূপেতে আলো ত্রিভুবন।" অপূর্ব বলার ভঙ্গি। শেষে যা পান, তাই নিয়েই কোলে করে ঐ ছড়া বল্‌ছেন, আর আদর থামে না। 'খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু।'

দর্শনার্থীদের মধ্যে জানা গেল, একটি মহিলা এসেছেন, তিনি রাশিয়া গিয়েছিলেন। কৌতুহল হ'ল। মেয়েটিকে আস্তে আস্তে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শেষে রাশিয়ান্ সাহিত্যের কথা পাড়লেন, মেয়েটি রাশিয়ান গল্পের বই পড়ে শুনালেন।

একজন বল্‌লেন—"আমার কিছু হ'ল না।"

ইনি—"দীক্ষা হ'য়েছে?"

তিনি—"হাঁ।"

ইনি—"কার কাছে?"

তিনি—"শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কাছে।"

ইনি—"তবে ভাবনা নেই। বড় গাছে নৌকা বেঁধেছ বাবা! সাধন ভজন ক'র্‌তে হবে। দেখ, দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কৃতার্থ হয়।" ক্রিয়াবতী দীক্ষায়—দীক্ষাশেষে শিষ্য গুরুকে প্রণাম ক'র্‌লে গুরু তার হাত ধরে তুল্‌তে তুল্‌তে বলেন—"উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।" ওঠ বৎস! তুমি মুক্ত, আচারপরায়ণ হও। আর সীতারামের সিদ্ধযোগের দীক্ষা। তার কথা কি আর ব'লব।

চল্‌ছে প্রচার-পরিক্রমা। এবারে ভারতের রাজধানী দিল্লীর পালা।

উঠ্‌লেন বিড়লা-মন্দিরে সদলে। প্রথমে মৃদু মৃদু নাম। ক্রমে দিন দিন নামের জোর বাড়তে লাগ্‌ল। এলেন শ্রীযুগলকিশোর বিড়লাজী। দেখা হ'ল। প্রণতি জানিয়ে বল্‌লেন বিড়লাজী—"দেশে সনাতন ধর্ম লোপ হ'য়ে গেল। সব গেল ইত্যাদি।"

ইনি—"বাবা! কলি নূতন আসেননি, এর আগে আরও অনেকবার এসেছেন, কিন্তু সনাতন ধর্ম এখনও আছেন। যা কিছু হচ্ছে, তা তাঁর ইচ্ছায়। এই সব হবে, তাও শাস্ত্রমুখে ব'লেছেন। দেখ, এই যে বর্ণাশ্রম নষ্ট হচ্ছে, এতে ঠাকুর স্থির নেই; তিনি কি না এসে পারেন? তিনি এসেছেন। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি দেখবে কিনা জানি না।" একথা শুনে বিড়লাজী আশ্বস্ত হলেন। আনন্দে সকলে সেবার সুযোগ নিতে চেষ্টা ক'র্‌লেন।

ইচ্ছা হ'ল লীলাটি ভাল ক'রেই করা। হিন্দীতে ভাষণ দিলেন। ভাষণে ভাষার অশুদ্ধি যথেষ্ট, তথাপি শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। তারপর আবার ভাষণের কাল এল। ভাষণ আরম্ভ হ'ল অপূর্ব, অনুপম ভাষণ; যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি ভঙ্গী। হিন্দীতে এঁর অধিকার দেখে, এঁর অপূর্ব হিন্দী ভাষণ শুনে অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী প্রমুখ হিন্দীভাষী শিষ্যগণও অবাক্! ভাষণ-শেষে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌লেন—"যেমন দুঁ মারবে তেমনি দুধ বেরুবে। এমন একটা স্তর আছে, যেখানে সব ভাষার উৎপত্তি।"

গেছেন জলপাইগুড়ি। দেখ্‌তে গেলেন জেল। তাঁর উপস্থিতিতে সেখানে বৈকুণ্ঠ নেমে এল। বন্দীরা ভুলে গেল বন্ধনের বেদনা। আনন্দে নামকীর্ত্তন আরম্ভ ক'র্‌লে সকলে। জয় দেওয়া হ'ল—নাম বন্ধ হ'ল। সকলকে উপদেশ ক'র্‌লেন—"তোমরা কেউ ঘৃণ্য নও। খুঁজ্‌ছ আনন্দ, সেই আনন্দময় ভগবান্‌কে। তবে ওপথে নয়,

ফিরে এস। নাম কর, নাম কর। তোমাদের খোঁজা সার্থক হবে। সর্ব্বদা রাম রাম কর। মুসলমান যারা আছ—"আল্লা, হু" শ্বাসে শ্বাসে জপ কর।" এইভাবে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

এর আগে আর একবার জলপাইগুড়ি জেলে গিয়েছিলেন, জেলার শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী কয়েদীগণকে নাম আরম্ভ করিয়ে গেছেন। তিনি উপস্থিত আসানসোল জেলের জেলার। রাণীগঞ্জে থাকবার আগে জেলে গিয়ে আটজন কয়েদীকে দীক্ষা দেন। তার মধ্যে খুনী আসামীও ছিল। ঠাকুরটির ইচ্ছা হ'ল, যাবেন পদ্মলোচন[১] এর কার্সিয়াং-এর বাড়ীতে। গাড়ী ঠিক হ'ল। প্রথমে একটা জীপে কয়েকজনকে পাঠালেন কার্সিয়াং-এ। তারা গিয়ে সব ব্যবস্থা করবে, এই হ'ল উদ্দেশ্য। তিনি দু'টার সময় কার্সিয়াং উপস্থিত হ'লেন। খুব আনন্দ ক'রতে লাগ্‌লেন। ব'ললেন—এখানে স্বতঃই প্রাণ স্থির হ'য়ে আসছে। খুব ভাল জায়গা। বৈশাখে মৌন নিলে হয়।

প্রশ্ন এল—'এই বৈশাখেই ত' ?'

"সীতারাম তা ব'লেনি।"

ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হ'ল। সকলে প্রসাদ পেলেন। সন্ধ্যার সময় যাত্রা করলেন জলপাইগুড়ি উদ্দেশ্যে। রাত আটটা নাগাদ পৌঁছুলেন।

ডাক এল ধাঙ্গড়পাড়া থেকে—"বাবা, আমাদের ওখানে যাবে না?' ইনি পা বাড়িয়েই আছেন। চ'ল্‌লেন নাম নিয়ে। ধাঙ্গড়-পল্লী উৎসবে মেতে উঠ্‌লো। তারাও কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দিল। কি তাদের আকুলতা! কি প্রেম! একের পর এক সবাই প্রণাম ক'র্‌লেন।

১। শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় (বালি)

উপদেশ আরম্ভ হ'ল—একটা চেয়ারের উপরে উঠে। "তোমরা আছ বলেই জগৎ আছে। নইলে জগৎ মলমূত্রে পূর্ণ হ'য়ে যেত। তোমরা এক একটি ভগবানের বিগ্রহ। নিত্য নাম ক'রবে। (মন্ত্রের প্রার্থনা এল) সকাল সন্ধ্যায় "গুরু গুরু" জপ করবে—এই তোমার মন্ত্র। এর নাম কি গণ-দীক্ষা, (mass initiation) ?

মাত্র গুরুনাম জপে মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে যায়। সকল সম্প্রদায়ই গুরুর প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ। রামানন্দী শ্রী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ-যোগ্য। শাস্ত্র ব'লেন—

তুলসীসেবা হরিহরভক্তি র্গঙ্গাসাগরসঙ্গমমুক্তিঃ।
কিমপরমধিকং কৃষ্ণভক্তির্ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্॥

ফিরে এলেন আশুতোষের[1] বাড়ীতে। তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুরকে। তাঁর প্রার্থনা—"চা বাগানে যেতে হ'বে।"

ইনি ব'ল্লেন—"সময় নেই। ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে পরে হ'বে।" পরদিন বিমানে যাত্রা ক'রলেন। জলস্থল প্রচার হ'য়েছিল—এবার অন্তরীক্ষ হ'ল। এখন প্রচার সর্বত্রই চলছে। এর আগে জলপাইগুড়ি থেকেই গত বৎসর পৌষ মাসে বিমানে কলিকাতা আসেন।

এবারে প্রচারের শেষে দেখা গেল একটা নূতন জিনিষ। কয়েক জনকে তাঁর সিদ্ধযোগের মন্ত্রগ্রাম দিয়ে তপস্যার জন্য ব'ল্লেন। এবারে মৌন তাড়িঘাটে। এলেন বর্ধমানে—মহাসমারোহে থাকলেন একদিন।

রাত্রে যাত্রা ক'রলেন ৺কাশীধাম উদ্দেশ্যে। সঙ্গী অনেক। ট্রেণ চল্‌ছে। চ'লে এলেন গুরুপুত্রের কাছে। আলোচিত হ'ল অনেক তথ্য।

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (জলপাইগুড়ি)।

যথাকালে ৺কাশীধামে পৌঁছুলেন। বিশুদ্ধাশ্রম ঘুরে শ্রীকাশী-রামাশ্রমে যাওয়া হ'ল। স্নান ক'রে শ্রীবিশ্বনাথজীর দর্শনে গেলেন। প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম ক'রতে লাগ্‌ল সকলে। রাত্রে ঠিক হ'ল—আগামী কাল নতুন বাড়ীতে আশ্রম যাবে।

সকাল হ'ল। স্নানাদির পর লাগ্‌ল নতুন বাড়ীতে যাওয়ার তাড়া। তিনি নির্দেশ দিলেন—কৃষ্ণানন্দ নিশান নিয়ে যাবে আগে। তার পিছনে শঙ্কর ও রঘুনাথ গুরুদেবের ছবি নিয়ে যাবে। সঙ্গে অন্য একজন তুলসীগাছ নিয়ে যাবে। আর সকলে পিছু পিছু নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাবে। তাঁর কথামত ব্যবস্থা হ'ল। নতুন বাড়ীতে আশ্রম গেল। ভোগ নিয়ে তাড়িঘাট যাত্রা ক'র্‌লেন!

তাড়িঘাট তাঁর গুরুদেবের তিরোভাব-স্থান। এখানে মঠ হ'ল। নাম দিলেন মহাপ্রয়াণ মঠ। দু'দিন খুব আনন্দেই কাটল। শেষরাত্রে মৌন নেবেন। রাত্রে সকলের প্রসাদ নেওয়া হ'ল। এবার আরম্ভ হ'ল কথাবার্ত্তা।

সকলকে বহুকথা ব'ল্‌লেন। সকলেরই চোখে জল। নিলেন পঞ্জিকা, ব'ল্‌লেন—'অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সীতারামের যাবার দিন।' ফেলে দিলেন পঞ্জিকা, ব'ল্‌লেন চোখ বুজে, —'কিন্তু সীতারামের কাছে এখনও কোন খবর আসেনি।' ৪ঠা ফাল্গুন পর্য্যন্ত সকলে অনুমতি পেলেন ওখানে থাকার। ঐ দিন তাঁর জন্ম-দিন। তাই প্রার্থনা করা হ'ল দর্শনাদির। তিনি অনুমোদন করলেন।

কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে পরিবর্তন হতে লাগল মুখে। শেষে উঠে এক'পা এক পা করে পেছুতে লাগ্‌লেন তাঁর কুটিরের দিকে। সকলে

কেঁদে উঠলেন। কেউ বা তাঁর গতি বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন—'স্বামী দিয়ে, অর্থ দিয়ে, পুত্র দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ, তা' হ'বে না। আমি তোমায় ছাড়বো না। কেউ বা উন্মাদের মত শুধু হাসতেই লাগ্‌ল। নির্বাক, নিস্তব্ধ। তিনি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ ক'র্‌লেন।

সকলে অপেক্ষা ক'রতে লাগল ৪ঠা ফাল্গুনের জন্মদিনের। এল জন্মদিন। উৎসবের ধুম লেগে গেল। বাইরে সামিয়ানা টাঙ্গান হ'ল। ৺কাশী থেকে ফুলের মালা ও ফল প্রভৃতি এল। সারা আশ্রম সাজান হ'ল।

তাঁকে ফুলের মালায়, ফুলের মুকুটে, সাজান হ'ল। বাহিরে এসে চেয়ারে ব'সলেন। সকলে মালা দিয়ে প্রণাম ক'রে কৃতার্থ হ'ল। প্রণাম নিয়ে ভিতরে গেলেন। গুরুপুত্র জন্মতিথি হোম ক'র্‌লেন। গুরুকন্যা ও লক্ষ্মী মা ভোগ রেঁধে সেবা দিলেন। সকলে প্রসাদ পেল।

সেদিন বিকালের গাড়ীতেই প্রায় সবাই যাত্রা ক'র্‌লেন। যাত্রা কালে তিনি দর্শন দিয়ে কৃতার্থ ক'র্‌লেন সকলকে।

এর মধ্যে খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ। তাঁকে কোন রকমে নিয়ে আসা হ'ল.........। হুগলীর ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার ডাঃ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বর্দ্ধমানের ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখে ব'ল্‌লেন—যা হ'য়েছিল, ফেরবার কথা নয়। তবে ঠাকুরের দীনবন্ধু, ঠাকুরই জানেন কিভাবে ফিরিয়েছেন। এখন আর ভয় নাই।

মৌন চল্‌ছে। ২৩ জ্যৈষ্ঠ এসে গেল প্রায়। সকলই উদ্‌বিগ্ন। ২১ জ্যৈষ্ঠ জানিয়ে দিলেন লিখে—'সীতারামের দেহ এখন যাবে না। এখনও অনেক কাজ বাকী।' সকলেই আনন্দিত হ'ল। এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

চলছে কঠোর মৌন। হঠাৎ সংবাদ এল, বাবা দ্বারকায় চলে গেছেন। কি ব্যাপার?

তাড়িঘাট মহাপ্রয়াণ মঠ, ২৪।৩।৬৭। মৌনের মধ্যে হঠাৎ সচ্চিদানন্দ তাঁর একটি পত্র পেল :—

"ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ

বাবা সচ্চিদানন্দ, একবার দেখা কর।

তোর সীতারাম"

সচ্চিৎ উপস্থিত হ'য়ে প্রণাম ক'রতেই তিনি লিখলেন—দ্বারকায় যেতে প্রস্তুত আছিস?"

"হাঁ বাবা আপনার কৃপায় সর্ব্বদা প্রস্তুত।"

"এখানকার কি ব্যবস্থা ক'রৃরি। অবশিষ্ট কাজ কে ক'রবে?"

"ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ৭।৮ জন আছি; যাকে থাকৃতে বলবেন, সে থাকবে, অবশিষ্ট কাজও ক'রৃবে।

"কে কে আছে?"

"ধ্যানদা, প্রণবদা, সেবানন্দ, হরিসাধন, ওমানন্দ, কার্ত্তিক, অজিত ও সত্যদা। কে কে আপনার সঙ্গে যাবে?"

"ধ্যান, প্রণব, সেবা, হরিসাধন।"

"মৌনভঙ্গ করবেন ত'?"

"মৌন নিয়েই যাব, মৌন-চাতুর্ম্মাস্য। প্রচার সূক্ষ্মে বেশী হয়, বুঝিস? হেমেন ও কার্ত্তিককে সত্যের কাছে রেখে চল্। গৌরী মা কোথায়? সত্য এখানে থাকবে, অন্য লোক এখানে এলে ওরা পরে (দ্বারকা) যাবে।"

"গৌরীমা বৃন্দাবনে।"

গুরু-শিষ্যে আলাপ চল্‌ল। গুরু কাগজে লিখে জানালেন, শিষ্য

উত্তর দিলেন মুখেমুখে। এ ব্যবস্থা নতুন। তাঁর মৌন কাষ্ঠ-মৌন এবং নিঃসঙ্গ কিন্তু এবার মৌন নিয়ে দ্বারকায় যাবেন বলেই এই নিয়মের ক্ষণিক ব্যতিক্রম।

"বাবা, চাতুর্ম্মাস্যের পর মৌন ত্যাগ ক'রবেন?"

"হাঁ, এবার পৌষমাসে গঙ্গাসাগরে যেয়ে নিত্যতীর্থ প্রচার ক'র্‌বো, সেখানে আশ্রম হ'বে, মৌনও হ'বে। চেষ্টা চল্‌ছে।"

"দ্বারকা কবে যাওয়া হবে?"

"পরশু।"

"কখন? কোন গাড়ীতে যাওয়া হ'বে?"

"পরশু এখান থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে মেহেসানা, সেখান থেকে ওখা। কাশীর নাম? কাশীর নাম? (অর্থাৎ কেমন চলছে)। ছেলেরা আসেনা? শঙ্কর রঘুনাথ বিমল? (অর্থাৎ কেমন)।"

"কাশীর নাম কোনপ্রকারে চল্‌ছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাব। কৃষ্ণনন্দদা'র শরীরের অবস্থা ভাল নয়, এখন তার বিশ্রামের সময়।"

"এখানে পূজোর ব্যবস্থা হয় না? তাহ'লে ওমানন্দকে—(অর্থাৎ কাশীতে রাখি)।"

"বই কিছু নেবো, এক বাক্‌সো।"

কুমার মানসিংহ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে এসেছেন। তিনি বাবাকে বল্‌লেন—"হোসাঙ্গাবাদের ভায়েরা প্রস্তুত আছেন, তাঁরা আমাকে দিয়ে আপনাকে নিবেদন ক'রেছেন—সেখানে এবৎসর চাতুর্ম্মাস্য ক'রতে হ'বে।"

"পরশু দ্বারকা যাচ্ছি, সেখানে মৌন-চাতুর্ম্মাস্য দ্বারকা থেকে নামবার সময় ১৫ দিন কি একমাস (থাকবো)। (তোরা) কানপুরে,

দিল্লীতে ও গাড়ী ঠিক হ'লে পাণ্ডাবাবাকে (ভেট-দ্বারকা) ওখা আসতে টেলিঃ (টেলিগ্রাম কর)।"

মানসিংহের কণ্ঠে উদ্বেগ, মুখে প্রশ্ন—"সেখানে কোথায় থাকা হ'বে ঠিক নাই।"

সচ্চিৎ তাঁকে অভয় দিল। "বাবার আবার থাকার অভাব। সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে।"

তাড়িঘাট থেকে তাঁর দ্বারকাযাত্রার সংবাদে ঐ গ্রামের সকলেই খুব দুঃখিত। তারা একটি পত্র লিখে জানান—"ভগবন্! আপনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন, আপনাকে ধরে রাখবার সামর্থ্য নাই। শ্রীচরণে নিবেদন, সচ্চিদানন্দজী, ধ্যানানন্দজী ও সেবানন্দজী এই তিনজনের একজনকে আমাদের এখানে যদি রেখে যান, তাহ'লে আমরা নিত্য গ্রামে সংকীর্ত্তন নিয়ে যেতে পারবো।"

বাবা লিখলেন—"কখন জীবনে কাউকে আদেশ করিনি। তোমরা পাকড়াও।" তারপর একজনকে দেখিয়ে লিখলেন—"এর নাম জগন্নাথ ?"

"হাঁ বাবা। এ প্রায়ই দিনরাত এখানে থাকে।" তারপর পর পর আরও দু'জনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সচ্চিদানন্দ জানালেন —"এর নাম কেশো। বাবার সেবক। গ্রামেই দোকান আছে। আর ইনি এখানের পোষ্টমাষ্টার।"

পরে লিখলেন—"সেবা ধ্যান সচ্চিৎ হাম্‌কো নেহি ছোড়তা।" এখন তাঁরা বলেন—"হাম্ লোকভি আপকো সাথ যায়েঙ্গে।"

"চল—।"

পরে লিখলেন—"স্ত্রী-পুত্র আছে ত ?"

"হাঁ, সকলেরই আছে।"

ইঙ্গিতে জানালেন—"তারা খাবে কি ?"—এইপ্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

ধ্যান—"বাবা, আজ কুকার দেবো না ?"

"আজ তো পূর্ণিমা।"

"হোক পূর্ণিমা, আজ ঠাকুরের খাবার করে দেবো।"

তিনি কোন রকমে সম্মতি দিলেন। ওমানন্দ ও ধ্যানানন্দ অত্যন্ত আনন্দের সহিত ভোগ প্রস্তুতের জন্য গেলেন। এবার কাশীর ছেলেটিকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখলেন—"কৃষ্ণানন্দ কেমন আছে ? নাম কেমন ? (চল্‌ছে)। মাণিককে বলবি পরশু দ্বারকা যাচ্ছি, পারে ত' মোগলসরাই-এ আসতে বলবি।" হঠাৎ হরিসাধনের দিকে তাকিয়ে লিখলেন—"সীতারামের ইচ্ছা, তুই কাশী থেকে সত্বর বেদ পড়ে শেষ করে নিস। সুরের সহিত পড়তে হ'বে, বেদ ও যজ্ঞ প্রচারের কথা ভাস্‌ছে। বেদপ্রচারের কথা কলকাতার ঠাকুর বলেছিলেন। সেইজন্য কাজকর্ম্মে বেদপাঠ করান হচ্ছে। তুই আজই একবার কাশী যা, বেদের ভাল টোল প্রভৃতি দেখে আয় ও কৃষ্ণানন্দের সঙ্গে কথা ব'লে ঠিক করে আয়। কাশীতে বেদ নিয়েই যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে পড়া ভাল।"

"যা আদেশ করবেন তাই করব, আজই কাশী যাব।"

"তোর ব্যাকরণ শেষ হয়নি ? বাংলায় চলে যা, ব্যাকরণ এ বছর শেষ কর। আগে ব্যাকরণ, পরে বেদ।"

"আচ্ছা, তাই যাবো।"

দ্বারকা যাওয়া হ'ল না বলে হরিসাধনের মন খারাপ হ'বে, তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে লিখলেন—"পূজোর পর দ্বারকা আসবি।"

"মহাভারতামৃতম্' বলে যেগুলি লিখতে দিয়েছেন, দু'টি খাতায় তার অর্দ্ধেক হ'য়েছে ; সেগুলি আপনাকে ফেরৎ দেবো ?" "তুই সঙ্গে নিয়ে যা। লেখা শেষ হ'লে পূজোর পর (যখন দ্বারকায় আসবি)

নিয়ে আসিস্। গোপালকে ব'লবি, 'মহাভারতামৃতম্' মুল যেন 'প্রণব পারিজাতে' বের করে এবং তার বাংলা অনুবাদ ক'রে যেন 'দেবযানে' দেয়। সীতারামের দাগদেওয়াগুলি যেমন, যেখানে যেখানে সত্য-মহিমা বা ঐরূপ তপোমহিমা আছে, সব এক করে বার করতে বলবি। কাল (সীতারাম) ১৬ খণ্ড মহাভারত (পড়ে) শেষ কর'ল। সীতরাম যেদিন যাবে, তুইও ঐদিন বাংলা যাবি। 'কচু-ঘেঁচু-কাঁচকলা' প্রবন্ধ প্রেসে দিবি। সুশীলের কাছে 'ক্ষেপার ঝুলি—বিশ্বজননী রমণী ও ভারতনারী' আছে, এই দু'টো দিতে বলবি। দিগসুই যাবি, সেজদি ও বৌদিকে প্রণাম দিবি। শঙ্করের পত্র তোর হাতেই দেব। তুই সেজদি'র পায়ে ধরে সীতারামের জবানিতে ক্ষমা চা'বি। তার এখানে থাকবার ইচ্ছা ছিল। সীতারামের তপস্থায় বিঘ্ন হ'বে বলে, তাঁকে চলে যেতে হয়। কুটাই মেজদিদি থাকলে ত' ক্ষতি ছিল না, ওদের আশ্রয় ক'রে অন্যান্য মায়েরা সুযোগ নিত। ডুমুরদহ যাবি, সকলকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ দিবি। বিমল কেমন আছে? তাকে পত্র দিতে ব'লবি। দেবযানের কথা বিমলকে ব'লবি (সে যেন একটু লক্ষ্য রাখে)। রুদ্রযজ্ঞ করবার ইচ্ছা জেগেছে, হরিনারায়ণের কাছে যজ্ঞের সমস্ত কথা জেনে লিখবি। 'মন্নাথ' ও 'মিলনগাথা'র শুদ্ধিপত্র ক'রলাম, কোথায় হারিয়ে গেল। দেখি খুঁজে পাই ত' তোর হাতে পাঠাব। ২৭।২৮ বছর আগেকার লেখা। খেয়ালে বসে লিখে গেছি, তা প্রকাশ করা উচিত নয়।···নিজের মুখে নিজেকে বলা উচিত নয়, এই শাস্ত্র-আজ্ঞা। 'প্রপন্ন-পথিক' ২য় খণ্ড ১২২।২৩।২৪ পৃষ্ঠার 'আমি জীবন্মুক্ত পরমহংস' কথাগুলি কেটে দিবি। নিজে নিজেকে বলা আত্মহত্যা করা হয়।" কিছু পরের প্রসঙ্গ। ইনি "জায়গা যে দিয়েছে, সে আছে?"

—"আছে—।"

"ওকে বল তোমার আমগাছ মাটীর রস খাচ্ছে, তোমার দত্তাপহরণ (পাপ) হ'চ্ছে।"

সচ্চিৎ বুড়ী মায়িটিকে বললে, তিনি উত্তর দেন—"ছোট ছোট নাতিরা আছে, তারা কি পরের আমগাছের তলায় ঘুরে বেড়াবে ?"

সচ্চিৎ উত্তর দিল—"তাহ'লে বল সব সীতারামের। জায়গা সীতারামের, গাছও সীতারামের, নাতিরাও সীতারামের। তাহ'লে দত্তাপহরণ পাপ হবে না তোমার।"

ইনি—"দিল্লী থেকে গাড়ী কি মথুরা দিয়ে মেহেসনা যাবে ?"

—"না—"

'জয়গুরু' রথযাত্রা সংখ্যা বেরিয়েছে ?"

—"না। এখনও আসেনি।"

"তুই অনধ্যায় বাদ দিয়ে বেদগান নিত্য করবি, যেমন পারবি। চিদানন্দ ! তুই তিনমাস তপস্যা কর'তে পারবি ?"

—"পারবো, যা আদেশ করেন।"

ইনি—"প্রথম মাস হবিষ্য, ২য় মাস আনাজসিদ্ধ, ৩য় মাস দুধ বা ফল দুধ ছানা।"

—"কি কি আনাজ সেদ্ধ চলবে ?"

—"ওল, পটল, মান, মিষ্টিআলু, কাঁচাকলা, মটর দাল, মুগের দাল সিদ্ধ, এই তপস্যার পর তোকে সীতারামের মন্ত্র-গ্রাম দান করা হ'বে। হয় কি, দেহদোষ না গেলে মানুষ স্থির হ'তে পারে না। আহার-শুদ্ধি ব্যতীত দেহ-দোষ যায় না। দেহদোষ হ'ল পাপ।...... পাপক্ষয় হলেই জ্ঞানলাভ (হয়)। জ্ঞানলাভের চিহ্ন হ'ল—চোখ বুজলে জ্যোতি, তাকালে জ্যোতি।"

তারিঘাটে জনৈক ভক্ত—"বাবা আমাকে একটা ভাল কাজ (চাকুরি) দিন।"

"ভাল কাজ? আচ্ছা নিত্য ১০০৮ রাম নাম জপ করবে। পারতো লক্ষ 'রাম' নাম জপ ক'রো।" তিনিও হাসেন, আমরাও হাসি।

ইনি—"চীন কি ভারত আক্রমণ করেছে?"

জনৈক সেবক—"হাঁ বাবা। হিমালয়ের বিরাট স্থান চীন অধিকার করে আছে।"

কিছুক্ষণ চোখবুজে কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর লিখলেন—"ঠাকুর যা করবেন, তাই হ'বে। তিনি মঙ্গলময়।"

যা করেছেন তা মঙ্গল।

যা কর্‌ছেন তা মঙ্গল।

যা করবেন তা মঙ্গল।

এবার চাতুর্মাস্তে ১০০০ প্রণামের কথা লিখ্‌ছি। ১০বারে বা ৫ বারে করা চল্‌বে। হরিসাধনকে লিখ্‌লেন, "তুই ঘড়ি খুলে হাজার প্রণাম কর (কত সময় লাগে দেখ)। প্রণাম হ'ল আত্মযজ্ঞ।"

সহস্রমযুতং লক্ষং কোটিং বা কারয়েদ্ বুধঃ।
নমস্কারাত্মযজ্ঞেন তুষ্ট স্যুঃ সর্ব্বদেবতা॥

নমস্কার ক'রবে। নমস্কাররূপ আত্মযজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বদেবতা তুষ্ট হন। 'নমে'র অর্থ—ন-মম, এ দেহ আমার নয় তোমার, আত্মসমর্পণ। নিত্য অন্ততঃ সহস্র প্রণাম ক'রলে অল্পদিনের মধ্যেই দ্বার খুলে যাবে। কাল তুই হাজার প্রণাম ক'রে দেখ্‌তো…।"

'মাদারে', নরেশ ও বসন্তবাবা কলকাতার ঠাকুরের কথা লিখেছে। বসন্তবাবা লিখেছেন যেন মনে হ'ল, তিনি (কলকাতার ঠাকুর) সীতারামকে 'ভগবান্' বলতেন। মৌন চলছিল, এবার দেখা হ'লে

জিজ্ঞাসা ক'রবো, আপনি লক্ষণের দ্বারা নিশ্চয়রূপে স্থির ক'রেছেন—সীতারাম ভগবান্।

কি (তাঁর) ভালবাসা! ছেলেরা গেলেও কেঁদে আকুল হ'তেন। বলতেন—"আমরা ভগবান্‌কে নিয়ে নকড়া ছকড়া ক'রছি। তাঁরই ইচ্ছায় এবার গঙ্গাসাগরের নিত্যতীর্থ প্রচার ক'রবো।"

জনৈক সেবকের দিকে তাকিয়ে ইসারা ক'রলেন—"তুই নেশা (বিড়ি) করিস্?"

"হাঁ বাবা, আপনি কৃপা করুন, যাতে আমার ঐ নেশা চলে যায়। আজ কত বৎসর ধরে চেষ্টা ক'রছি, ছাড়তে পারছি না।"

"আর বিড়ি খাবি না। ইচ্ছা জাগলে উপবাস ক'রবি।"

—"আপনি কৃপা ক'রলেই চলে যাবে, আমার চেষ্টায় হ'বে না। আমার যেন বিড়ি খাবার ইচ্ছা না হয়।"

—"সীতারাম একথা বহু বৎসর ধরে বারবার ব'লেছে—যারা নেশা করে, তারা ভগবান্‌কে লাভ ক'রতে পারে না। সীতারামের আদেশ, তুই আর খাবি না। যখনই মন ফুসফুস ক'রবে তখনি ১০৮টা প্রণাম ক'রবি। ব্যাপার হ'ল, রক্ত গরম হয়, উত্তেজনা আসে। অবশভাবে বীর্য্যক্ষয় হয়। সীতারাম এইজন্য বারবার সকলকে নেশা ছাড়ার কথা বলে আসছে।"

চিদানন্দকে দেখে লিখলেন—"গোপীবাবা ভাল আছেন?"

—"ভাল।"

—"তিনি (গোপীবাবা) ব'লেছিলেন, আপনার মৌনান্তে তারিঘাট যাবো। যথেষ্ট ভালবাসেন।"

"উনি পুণায় মা'র (শ্রীশ্রীআনন্দময়ী) কাছে গেছলেন, ৩।৪ দিন মাত্র ফিরেছেন।"

—"গুরুদেবের কি কৃপা! সর্ব্বদা ওঁ গুরু ওঁ গুরু চলছে।" অল্প কিছু সময় চোখ বুজে রইলেন। পরে লিখলেন—"সকালে গাজীপুর বা জামুনিয়া দিয়ে কাশী যাবার গাড়ী কখন?"

সচ্চিৎ—"সকালে গাজীপুর থেকে বাস আছে।"

—"তুই কাল যেতে পারিস্ গোপীবাবার কাছে। প্রণাম করে প্রার্থনা করবি, আসার জন্য।"

—"যাব।"

চিদানন্দ—"এখন ত' তিনি আসতে পারবেন না, আশ্রমে উৎসব।" —"(পরমহংসবাবার) জন্মোৎসব?"

চিদানন্দ—"না, অন্য উৎসব।"

—"আসুন, না আসুন, তিনি যে কথা বলেছেন, তা রক্ষা করা হয়। গিয়ে প্রণাম দিয়ে বলিস।"

তাঁর লিখিত একটি খাতা সাধনকে দিয়ে পড়ার ইসারা ক'রলেন। সে ৪টি শ্লোক পড়ল।

তিনি লিখলেন—"৪ জায়গায় প্রমাণ পেলাম—যে মাত্র দিনে একবার ও রাত্রে একবার খায়, সে উপবাসের ফললাভ করে। এই উপবাস দ্বারা জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হয়। এ হ'ল গৌণফল, মুখ্যফল আনন্দলাভ। সীতারাম জলখাবার (কলাদি) ছেড়েছে। ফাঁকি দিয়ে উপবাসের ফল হবে, (সেজন্য) সরবৎ নিই। সবটাই ভোজনের উপর নির্ভর করে। মানুষের দেহরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, মানুষ তার চার-পাঁচ গুণ খায়। আহারসংযমে মনোবহা নাড়ী কুচিন্তা ক'রতে পারে না।"

মহাভারতের আরও কয়েকটি শ্লোক পড়তে ইঙ্গিত ক'রলেন। পড়া হ'ল। কোন্ মাসে কিভাবে খেলে উপবাসের ফল হয়,

মহাভারতে তার সম্বন্ধে লেখা আছে। সাধনকে লিখলেন—"তুই ১২খণ্ড মহাভারত নিয়ে যা। তুই নিত্য আধঘণ্টা ক'রে মহাভারত লিখবি, তোর পড়া হয়ে যাবে।......গোপালের সংস্কৃতে বেশ অধিকার আছে। 'বিষ্ণুপুরাণ সটীক' সীতারামের শ্রীজীবদাদার কাছে আছে (তোর দাদা নিয়ে আসবে)।"

আর একটি মোটা খাতা তার হাতে দিয়ে পড়ার ইঙ্গিত ক'রলেন। অত্যদ্ভুত সে মহাগ্রন্থটি। দার্শনিক তত্ত্বের সহজ সরল বর্ণনা। গ্রন্থরত্নটির কিছু অংশ পাঠ করা হ'ল। তিনি মধ্যে মধ্যে লিখে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমেই লিখলেন—"যারা অগ্রসর, তারা ছাড়া বুঝবে না।" "দ্বারপালোপাসনা—প্রথম দ্বারপাল প্রাণ। প্রাণায় নমঃ। হে প্রাণ, তুমি চক্ষু, তোমায় প্রণাম। তুমি সূর্য্য, তোমায় প্রণাম।...সাধন লিখে বোঝানো শক্ত। এইজন্য বলে সাধন গুরুমুখী।...যা লেখা হয়েছে তা করা হয়েছে।..."

গ্রন্থের অন্য অংশ..."গায়ত্রী পৃথিবী, গায়ত্রী শরীর, গায়ত্রী হৃদয়, গায়ত্রী প্রাণ।" (কিছু পড়া হতেই তিনি লিখলেন) এই পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।...এই ব্যেপে নাদরূপিণী গায়ত্রী অবস্থিতা। ..."(আবার কিছুটা পড়ার পর)...গায়ত্রী শরীর বলা হ'য়েছে, শরীরের বিবরণ বলা হ'ল।...গায়ত্রী হৃদয়। এখন হৃদয়ের বিবরণ দেওয়া হ'চ্ছে...সাধারণ বলা হ'ল হৃদয়ে ধ্যানের কথা, ধ্যানের স্থান হৃদয়। গায়ত্রী আকাশ। আকাশের বিবরণ। হৃদয়ে ধ্যান রাখতে রাখতে ভর্ত্তি হয়ে গেলে আপনা-আপনি ওপরে মন উঠে। (বৃহদারণ্যক)...।"

আজ সেহারা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পাঁচুগোপাল হাজরার পত্র আসে। তিনি পত্রের প্রথমে 'দ্বারকালীলা' বর্ণনা লিখেছেন। সচ্চিদানন্দ ব'ললেন "মাষ্টারদা লিখেছেন, এবার প্রভুর লীলা দ্বারকায়।"

তিনি—"যারা অনন্যভাবে চিন্তা করে, তাদের প্রাণে প্রাণে মিল হয়।"

আশ্রমবাসী প্রায় সকলে ব'ল্লে—"বাবা, সেবাদা কানপুরে গেছলেন। খুব নামপ্রচার হয়েছে, শত শত লোকে খুব আনন্দ পেয়েছে। সুশীলদাও লিখেছেন, সেবানন্দজী আসায় খুব নামপ্রচার হয়েছে, বেশ ভিড় হয়েছিল।"

তিনি—"সেবার উপর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে।"

সেবা—"বাবা বিঠুর (কানপুর) আশ্রমে আপনি মৌন নেবেন বলেছিলেন। তারা আপনার ঘর ও গুহা তৈরী করবে বলে ঠিক ক'রেছে। আমি তাদের এই প্ল্যান বলেছি—" বলে এঁকে বাবাকে বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি—"সীতারামের কুটীরে হ'বে ছিটেবেড়া ৫ × ৩ হাত, গুহাও হ'বে। তবে ঠাকুরঘর বা মন্দির যত ভাল হয় ক'রবে। কিন্তু সীতারামের কুটীর হবে ছিটেবেড়া পাঁচ হাত তিন হাত।"

জ্যৈষ্ঠের 'দেবযান' হাতে দিয়ে জামাইবাবুর (খন্যানের শ্রীবিষ্ণু) লেখা 'সন্ধি' প্রবন্ধ পড়বার জন্য ইঙ্গিত ক'রলেন। অতি সুন্দর লেখা। আমাদের চেয়ে বাবা যেন বেশী আনন্দিত হ'য়েছেন, মনে হ'ল। এই প্রবন্ধ নরনারীনির্ব্বিশেষে সকলের মনের কথা। এইভাবে মনের কথা খুলে বললেও মনের সকল ভাব সকলের সামনে ধরে দিলে, সকলেই মনের স্বাভাবিক গুণগুলি হ'তে পরিত্রাণ পাবার আশা ক'রতে পারেন। ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনকে কেমন ক'রে বশে আনতে হয়, তার সঙ্গে কিভাবে সন্ধি ক'রতে হয়, এই প্রবন্ধপাঠে অনায়াসে তার পথ পাওয়া যায়।

তিনি—"বিষ্ণু অনেকদিন ধরে সীতারামের বইগুলি নিয়ে স্থানে

স্থানে পড়ে শোনাতো আর কাঁদতো। তার ওপর ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে। মনের সঙ্গে বা ভগবানের সঙ্গে এইভাবে কথা কওয়া (খুব ভাল)। লেখা কথাটি থেকে যায়; যখন মন চঞ্চল হয়, তখন তা পড়লে মন শান্ত হয়। সকলের নিত্যসাধনের অঙ্গ হোক কিছু লেখা। ভগবানের সঙ্গে কথা-কওয়া ইত্যাদি।"

কলকাতা আশ্রম সম্পর্কে ডাঃ উমেশ চক্রবর্ত্তীর পত্র সচ্চিদানন্দ পড়ে শোনালেন। ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভূপেশচন্দ্র পাল, শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত জেনে বাবা আনন্দিত হ'লেন।

সত্যধর্ম্ম প্রচার সংঘের প্রসঙ্গে বাবা ডাঃ রাসগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লেখেন—"কাজ করে। ভক্তি যথেষ্ট। গুরুনাম বল্‌তে, বই পড়তে কেঁদে আকুল। মায়ী রাসকে বলে—'অত কাঁদ কেন?'

তারপর মায়ী লিখ্‌লে—'বাবা আমার সব শুকিয়ে যাচ্ছে।' সীতারাম লেখে, 'তুই রাসকে বলিস্ বলে।'

সচ্চিৎকে নির্দ্দেশ দেন—"রাসকে লেখ, কাজ ধীরে ধীরে হোক্। দেরি হোক ক্ষতি নাই, কাজ আরম্ভ করে টাকার জন্য যেন আকুল হ'তে না হয়।"

সচ্চিৎ—"টাকার জন্য আমাদের আটকাবে না।"

—"তা' হোক, ব্যাঙ্কে দশ বিশ জমিয়ে কাজ করুক। নইলে··· ভিক্ষা যেন না করে।" (এই কথাগুলি শ্রীধাম কেওটার মন্দির সম্বন্ধে)।

বিকেলে কাশী থেকে সস্ত্রীক মাণিক আসেন। তাঁদের দেখে লেখেন "সীতারামের ইচ্ছা ছিল, তোরা আসিস্। সীতারাম কাল দ্বারকা যাচ্ছে।"

বিকেলে আশ্রমের বাইরে এলেন, ইসারা ক'রলেন—'সঙ্গে আয়।'

আশ্রমের সদর দরজার সিঁড়িতে এসে লিখলেন—"মৌনে এই প্রথম বাইরে এলাম।" তারপর সোজা গঙ্গার দিকে চ'ল্‌লেন। গঙ্গায় ঘাটে নেমে প্রণাম ক'রে মা-গঙ্গার পূতবারি নিজ মস্তকে সিঞ্চন ক'রলেন। অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানালেন—"গ্রামের ভেতর যাব।" এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৫০।৬০ জন লোক তাঁকে ঘিরে চ'ল্‌তে লাগল। বাংলার মত এদেশের লোকরাও তাঁর পিছু ছাড়ে না। গ্রামের লোকেরও আনন্দের সীমা নেই। তাঁরা নিত্য গ্রামে নামপ্রচার করেন, নামের ভিখারী কি আর গ্রামে না গিয়ে থাক্‌তে পারেন! ভীষণ বৃষ্টিতে গ্রামের রাস্তা পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত। কিন্তু প্রেমের দায়ে তাঁকে যেতেই হ'ল। এই প্রথম তাঁর তারিঘাট গ্রামে শুভাগমন। তারিঘাটের সমস্ত নরনারী তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। শত শত লোক সঙ্গে ঘুরতে লাগ্‌লেন। কিছু পরে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। জানালেন,…সীতারাম তো উড়লো, কবে আবার এখানে এসে জুট্‌বে ঠিক নেই।"

মাণিকবাবুকে লিখলেন—"কি দেখে গেছলি? কেমন হ'য়েছে?"

—"অতি সুন্দর হ'য়েছে।"

"এমন কোন আশ্রম তৈরী করা হয়নি। নচেৎ রামানন্দ মঠ, রামাশ্রম, ওঙ্কারমঠ (অতুলনীয়)।

মাণিক—ডুমুরদহ থেকে পুরঞ্জয়দা এসেছিলেন। কিঞ্চিদধিক দু'মাস ছিলেন। স্বতন্ত্র (নির্জ্জন) স্থানে ছিলেন। এবারে অতি সুন্দর কৃষ্ণলীলা লিখেছেন।

—"তাকে কৃষ্ণলীলা লিখতে বলেছি ৭।৮ বছর আগে।"

তাঁর কুটিরে চুরির প্রসঙ্গে লিখলেন—"রাত্রি একটার পর ধ্যান ক'রে শুই। রাত্রি ২॥টার সময় খস্ খস্ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবলুম ইঁদুর ঢুকতে আরম্ভ ক'রলো। (এবার) ব্যাঘাত ক'রবে।

তারপর দেখি ঠাকুরগুলি মাটিতে নামান। (বাক্সের ওপর ঠাকুর সাজান ছিল), ঐ বাক্সটি নেবার মতলবে ঠাকুর নামায়। সীতারাম জেগে উঠেছে মনে ক'রে পালায়। খারাপকে ভাল করার জন্য ঠাকুর এনেছেন।"

সকাল থেকে তারিঘাটের লোকেরা আশ্রমে ভিড় ক'রে বসে আছে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তারা ভিজেভিজেই আশ্রমে যাতায়াত ক'রছে। সকলের মুখ শুকিয়ে গেছে, বিষণ্ণমুখে ভাষা নাই। তারা জান্‌তো না, ভাবতেও পারে নাই, এত বড় আশ্রম তৈরী হ'তে না হ'তেই গুরুজী চ'লে যাবেন। তারা তো এঁর এ লীলা কখনও দেখেনি।

অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে। এ যেন প্রকৃতির অশ্রু। ভিজেভিজেই শতশত লোক তাঁকে ষ্টেশনে তুলে দিতে এল। দূর থেকে ষ্টেশন-মাষ্টার ও সহঃ ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশাবতংস গোস্বামীজী তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে চ'ল্‌লেন। সকলেই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। কারও চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগ্‌লো। গোস্বামীজী তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন। তিনি তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন। ১০টায় গাড়ী ছাড়বার সময় অনেকে অস্থির হয়ে পড়লেন। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল, শত শত দর্শক নিশ্চলভাবে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায়, একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চেয়ে রইল।

ধ্যাম জিজ্ঞাসা ক'রল—"বাবা, দ্বারকায় কুকার দেবো না।"

—"সীতারামের যখন প্রয়োজন নাই, এমন সময় ভোগ হ'য়ে গেল। ছেলেরা খেতে পেলে না—ভোগ জুড়িয়ে পিঁপড়ে ধরতে লাগলো, সেইজন্যই কুকার চাই। শরীর সব সময় সাব্যস্ত থাকে না। যখন মা ঠেলে ওপরে ওঠেন, তখন কিছু করবার শক্তি থাকে না।

যথাসময়ে ভোগ হ'লে খেতে বাধ্য হ'তে হবে। এমন হয়, বাইরে এসে জ্যোতি দাঁড়ালেন। ও (ধ্যানানন্দ) দাঁড়িয়েছিল—দেখলে সীতারাম অচল হ'য়ে গেল। চোখ বুজলে, চোখ তাকালে একই জ্যোতি থাকে।"

সাধন—"কি রকম জ্যোতি, বাবা?"

"—গোল--সাদা—তাতে চারিদিকে হল্‌দে বা সবুজে বেষ্টনী অপূর্ব্ব রমণীয় জ্যোতি।"

চিদানন্দ—"বাবা, নাদের ধ্যান করা সব চেয়ে কখন ভাল?"

—"রাত্রি ১০টা থেকে ১১টা। সাধনের উপযুক্ত সময় ভোর মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও মধ্যরাত্রি। ভোর ৪টার সময় খুবই ভাল। ভোরবেলাই প্রশস্ত সময়। রাত্রে ৮৷৷। ৯টার মধ্যে কিছু নেওয়া (ভাল)। ভোরে ওঠা সহজ হয়। রাত্রের আহার অতি অল্প। দিনে একবার, রাত্রে একবার খাওয়ার কথা শাস্ত্রে বারবার বলেছেন। তাতে উপবাসের ফল হয়।"

জনৈক সেবক—"সকালে জলখাওয়া কিছু হ'বে না?"

"—জলখাওয়া সরবৎ।"

সেবক—"সকালের জপ কতক্ষণ পর্য্যন্ত চল্‌তে পারে?"

—ভোর ৪টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের আধঘণ্টা আগে থেকে দু'ঘণ্টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যার ক্ষণ।

অন্য একজন—"নাদ সকলেই পাবে?"

"—হাঁ সকলের গতি নাদ। নাদ আরম্ভ হ'লেই যোগ সুরু হ'ল। অবিরাম নাম ক'রবি। বৈখরী অতিক্রম ক'রলেই যোগ সুরু হবে, তখন আপনাআপনি হবে। সমস্ত পাপ ক্ষয় হ'য়ে যাবে।"

শান্তানন্দ—"নর্ম্মদায় স্নান করে সব পাপ ওঙ্কারেশ্বরে ক্ষয় করেছি।"

—"অনন্ত জন্মের পাপ। শুধু পাপের দ্বারা জ্ঞানাবৃত, পাপক্ষয় হ'লেই স্বতঃই জ্ঞান হ'য়ে যাবে। এই পাপ যখনই ক্ষয় হবে, তখনই জ্ঞান হ'য়ে যাবে। জ্ঞানলাভের চিহ্ন চোখ বুজলে জ্যোতি, চোখ তাকালে জ্যোতি, সর্ব্বদাই জ্যোতি থাকবে।"

"ত্যাগী ছেলেরা কোনক্রমেই গৃহস্থ বাড়ী যাবে না। গেলে তারা সীতারামকে ত্যাগ ক'রবে।"

সেবা—"যদি নাম হয়, গৃহস্থ বাড়ী যাওয়া চলে ?"

—"নাম হোক আর যাই হোক, কোন ছলে গৃহস্থ বাড়ী যাবে না। ক্রমে জলতৃষ্ণা পাবে, কিছু খেতে হবে, হাড়ী চড়ান হ'বে। আর আশ্রমেও মায়েদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রবে না।"

সেবানন্দ—"আশ্রমে সকলের সঙ্গে থাকলে মধ্যে মধ্যে অসুবিধা হয়। যেমন—দুপুরে জপ শেষ হয়নি, তখন আশ্রমের ভোগ হ'য়ে গেল, কি করা যাবে ?"

"—সে অবস্থায় গিয়ে নিজের ভাতটা এনে রেখে দেবে। সকলকার ঠিক এক সময়ে সময় হয় না, বিশেষ—যারা জপাদি করে। তবে সকলকেই চেষ্টা ক'রতে হবে ভোগ হ'লেই প্রসাদ পাওয়া, নচেৎ সন্ধ্যায় জপের বিঘ্ন হ'বে।"

কৃষ্ণদাস—"আশ্রমে কেউ সকলের সঙ্গে না খেয়ে যদি স্বপাক খেতে চায় ?"

"—ঠাকুরের প্রসাদ সকলকেই পেতে হ'বে। নচেৎ রাম স্বপাক আরম্ভ, শ্যাম যদুও কান্নাকাটী ক'রবে।"

কৃষ্ণদাস—"সকলে যদি তাকে সমর্থন করে ?"

—"তাহ'লে ক'রতে পারে।"

তারপর লিখলেন—"গাড়ীতে লণ্ঠন হারানো আমাদের অভ্যাস,

যেন সে অভ্যাস দূর না হয়।" বেদবিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপলক্ষ্য ক'রে সমস্ত ছাত্রদের প্রতি তাঁর উপদেশ লিখছিলেন—

"—নিমাই প্রভৃতি ছাত্রদের ব'ল্‌বি,—তারা যেন যথাসময়ে সন্ধ্যা ও নিয়মিত পাঠাভ্যাস করে। ছাত্রগণের বিলাসিতা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। বিলাসিতার দ্বারা চিত্ত বহির্মুখী হয়, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হওয়া কঠিন।

'অহেরিব গণাদ্ভীতো মিষ্টান্নঞ্চ বিষাদিব।
রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি॥'

লোকসঙ্গ সাপের ন্যায়, মিষ্টান্ন বিষের ন্যায় ও স্ত্রীলোকগণকে রাক্ষসীর মত যে দেখে দূরে থাকে, সে বিদ্যালাভে সমর্থ হয়।"

বেলা ১টায় জনতা এক্সপ্রেসে তিনি চ'ল্‌লেন দিল্লী অভিমুখে। দিল্লী হ'য়ে দ্বারকায় এলেন। এবার দ্বারকায় মৌন চাতুর্মাস্য। গতবার প্রচারকালে যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন, তখন দ্বারকানাথের পাণ্ডা শ্রীগিরিধারীলালজী একটি মালা দিয়ে বলেন—দ্বারকানাথজী আপনাকে এখানে চাতুর্মাস্য করার নোটিশ দিলেন।

ইনি বলেন—"দ্বারকানাথের ইচ্ছা হ'লে হবে।" ইচ্ছা হ'য়েছে দ্বারকানাথের। তাই দ্বারকায় মৌন চাতুর্মাস্য চ'ল্‌ল। তিনি যথারীতি মৌন।

ভেট-দ্বারকায় মৌন চ'ল্‌ছে। ছেলেরা সঙ্গী মৌন তপস্যায়। খাদ্য—ওল, মান, কাঁচকলা প্রভৃতি সেদ্ধ। একমাস কেউ কেউ মাত্র ফলের রস খেয়ে জীবনধারণ ক'রেছেন। মৌন চাতুর্মাস্য কিনা। তাই চাতুর্মাস্য শেষ হ'য়ে আস্‌ছে দেখে কেউ কেউ গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু তাঁর আদেশ—"সীতারামকে কেউ দেখ্‌বে না, সীতারাম কাউকে দেখবে না।' ফলে কেউ আর দর্শনের চেষ্টা

ক'র্‌ল না। এই অবস্থা দেখে সকলেই ভাবলেন—মৌনভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নেই।

১লা অগ্রহায়ণ হঠাৎ বেরিয়ে এলেন, ইসারা ক'র্‌লেন—মন্দিরে চল্। সমুদ্রে স্নান ক'রে দ্বারকানাথজীকে দর্শন ক'র্‌লেন। ভঙ্গ হ'ল মৌন। ব'ল্‌লেন—প্রণাম কর। সকলে প্রণাম ক'র্‌লেন। মন্দিরের মোহন্তজী শ্রীদ্বারকানাথের গায়ের চাদর জড়িয়ে দিলেন তাঁর শ্রীঅঙ্গে। চারিদিকে আনন্দের স্রোত বইতে লাগ্‌ল।

চারিদিকে টেলিগ্রাম করা হ'ল—ঠাকুরের মৌনভঙ্গ হ'য়েছে। অনেকে দ্বারকা উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'র্‌লেন। শ্রীকৃষ্ণের (দ্বারকানাথের) পূজারী পণ্ডিত, দার্শনিক, ভক্ত। তিনি মন্ত্র নিলেন। নাম শ্রীবালকৃষ্ণ লালজী ন্যায়াচার্য্য। বহু দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হ'ল। ইনি ব'ল্‌লেন—তোর জন্যই আমি দ্বারকায় এসেছি। পূজারীজী বহু সাধুসঙ্গ ক'রেছেন। বয়সও হ'ল সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু দীক্ষা হয়নি। এতদিনে তাঁর দেবসেবার ফল মিল্‌ল। তাঁর অন্তর পূর্ণ হ'য়ে গেল।

হোসাঙ্গাবাদে বিষ্ণুযজ্ঞ হ'বে। সেখানের লোকদের খুবই উৎসাহ। সদানন্দজীর (হোসাঙ্গবাদ) খুব আগ্রহ। তিনি এঁকে চাইলেন সেই যজ্ঞে। যজ্ঞ অবশ্য ঠাকুরের ইচ্ছায়-ই হ'চ্ছে।

দ্বারকা থেকে যাত্রা ক'রলেন হোসাঙ্গাবাদ। পথে পুণা ঘুরে আসার ইচ্ছা হ'ল। নামলেন পুণায়। থাকলেন একদিন। শ্রীদিলীপ কুমারকে খুব ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে আগেই পরিচয় হ'য়েছিল। কিন্তু দিলীপকুমার তখন অসুস্থ। সে ঘটনা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর একটি (অমুদ্রিত) পত্রে বিবৃত হয়েছে ('দেবযান'—মাঘ ১৩৬৭)।

"তিনি (অর্থাৎ ঠাকুরের অনুচর) খবর দিয়ে গেলেন—ঠাকুর পুণায় এসেছেন—তিনি দাদাজীর কুশল জানতে চেয়েছেন। তাঁর কাছেই

শুন্‌লুম যে, ঠাকুর সীতারাম সেদিন পুণায় এসেছেন বটে, কিন্তু নানা কাজে তিনি এতই ব্যস্ত আছেন যে, পরের দিনই বৈকালে তিনি পুণা ত্যাগ ক'রে যাবেন। এবং বোধ হয় তাঁর পক্ষে আশ্রমে আসার সময় করে ওঠা সম্ভবপর হ'বে না। বুঝতেই পারছ, দাদাজীর কাছে এ খবর পৌঁছুলে ডাক্তারবাবুদের নিষেধও তাঁকে আট্‌কে রাখতে পারবে না, তাই, ঠাকুর সীতারামের অনুচরটি চলে গেলে আমি শ্রীকান্ত ভাইকে তাঁর কাছে একটি নিবেদন জানিয়ে পাঠালুম। শ্রীকান্ত ভাই তাঁকে দাদাজীর অসুস্থতার কথা জানিয়ে, ঠাকুর সীতারামজীকে এই আশ্রমে শুভাগমন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলে এল, যদি একান্তই তাঁর অবসর না হয়, তবে পরদিন ভোরে দাদাজী স্বয়ং সেখানে যাবেন—তাতে চিকিৎসকদের সম্মতি থাক বা নাই থাক।

পরের দিন ২৩শে নভেম্বর। কিন্তু দাদাজীকে আর যেতে হ'ল না। স্বয়ং শ্রীশ্রীসীতারামজী এলেন আমাদের এই আশ্রমে।……

সেদিন সকালে অল্পক্ষণের মধ্যে দাদাজী, ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামজীর শুভাগমন উপলক্ষ্যে বাংলায় একটি সুন্দর গান লিখেছিলেন। গানটি লিখে তিনি উপর থেকে নীচ নেমে এলেন—শিশুসুলভ অধীর আগ্রহে মন্দিরের সামনের পথে পায়চারী করতে লাগ্‌লেন।—বারে বারে ব্যগ্র হ'য়ে তাকাতে লাগ্‌লেন—কখন তিনি আসবেন? ……দূর থেকেই মধুর নামকীর্ত্তনের ধ্বনি তাঁর শুভাগমনের দূত হ'য়ে এল। ঠাকুর সীতারাম এসে গাড়ী থেকে নামলেন—দু'হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধ'র্‌লেন দাদাজীকে। এক স্বর্গীয় দৃশ্য—মা যেমন ক'রে তার হারানো ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তেমনি করে মধুর আলিঙ্গনে দাদাজীকে

বুকে টেনে নিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারাম।……এরপর দাদাজী তাঁর সেদিনের লেখা গানটি গাইলেন।……"

গানটি নিম্নে প্রদত্ত হল।

"শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীচরণেষু।

এ যুগে দেখা দিলে,
অদেখার আলো নিয়ে,
তোমাকে বন্ধু, সে কোন্
পূজিব অর্ঘ দিয়ে?
যা কিছু নিয়ে ভবে
করে জীব মাতামাতি,
সে সবই মিথ্যা মায়া
তারা নয় চিরসাথী।
শুধু এক সঙ্গী আছে
মরণের অন্তরালে,
তারে যে চিনেছে—সে-ই
জিনল মহাকালে।
তুমি নাথ সেই আলোকের
অপারের বাণী নিয়ে
এলে আজ তোমাকে কোন
পূজিব অর্ঘ দিয়ে?

"দাদাজী যতক্ষণ গানটি গাইছিলেন, ততক্ষণ ঠাকুর সীতারাম সমাধিতে মগ্ন হয়ে ছিলেন।"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সেই সুন্দর বর্ণনার শেষে লিখেছেন, "আমরা

সবাই ঠাকুর সীতারামজীকে ভক্তি ক'রে প্রণাম ক'রলুম। বারে বারে আমি উপলব্ধি ক'রলুম যে, আজ আমাদের এই মন্দিরে গোপালজী স্বয়ং এসেছিলেন। তাই তো মীরাজীর কথা মনে পড়ে গেল—'হম ঘর স্বজন আয়ে সখীরে হম ঘর স্বজন আয়ে।"

অপূর্ব্ব কণ্ঠ। সকলেই তন্ময়। ইনি সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গ হ'ল ইন্দিরা দেবী গান ধরলেন। শেষে হারমোনিয়ম ছেড়ে দিয়ে শুধু "হরিবোল, হরিবোল" করতে লাগলেন। সকলের চোখে বাদলধারা। অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। ঠাকুর শ্রীদিলিপ রায়কে 'প্রেমানন্দ' ও ইন্দিরা দেবীকে 'ভক্তিমা' নাম দিলেন। ইন্দিরা দেবীর ওপর 'মীরা'র ভর হয়।

বোম্বাই প্রভৃতির পরে হোসাঙ্গাবাদে উপস্থিত হ'লেন। শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে আসা হ'ল যজ্ঞস্থলে। যজ্ঞ আরম্ভ হয়নি। সব আয়োজন হয়ে আছে। স্থান হ'ল নর্মদার তীর। অপূর্ব্ব দৃশ্য। একদিন পর যজ্ঞ আরম্ভ হ'বে। বিষ্ণুযজ্ঞের আচার্য্য শ্রীকেদারনাথ শাস্ত্রী। যজ্ঞ সপ্তাহব্যাপী। তাঁর বিনয়ে ঠাকুর মুগ্ধ হ'লেন। আচার্য্য প্রার্থনা জানালেন—"বাঙ্গাল মে আপ একঠো রামযজ্ঞ করিয়ে।"

শ্রীঠাকুর—"রূপিয়াকা ভি বহুৎ যাস্তি জরুরৎ হ্যায়? মৈ তো সাধু, এতনা রূপিয়া কাঁহা?"

শ্রীকেদারনাথজী—"থোড়া রূপিয়াসে যজ্ঞ হো সক্তা। বড়া যজ্ঞ হোনেসে বহুৎ রূপিয়া লাগ যাতা।" এইভাবে আলোচনা হ'ল।

১০ই অগ্রহায়ণ। ঠাকুরকে সামনে রেখে বিষ্ণুমহাযজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। প্রথমে গুরুপূজা ক'রে যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। বেদমন্ত্রধ্বনিতে

যজ্ঞস্থান মুখরিত হ'য়ে উঠল। নেমে এল বৈকুণ্ঠের সুষমা। সাতদিন ধরে যজ্ঞ চলতে লাগল। দীক্ষাদান, নাম প্রভৃতিও চলছে।

টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে—শ্রীমৎ জগন্নাথদাসজী মহারাজকে। ইনি হ'চ্ছেন—শ্রীঠাকুরের আদি সম্প্রদায়ের আখড়ার মোহন্ত; ত্যাগী ছেলেদের নাকি সাধুসমাজে স্থান দিতে নারাজ হ'ন সাধুরা। কারণ গুরুপরম্পরা ও মুল আখড়ার পরিচয় আদি ঠিক নয়। তাই মোহন্ত মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি এসে অন্যত্র উঠেছেন।

"মোহন্ত মহারাজকে প্রণাম করে আহ্বান জানা সীতারামের প্রতিনিধি হ'য়ে"—এই নির্দ্দেশ দিলেন রঘুনাথকে। জীপও সঙ্গে দিলেন। মোহন্ত মহারাজকে আনা হ'ল। দুজনে আলাপ হ'ল।

"সীতারামের ত্যাগী ছেলেদের ভারী দুঃখ, তাদের নাকি সাধু-সমাজে স্থান দেয় না। সীতারামের ৭০।৭৫ খানা বই, বিভিন্ন ভাষায় ৫।৬ খানা পত্রিকা, ৬০।৭০ হাজার সন্তান, এসব আপনার সেবায় যদি না লাগান···।"

মোহন্ত মহারাজ বল্লেন—"সব লোক কুলকা নামসে তর জাতা। লেকিন আপ কুল পাবন হ্যায়। আপ বড়া কুটম্ব হ্যায়।"

সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ হ'ল। মহন্ত মহারাজজীকে পূজা ও আরতি করা হ'ল। ইনি প্রণাম করে চরণামৃত ও প্রসাদ গ্রহণ করলেন মহন্ত মহারাজের। এ এক অপূর্ব্ব লীলা। ক্যামেরায় ধরা আছে মিলনের ছবি।

হোসাঙ্গাবাদে যজ্ঞ শেষ হ'ল। চল্লেন দেবাস অভিমুখে। এখানকার ভক্তদের প্রাণ কেঁদে আকুল। কিন্তু যেতে দিতেই হ'ল। অপূর্ব্ব এঁদের আন্তরিকতা।

দেবাস থেকে উজ্জয়িনী। এখানে একদিনের যজ্ঞ। যজমান



শ্রীশ্রীঠাকুর ও গোয়ালিয়রের মোহান্ত মহারাজ

কিঙ্কর নারায়ণ ও লক্ষ্মীমা। এখানে মহাকালের মন্দির আছে। এটি একটি পীঠস্থান। এখান থেকে ওঙ্কারেশ্বর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

এই সময়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া নিয়ে একটা আলোচনা হয়। প্রশ্ন হ'চ্ছে—সকলেই কেন সকল প্রতিমায় অঞ্জলি দিতে পারবে না? এর উত্তর দিলেন পত্রে।

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র ॥

প্রেমভাজনেষু,

বাবা তোরা কেমন আছিস্? ৺মার আশীষ জান্‌বি জানাবি। "বেদে" কথিত হয়েছে—সৃষ্টিকর্তা শ্রীভগবানের মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য, চরণ হতে শূদ্র উৎপন্ন হয়েছে। সমাজ-রূপ শরীরে ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, শূদ্র চরণ—প্রত্যেকের কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, শম, দম, আস্তিক্যাদি ; ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, প্রজাপালন ইত্যাদি ; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি ; শূদ্রের সেবা। শাস্ত্র এইভবে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের কর্ম্মের ব্যবস্থা করেছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এদের উপনয়ন আছে, বেদে অধিকার আছে, শূদ্রের নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বেদবিহিত কর্ম্মের দ্বারা যে গতিলাভ করবেন, শূদ্র মাত্র সেবার দ্বারা সেই গতি প্রাপ্ত হবেন।

ক্রমে যখন বর্ণাশ্রম বিভ্রষ্ট হয়ে গেল ; তখন মূললক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক পূজার ব্যবস্থা হল। অসীমকে সসীমে আনা হল। বিশ্বব্যাপীকে পূজা মণ্ডপেতে আবদ্ধ করা হল। শাস্ত্র বললেন, ব্রাহ্মণের প্রতিমা ব্রাহ্মণেই পূজা করবে, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি দিবে। ব্রাহ্মণের প্রতিমায় যদি কায়স্থ বা নবশাক পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে প্রতিমা নষ্ট হবে। কায়স্থ নবশাক প্রভৃতির প্রতিমায় গোয়ালা কৈবর্ত্ত

আদি পুষ্পাঞ্জলি যদি দেয়, সে প্রতিমা নষ্ট হবে। গোয়ালা মাহিষ্য প্রতিমায় যদি ভুলে বাগ্দী পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তাহলে সে প্রতিমা নষ্ট হবে। যে শাস্ত্রে প্রতিমাপূজার বিধান আছে, সেই শাস্ত্রের বিধান এইরূপ। জগতে নারীমাত্রেই মাতা। গর্ভধারিণী ছাড়া অপরের মাই খেতে গেলে প্রহার লাভ অনিবার্য্য। এ ব্যাপারও সেইরূপ। চিতেরমার পড়ার জগদ্ধাত্রীমাতার যে পূজা হয়, সেখানে ৺রাধারমণ চট্টোপাধ্যায়ের মাতার নামে সঙ্কল্প করে পূজা হয়। সেজন্য সেখানে শূদ্রদের পুষ্পাঞ্জলি দেবার নিষেধ আছে।

মুখ খায়, হাত কাজ করে, উরুর কাজ স্বতন্ত্র, পায়ের কাজ চলা। পা যদি বলে খাব, মুখ যদি বলে চলব, উরু যদি বলে আমি হাতের কাজ করব, হাত যদি বলে পায়ের কাজ করব, এটা যেমন সম্ভব নয়, —হাস্যকর, তেমনি শাস্ত্রে যে যে বর্ণের যে যে ব্যবস্থা আছে, সেই সেই কর্ম্মেই তাদের অধিকার। অন্য কর্ম করাটা সম্ভব নয়। একটি গাছ। গাছের গুঁড়ি ডাল ফুল ফল শেকড় আছে। গুঁড়ি ডাল ফল দেখা যায়, শেকড় মাটিতে পোঁতা—দেখা যায় না। কিন্তু শেকড় রস আকর্ষণ করে বলেই গুড়ি ডাল ফল এরা লোকলোচনের আনন্দপ্রদান করে থাকে। শেকড় যদি বলে, আমি মাটির ভেতর লুকানো থাকবো কেন? আমি গুঁড়ি ডাল ফলের সম অধিকার গ্রহণ করব, তাহলে যেমন গাছের অস্তিত্বই থাকে না, তেমনি শূদ্র যদি অন্য বর্ণত্রয়ের অধিকার চায়—তাহলে সমাজ শরীর ধ্বংস হয়ে যায়।

লক্ষ্য রোগ-আরোগ্য। তা—গোলাওষুধ মিক্সচারও খাওয়া চলে, ইন্‌জেকশন করাও চলে। দুই এর দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়। বিধিবহুল মিক্সচার খেতে হলে যেমন—শিশি, গেলাস, ক ঘণ্টা

অন্তরেব জন্য ঘড়ি, মুখে দেওয়ার জন্য ছোলাভিজান বা আদার কুচি দরকার হয়, ইনজেকৃশন করতে সেরকম কিছু দরকার হয় না। যেমন বিধি-বহুল ব্রাহ্মণ বৈশ্যর বেদমার্গ, তেমনি শূদ্রের সহজ সরল সুগম প্রেমমার্গ—নামাকরা এটি ইন্‌জেকসন্। লক্ষ্য রোগারোগ্য ; যারা গোলা ওষুধের অধিকারী, তাদের গোলা ওষুধই খাওয়া উচিত ; যারা ইন্‌জেকশানের অধিকারী, তাদের ইন্‌জেকশানের দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে। অধুনা ব্রাহ্মণ বৈশ্য কর্মভ্রষ্ট হয়েছেন বলেই তাদেরও ইন্‌জেকশন করতে হচ্ছে। এ সম্বন্ধে চিঠিতে কত লিখি ? আশা করি মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারবি। এই পত্র নিয়ে দিগন্থই এসে দেখা করবার চেষ্টা করিস। সচ্চিদানন্দকে ধরলেই কাজ হবে। গঙ্গাসাগরে সীতারাম মৌন থাকবে, বিরক্ত ছেলেরা থাকবে—এই ব্যবস্থা হয়ে গেছে। উঠতে বসতে খেতে শুতে ডাকৃবি। মঙ্গল !

তোর সীতারাম

এলেন দিল্লী। চল্‌ছে নামপ্রচার, ভাষণ। ইচ্ছা হ'ল যাবেন কুরুক্ষেত্রে। সকলকেই সঙ্গী হতে হবে। যাত্রার জন্য সকলে প্রস্তুত হ'ল। দেখা গেল ৩।৪ জনের স্থান সঙ্কুলান হ,চ্ছে না গাড়ীতে। ইনি তাদের না নিয়ে যেতে নারাজ ! তাঁরা বল্‌লেন— "আপনি যান, আমরা যাচ্ছি।" মটর চল্‌ল কুরুক্ষেত্র অভিমুখে। পাঞ্জাবে এসে সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু সঙ্গী-দের সংবাদ পাওয়া গেল না। গাড়ী আবার চল্‌তে সুরু ক'রল। কুরুক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'লেন।

ইনি—আজ ভীম একাদশী, কিছু নেওয়া হবে না।

সকলেই কিছু গ্রহণের প্রার্থনা ক'রলেন। ইনি কিন্তু কোন

প্রার্থনাই মঞ্জুর ক'রলেন না। ব্রহ্মহ্রদ, শ্রীভগবানের গীতা-উপদেশের স্থান প্রভৃতি দেখা হ'ল। দিল্লীতে ফিরলেন—রাত্রে। ভোগ হ'ল। সকলে প্রসাদ পেল।

মৌনে তিনটা কথা ভেসে ছিল—১। দ্বারকায় মৌনচাতুর্মাস্য। ২। অযোধ্যায় সম্প্রদায় মিলন। ৩। গঙ্গাসাগরকে নিত্যতীর্থ করা। এবার সম্প্রদায়মিলনের পালা। অযোধ্যায় এসে "দিব্য কলাকুঞ্জে" উঠলেন। তাঁরা খুবই আদরের সঙ্গে সকলকে গ্রহণ করলেন। সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

যথারীতি বেরুলেন শ্রীনামপ্রচারে। ছোট ছাউনীতে যাওয়া হ'ল। ছোট ছাউনীতে মোহন্ত মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রলেন। তারপর আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে কর্ম্মী ছেলেদের অনেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে আলোচনা শুন্‌ছেন।

মোহন্ত মহারাজ—গৌরাঙ্গদেবকো শ্রীকৃষ্ণকা অবতার কহা জাতা। আপকা মাফিক কৈ নামপ্রচার নেহি কিয়া। আপ শ্রীরামচন্দ্রকা অবতার হ্যায়।

সকলে জয় দিলেন। বহু আলোচনা হ'ল। পুস্তকাদি উপহার দেওয়া হ'ল, উপহার পাওয়াও গেল। অযোধ্যা-পরিক্রমা করে 'দিব্য কলায়' ফেরা হ'ল। একটি আশ্রমের কথাও হ'ল।

দিগসুই ও বর্দ্ধমানে লঘুরুদ্রযজ্ঞের আয়োজন চল্‌ছে। শ্রীযজ্ঞ ভগবানের সেবার সুযোগ দিয়েছেন রঘুনাথকে। সহকারীরূপে রমেশকে নিতে ব'লেছেন। শেষে সাধনকেও সহকারী ক'রে দিলেন।

দিগসুইয়ের যজ্ঞের দিন এগিয়ে এল। আগের দিন এলেন

শ্রীঠাকুর॥ রাত্রে-ই সব দেখে নিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। লঘুরুদ্রযজ্ঞ—তিনদিন যজ্ঞ। যজমান হলেন—সস্ত্রীক গুরুপুত্র। জনতা সমুদ্রের আকার ধারণ ক'রল। পথে-ঘাটে কোথাও স্থান নেই।

যজ্ঞের ব্রাহ্মণদের সেবার ব্যবস্থা হ'ল স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন—শচীন্দ্রনাথ। সর্বত্র আনন্দস্রোত বইতে লাগল।

বর্দ্ধমানের পালা এল। এখানে লঘু রুদ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা হ'ল। স্থান—মোহন্তের অস্থল। স্থানটি অপূর্ব, মোহন্ত মহারাজের ব্যবহারও অনুপম। যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। যজ্ঞস্থলে অগণিত নরনারীর আবির্ভাব হ'ল। ইনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। দীক্ষা প্রণামাদি চ'লছে। জয়গুরু সম্প্রদায় বর্দ্ধমান শাখার সেবকগণ আত্মনিয়োগ করলেন। বর্দ্ধমানের সন্তানদের উৎসাহের তুলনা হয় না। কেউ বা সামনে থেকে, কেউ বা পাশে থেকে সেবার সুযোগ নিচ্ছেন। যজ্ঞে উপস্থিত হ'লেন—ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য, ডঃ হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। যজ্ঞেশ্বর এখানে যজ্ঞ শেষ ক'রে যাত্রা করলেন কারকবেড়ে উদ্দেশে।

মৌনের কাল এসে গেল। এবার মৌন গঙ্গাসাগরে। তাঁর আসার আগেই তাঁর 'বাবারা মায়েরা' একটি আশ্রম করেছেন। আশ্রমটি দেখে খুবই আনন্দ হ'য়। এবারে সঙ্গে আছেন শ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণজী—পরমগুরু পুত্র। তিনিও মৌন থাকবেন। শ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। কিছু সঙ্গীদের পাঠালেন—গঙ্গাসাগর মেলায় শ্রীনামপ্রচারে। আশ্রমে নাম চলছে। এই আশ্রমের নাম হ'ল—যোগেন্দ্র মঠ।

প্রথমে নিষেধ ছিল 'মায়েদের' এখানে আসা। শেষে ব্যবস্থাপনা দেখে সকলকে আসবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাওয়া অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

একজন সাধু এলেন, অনুমতি চাইলেন—মোহন্তের গদির জন্য মামলার। ইনি—বাবা তুমি ঘর থেকে বেরিয়েছ কি মামলা করবার জন্য ? সাধুটি নিরস্ত হ'লেন। রাত্রে চ'ল্‌ছে গোপন আলোচনা। বিষয়বস্তু—সম্প্রদায়ের নাম ও আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনাদি। দু,-একজনকে ব'ল্‌লেন গোপনে সব তথ্যসংগ্রহ ক'রতে। তারপর প্রসাদ পেয়ে সকলে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

এল মৌনের দিন। নিলেন মৌন। বৌদি (এঁর গুরুমা) এসে কাছে ব'সে মৌনতে তরকারী প্রভৃতি নেবার অনুরোধ ক'র্‌লেন। ইনি সম্মত হ'লেন। দেখছেন যে অন্যে তাঁকে শিখিয়ে দিচ্ছে, তথাপি তিনি সবটাই গুরু-আজ্ঞা ব'লে গ্রহণ করলেন। ধন্য তোমার আদর্শ।

এঁদের বেরুবার দিন এগিয়ে এল। বৌদিকে প্রণাম ক'র্‌তে এলেন। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সুযোগ পেলেন স্পর্শপ্রণামের। যাত্রা ক'রলেন। মাত্র কয়েকজন থেকে গেলেন।

একমাস পরে মৌনভঙ্গ হ'ল।

টেলিগ্রাম এল ডাঃ দীনবন্ধুর কাছে—'Send Raghunath Diamond Harbour. আরও কয়েক জায়গায় 'তার' গেল,—যাদের প্রয়োজন, তাদের ডায়মণ্ডহারবার যাবার আদেশ এল। এলেন ডায়মণ্ডহারবারে। পথে বেশ কিছু দেরী হ'য়ে গেছে। কৃপা করলেন পরমেশকে। সে সুযোগ পেল সেবার। রাত্রে আলাপ আলোচনা চ'ল্‌ছে প্রচারসূচী তৈয়ারী হ'ল।

এবারে ভাবটা খুবই কঠোর। ব'ল্ছেন—"ভাবে, সীতারাম কিছু বোঝে না। সীতারাম তোদের বাবা।"

পরদিন যাত্রা কর্লেন দক্ষিণ ভারত অভিমুখে। ঠিক হ'ল দক্ষিণ ভারত ⁄পুরী হ'য়ে দোল উৎসবে যোগ দেবেন। এবার ⁄পুরীতে গোবিন্দ দ্বাদশী। উৎসবে যোগ দিলেন।

আগেই জানিয়েছিলেন "দাশুর অর্থে যজ্ঞ হবে না। বিমল সামনে থাকতে রঘুনাথ যজমান হতে পারে না।" অবশ্য দাশু ঘোষ সেবার অধিকার পেয়েছিল, মাত্র যজ্ঞভগবানের সেবার অধিকার দেওয়া হয়নি। রঘুনাথকে বলেছিলেন কানপুরে এ বিষয়ে—"তুই একা কি করবি ?"

এইসব মিলিয়ে ডুমুরদহের যজ্ঞ প্রায় অনিশ্চিত হয়ে উঠে। তাই রঘুনাথ দীর্ঘ পত্রে প্রার্থনা জানায় যজ্ঞের, লেখে টেলিগ্রাম করতে। তার-ই সঙ্গে থাকে জয়গুরু সম্প্রদায় শ্যামনগর শাখার অনুমোদনের কথা।

পত্র গেল পুরীতে ; টেলিগ্রাম এল ডুমুরদহ—Bimal Ready আনন্দে সকলে মেতে উঠল।

পুরী এক্সপ্রেস হাওড়ায় এল। নেমেই সোজা তারকনাথের গাড়ীতে। সোজা চালাতে ব'ল্লেন। আজ অজ্ঞাতবাস। এসে উঠলেন—শ্রীজগন্নাথনিবাসে, চুঁচুড়া, কনকশালীতে। নিজেই ভোগ প্রস্তুত ক'র্লেন। ভোগ দিলেন। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চ'ল্ল তাঁর গাড়ী। শেষে বৈকালে বালিতে 'কেদার ভবনে' এলেন। খুব তাড়া আজ দোলপূর্ণিমা। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের আমন্ত্রণে গৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসবে যোগ দিলেন। সুসজ্জিত রথে ইনি ও তেতিরীয়ার ঠাকুর ব'স্লেন। চরণতলে স্থান পেল কিঙ্কর সেবানন্দ ও কিঙ্কর আত্মানন্দ।

বহু সম্প্রদায় বহু রকম নাম করতে করতে চলেছেন। অগণিত পতাকা। এত জনসমাগম কোন ধর্মোৎসবে দেখা যায় না। রথ থেকে আবীর ও বাতাসা বর্ষিত হ'চ্ছে। নগর প্রদক্ষিণ শেষ হ'ল। উঠলেন মঞ্চে। করলেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত। শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি ভাষণ দিলেন। শেষে সভাপতির ভাষণ হ'ল। সভা শেষ হ'ল। চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে।

একদিন পরে। এসেছেন দমদমে। লোকের যাতায়াতের বিরাম নেই। রাত্রে একটী গোপন সভার আহ্বান হ'য়েছে। আলোচনা সভা হ'ল—শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়ে, বরাহনগরে। বামুনপাড়ার নামের বিষয় আলোচনা হ'ল। হ'ল কিছু পরিচালকমণ্ডলার পরিবর্ত্তন।

অসুস্থ শরীর নিয়েই এলেন ডুমুরদহে। অবশ্য কেউ জানতে পারে নি তাঁর অসুস্থতার কথা। লঘুবিষ্ণুযজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। দুপুর বেলা খবর হ'ল, শ্রীঠাকুর অসুস্থ। সকলের প্রবেশ নিষেধ তাঁর ঘরে। গোপনে দিগ্‌সুইয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। এলেন দিগ্‌সুই। সেখানেও ঠিক বিশ্রাম নিচ্ছেন না। কিঙ্কর নারায়ণ প্রার্থনা জানালেন বালিতে আসার; প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল। যাত্রা ক'রলে্ন বালি।

অসুখ খুবই—এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ল। সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য কেউ যাচ্ছে না তাঁর কাছে। দুপুরবেলা শুয়ে আছেন। এল রঘুনাথ ও শ্রী। ব'ললেন—অসুখ টসুক কিছু নয়। এবার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গান হ'য়েছে। পাপ হজম না হ'তেই আবার ৩।৪ হাজার। সীতারামের একদিনেই ভোগ হ'য়ে গেল। যাক, অনেক ব্যাটা বেটী বেঁচে গেল।"

*　*　*　*

"ওপর থেকে নামছে। যে সরে যাবে, সে বঞ্চিত হবে। তাঁর কাজ হবেই।"

শুয়ে শুয়েই মনে হ'চ্ছে যজ্ঞের কথা। জলপাইগুড়ির কোহিনূর টি ষ্টেটে যজ্ঞ হবে জানিয়ে দিলেন। শ্রীকে মন্ত্রগ্রাম দিলেন। কিছু লোক আশ্রয় পেল।

গোপনে এলেন রাণীগঞ্জ। উঠ্লেন "মাতৃভবনে"। অনেকে কৃপা পেল। একজন দীক্ষা নিতে এবাড়ীতে আসতে পারেন কি না জানতে চান। এবাড়ীর সঙ্গে তাঁদের সদ্ভাব নেই। শ্রীঠাকুরের আশ্রয়প্রার্থী—এ কথা শুনে সদানন্দ বল্লেন,—এবাড়ী শ্রীঠাকুরের, তিনি নিশ্চয় আসবেন। দীক্ষা নিয়ে আবার অসদ্ব্যবহার ক'রতে পারতেন, তাতেও আপত্তি নেই।' একটি বেলরুই ও একটি রাণীগঞ্জে অখণ্ড নামের কথা হ'ল। বেলরুইয়ে ভিত্তিস্থাপন করলেন। দুই স্থানে উদ্যোগ আরম্ভ হ'ল। সিয়ারসোলের হরিপ্রসাদের বাড়ীতে যজ্ঞের কথা ছিল। যজ্ঞের ব্যবস্থা করে নেওয়ার ইচ্ছা দেখালেন, জানালেন—তিনি কিন্তু উপস্থিত থাকতে পারবেন না। এতে কেউ সম্মত হ'ল না।

শ্রীঠাকুরের শরীর বেশ ভাল নয়, তবু নাম ও যজ্ঞের আহ্বানে যাচ্ছেন। শ্রীঠাকুরের অবাঙ্গালী সন্তানরা ডাকলেন—তিনি গেলেন না। রাণীগঞ্জের এদের অভিমান হ'ল, ফলে বঞ্চিত হয়ে রইল।

আজ কোহিনূর টি ষ্টেটে যাত্রা ক'রতে হ'বে। আশুতোষ সেবার ও যজ্ঞের প্রার্থনা জানিয়েছেন। প্লেনের ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। দলে দলে প্লেনে যাত্রা সুরু হ'ল। গুরুজনদের আগে দিলেন প্লেনে তারপর নিজে উঠ্লেন। প্লেন নামল কুচবিহারে। মটরে নিয়ে

গেলেন শিষ্য আশুতোষ ভট্টাচার্য্য। এখানে যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। ব্যবস্থা অপূর্ব! নাম ও যজ্ঞ চ'ল্‌ছে সমান তালে।

রাত্রে ভাষণের সময় এল। পরমগুরুপুত্রকে ভাষণ দেওয়ার প্রার্থনা জানালেন। তিনি ভাষণ দিলেন। পুরঞ্জয়ও ভাষণ দিলেন। শেষে হরিসাধন এঁর গ্রন্থ পাঠ করে শোনালেন। যজ্ঞ শেষ হ'ল। যাত্রা কর্‌লেন কার্সিয়াং।

পথে জলপাইগুড়ি ঘুরে এলেন। স্থান হ'ল সুশীলকুমার ও ভবানী-কুমারের বাড়ী 'গিরিনিবাসে'। ইচ্ছা হ'ল দার্জিলিং যাবার। গেলেন দার্জিলিংএর রামকৃষ্ণ মিশনে। দেখা কর্‌লেন শ্রীমৎ গিরিজা-নন্দজীর সঙ্গে। অনেক কথা হল। তিনি খুব আনন্দিত হ'লেন।

মৌনের দিন এসে গেল। সকলকে বিদায় দিলেন। মৌন নিলেন। সত্যরক্ষা হ'ল। চ'ল্‌ছে কঠোর মৌন; স্বপাক। পূজার ঘরটি পর্য্যন্ত নিজে পরিষ্কার করেন। কাউকে ঢুকতে দেন না। চ'ল্‌ছে কলম। নিবেদিত হ'চ্ছে সব শ্রীগুরুপাদপদ্মে। বাইরে কোন সংবাদ নেনও না, দেনও না। সঙ্গে আছে—কিঙ্কর সেবানন্দ, কিঙ্কর ধ্যানানন্দ, কিঙ্কর পূর্ণানন্দ। এবারে রীতি একটু পাল্‌টে গেছে। কিঙ্কর সচ্চিদানন্দকে দশেড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিঙ্কর সেবানন্দ-ই সব ভার পেয়েছে, পত্র লেখা ও অর্থাদি বিষয়ে। ব্যবস্থাপনা একটু কড়া। সব কিছুই বালি কর্মকুঞ্জে পাঠাতে হ'বে। সেখান থেকে যেখানে যা পাঠাবার ব্যবস্থা হ'বে।

সঙ্গীরা বারবার জানাচ্ছেন—মৌনভঙ্গের কোন লক্ষণ নেই। হঠাৎ ট্রাঙ্ককলে এল কিঙ্কর নারায়ণের ডাক। তিনি গেলেন। শ্রীঠাকুর লিখে জানালেন—মৌন নিয়েই পুরী যাবেন। সব ব্যবস্থা হ'ল প্লেনে দমদমে এসে নামলেন। বালিতে ভোগের ব্যবস্থা হ'ল

স্পর্শপ্রণাম হ'ল। কয়েকটি বিষয় লিখে লিখে আলোচনা হ'ল। তাঁর লেখা কয়েকটি খাতাও পাঠ চ'লতে লাগল।

"নামপ্রচার অবসান, দীক্ষাদান শেষ······ইত্যাদি।"

অনন্য এবং ঘটনা বহুল পুরীর এই মৌন। মৌনে সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগের চিরন্তন নীতি এবার ক্বচিৎ কখনও ভঙ্গ করে ঠাকুরটি বিশেষ দু চার জন সৌভাগ্যবান্ তথা সৌভাগ্যবতীকে কৃপা ক'রে মৌনের মধ্যেই দর্শন দেন এবং কাগজে লিখে তাঁদের কথার প্রত্যুত্তর ও প্রদান করেন। তাই এবারের মৌন লীলা বিচিত্র, অভিনব।

যাঁদের উপলক্ষ্য করে এবারের মৌন লীলার এই বৈচিত্র্য তাঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণ কিশোর গোস্বামী। তিনি কলকাতা থেকে পত্রে প্রার্থনা করেছিলেন। "আগামী ১৫।১৬ ১৭ জুলাই শনি, রবি ও সোমবার রথ-যাত্রার পর তিন দিন গৌর গম্ভীরা রাধাকান্ত মঠে নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্ব প্রেম প্রচারিণী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইবে। মহন্ত শ্রীগৌর গোবিন্দ দাস গোস্বামী (রাধাকান্ত মঠ, পুরী) একান্ত আগ্রহান্বিত যে আপনি এই তিন দিনের যে কোন দিন একবার শুভাগমন করেন এবং সভায় পৌরোহিত্য করেন।········· আমি সোমবার ১০ই জুলাই পুরী পৌঁছিব এবং আপনার অনুমোদন লাভ করিলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।" তাঁর পত্রের সার কথা বাবাকে জানান হয়; বাবা সেবকদের লেখেন। "তোরা তাঁর কাছে গিয়ে সীতারামের হয়ে করযোড়ে বলবি বাবা মৌনে আছেন। শ্রীভগবানের আদেশ ছাড়া তিনি কোথাও যাবেন না।" পরে জানান, "গোস্বামী মহাশয়ের পত্র দে, সীতারাম একবার মাথায় ঠেকাবে।"

সেবকগণ গৌর গম্ভীরায়প্রভু পাদের শ্রীচরণে একথা নিবেদন

করলে তিনি বলেন। "মোহান্তজীকে নিয়ে আজ ৯ টায় তাঁর চরণে উপস্থিত হব। তবে তোমরা তাঁর সেবক, সেই হেতু প্রিয়; সেজন্য তোমরা তাঁর শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা জানালে তিনি অবশ্যই শুনবেন। কেননা ভগবান্ ভক্তাধীন। তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তকে খুবই ভালবাসেন।"

মহান্ত মহারাজ সহ প্রভু পাদ আশ্রমে আসেন। তাঁর প্রার্থনা-ই বাবা শুন্‌লেন. সেবকদের প্রার্থনা সাড়ে ৯ টায় জানাতে হয় নি। সরাসরি মৌন কুটিরে বাবার কাছে তিনি করযোড়ে বলেন (তাঁদের উপস্থিত দেখেই বাবা অবশ্য দণ্ডবৎ হ'ন) "দেশের এই দুর্দ্দিনে আপনি মৌন নিয়ে ঘরে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। আপনি যেভাবে পথহারা মানুষের দলকে সুপথে চালিত করছেন। তার তুলনা নাই! এই ভাবে আরও উপদেশ দিয়ে যাত্রাপথ দেখিয়ে সত্য প্রচার আপনাকে করতে হবে।......আমরা বৈষ্ণব মহা সম্মেলনের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে চাই।...এই সম্মেলন সার্থক হবে আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে। আপনার মত মহান্ পুরুষকে লাভ করে আমরা আজ আনন্দিত। এখন আমাদের আর কে আছে? আপনাকে যেতে হবে, বাণী দিতে হবে।

গোস্বামী প্রবরের নিবেদন কিন্তু বাবার কর্ণগোচর হ'ল না। তাঁর কানে সতত ওঁগুরু ওঁগুরু নাদ চলছে; বাইরের শব্দ সহজে প্রবেশ করে না। তিনি এ কথা জানিয়ে জোরে ব'লতে নির্দ্দেশ দিলেন; গোস্বামী প্রভু প্রার্থনা পুনরায় নিবেদন করে বললেন, "আপনার ত্যাগ তপস্যা, সবই তো জগতের হিতের জন্য। সকলের হিতের জন্য এই বৈষ্ণব সম্মেলন; তাই বলছি আপনি যোগ দিন।" বাবা লেখেন, "কোন উপায় নাই। মৌনে বের হই না।" তদুত্তরে

তিনি; "জানি সে কথা। তবে আপনার মৌনের হানি আমরা করতে চাই না। অন্ততঃ একদিন দর্শন পেলেই বৈষ্ণব কৃতার্থ হবেন। কত ভক্ত আসবেন। আমাদের এই আশা পূর্ণ করুন।

তখন বাবা লেখেন, "সীতারামের মৌনের এই নিয়ম যে সে কোথাও যাবে না। এখানে এসে জগন্নাথ দর্শন হয় নি। তাই ছেলেদের বলেছি একদিন দর্শন করিয়ে আন্বি। মৌনের নিয়মই হ'ল সর্ব্বসঙ্গত্যাগ।"

গোস্বামী-জী—আপনার নিয়ম আপনি ভাঙ্গতে পারেন। আমরা মৌন ত্যাগ করতে বলছি না, শুধ্ সভায় একদিন পেলেই হ'ল। ভাষণ না দেন, আপনার লিখিত ভাষণ কেউ পাঠ করবে।

বাবা লেখেন, "সীতারাম ভাষণ দিতেই পারবে না। মৌন থাকার ফলে বাক্ ভিতরে ঢুকে যায়। কথা বলার সামর্থ্য থাকে না।"

এই ভাবে বহু কথার আদান প্রদান হয়। অবশেষে বাবা লেখেন "সীতারাম বৈষ্ণবগণের দাসানুদাস। সীতারাম আপনাদের উপর ভার দিল। আপনারা যা বলবেন সে তাই করবে।"

উল্লসিত গোস্বামী মহারাজ সেবকদের বলেন, "আপনারা ঠিক করুন বাবা কবে যাবেন। বাবা ভাষণ লিখে দেবেন তো?"

বাবা লেখেন, "সীতারামের লেখা "কলির পথ," "যুগবাণী" আছে। পাঠ হবে। সীতারাম কবে যাবে?

গোস্বামী মহারাজ: রবিবারেই ভাল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ৫টা ৬টার সময় যাবেন।

ঐদিন শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী আশ্রমে আসেন। বাবার কোন শিষ্যের কাছে সংবাদ পেয়ে তাঁর আগমন। বাবার শরীর কৃশ হয়েছেন জেনে তাঁর উদ্বেগের সীমা নাই। তিনি সেবকদের মৃদু

তিরস্কার করেন, বলেন, "সেবকদের এরকম হওয়া উচিত নয়। বাবা যা বলবেন তাই অবনত মস্তকে মেনে না নিয়ে, আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও তাঁকে খাওয়াতে হবে। ২।৩ বার ফলের রস, অন্ন, এই রকম অন্ততঃ ৪বার খাওয়ালে শরীর ঠিক থাকবে।" বাবার সম্বন্ধে এক ঘণ্টার ওপর আলোচনা ক'রে দূর থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তিনি বিদায় নেন। সেবকেরা তাঁকে শঙ্কর মঠ অবধি অনু-গমন করতেই ডাক পড়ল। বাবা ব্রহ্মচারীজীকে আহ্বান করেছেন। (তাঁর আগমন সংবাদ বাবাকে দেওয়া হয়েছিল।)

ছুটে ছুটে আশ্রমে ফিরে আসা হ'ল। তাঁর সঙ্গেও বাবার লিখে লিখে আলাপ হয়।

ব্রহ্মচারী। আপনি এত কৃচ্ছ্র তপস্যা করে শরীর পাত কেন করছেন? প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর চলে গেছেন, আপনিও কি আমাদের কাঙাল করতে চান?···আমি সকাতর অনুরোধ করছি শরীরের প্রতি একটু লক্ষ্য করুণ।

বাবা। দু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে দেখালেন, সীতারাম এত খায়।

ব্রহ্মচারী। শরীরে কি আছে! এত কঠোরতা কেন করছেন? শতা-ধিক গ্রন্থ লিখেছেন, লক্ষ লক্ষ লোককে উপদেশ দিয়েছেন 'কেবল নাম কর, তাতেই সব হবে। "তবে কেন আবার নিজে মৌন নিয়ে এত তপস্যা করছেন? মৌন নেন, আপত্তি নেই। মৌন নিলে শরীর বিশ্রাম পায়। আমি তাই আপনার মৌন পছন্দ করি। প্রভু জগদ্বন্ধুও মৌন থাকতেন।

বাবা। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরও যে খুব কম আহার করতেন!

ব্রহ্মচারী। খুব কম আহার করতেন বটে, কিন্তু সময় সময় প্রচুর আহার করতেন।

বাবা। এই মৌন ২৬ বৎসর কাল চলছে। মৌনের সময় রোগা হয়ে যাই। আবার সেরে উঠি। মৌন কালে ঠাকুর বই লেখান। দর্শন করে যথেষ্ট আনন্দিত হলাম, অপার কৃপা তোমার।

ব্রহ্মচারী। (হেসে)। আমাদের অত বিনয় নাই। আপনি যা ইচ্ছা বলছেন! আর একটি কথা—ভবিষ্যতে কারো প্রার্থনায় সভা সমিতিতে যাবেন না। প্রথমতঃ দর্শনার্থী-দের ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি! দ্বিতীয়তঃ সকলেই ডাকবে, আপনি কত প্রার্থনা পূরণ করবেন! আর ঘোরাঘুরি চলবে না। মৌনে বরং শরীর বিশ্রাম পায়।

বাবা। জীবনের এ অবস্থায় (অর্থাৎ মৌনে) কখন (কোথাও) যাই নি।...বাধ্য করলেন।...(নতুবা) সীমা লঙ্ঘন করি না।

ব্রহ্মচারী। আমার নিবেদন কিছু ফলের রস ছানা ইত্যাদি রোজ গ্রহণ করবেন। অন্ততঃ ৪ বার ক'রে আপনাকে খেতে হবে।

বাবা। সীতারাম স্বাধীন নয়। শরীর আহার নিতে চায় না। তবে সীতারাম দুর্ব্বল নয়।

ব্রহ্মচারী। অন্তর্ব্বল অবশ্য আছে।

বাবা। (কায়দা করে ব্রহ্মচারীর হাত দুটি ধরে ইঙ্গিতে জানালেন)। পারবে? (অর্থাৎ লড়াই করতে বা পাঞ্জায় হারাতে)

[উপস্থিত সকলের উচ্চ হাসি। ব্রহ্মচারীজিরও প্রাণভরা হাসি। বাবার মুচকি হাসি—মুখে হাত ঢেকে, যাতে মৌন ভঙ্গ না হয়।]

ব্রহ্মচারী। আপনি ছাড়া বর্তমান জগতের আর কোন আশ্রয় নাই। আপনি আমাদের অনাথ করে চলে যাবেন না—এই আমার প্রার্থনা। আপনি আজীবন শাস্ত্র মেনে চলেছেন, শাস্ত্রে আছে কলির পরমায়ু ১২০ বৎসর। এই শাস্ত্র বাক্য আপনাকে সত্য করতে হবে। ১২০ বছর থেকে শাস্ত্র যে সত্য আপনাকে তা প্রমাণ করতে হবে।···আমার একমাত্র প্রার্থনা আপনি এই শাস্ত্র বাক্য রক্ষা করুণ।

বৈষ্ণব মহা সম্মেলনের প্রথম দিনের (অর্থাৎ ১৬ই জুলাই তারিখের) অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত ক'রে বৈষ্ণব মহাজনের প্রার্থনা পূরণ করেন। তার তিন দিন আগে (অর্থাৎ ১৩ই জুলাই, ২৮শে আষাঢ়) পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত জগন্নাথ দর্শন করেন। সকাল ৬ টায় পাণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ রিক্সা নিয়ে আসেন। বাবা তাঁকে পাশে বসিয়ে সেই রিক্সা রওনা হল। সেবকেরা নাম সহ অনুসরণ করেন। মন্দিরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে বাবা ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দিরে আসেন; মন্দিরের সেবক তাঁর কণ্ঠে অতি সুন্দর একটি মাল্য অর্পণ করেন। জগন্নাথ দর্শনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকায় বাবা মন্দিরের নীচে বসেন, তাঁকে ঘিরে তাঁর সন্তানগণ নাম কীর্ত্তন করতে থাক। ঘণ্টা খানেক পরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রে তিনি পশ্চিম দরজা দিয়ে অখণ্ড নাম মণ্ডপে উপস্থিত হ'ন। মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সেরে সাধু রামচরণজীর ধুনির দিকে এগুতে থাকেন। সাধুজী উঠে এসে তাঁর কণ্ঠে একটি সুন্দর মাল্য অর্পণ করেন। বাবা তাঁকে

আলিঙ্গন করেন। তিনি বাবাকে আসনে বসিয়ে তাঁর পবিত্র তনু ভস্মলিপ্ত করেন।

রিক্সায় বসে বাবা লেখেন, "লোকনাথ যাব।" মাইল দুই দূরে উমাপতি লোকনাথকে দর্শন করে আশ্রমে ফিরে আসেন; লেখেন, "কাল কখন ঠাকুর রথে উঠবেন? কখন রথ টান?" পাণ্ডাজী বলেন, "নাগাদ ২॥০ টা।" "কাল রথে জগন্নাথ দর্শনে যাব। সীতারামকে চুপি চুপি নিয়ে যাবেন," এই কথা লিখেই কুটিরে প্রবেশ ক'রে দ্বার রুদ্ধ করে দেন।

পর দিন বিকেল তিনটেয় পাণ্ডাজী বাবাকে নিতে আসেন। কিন্তু ভক্ত ও সেবকদের প্রসাদ নেওয়া তখনও বাকী। তাই শীঘ্র প্রসাদ গ্রহণ সেরে বাবাকে নিয়ে মন্দির আসার নির্দেশ দিয়ে পাণ্ডাজি চলে যান। প্রসাদ পেতে পৌনে চারটা হ'ল। বাবাকে রিক্সায় নিয়ে সেবক ও ভক্তের দল মন্দির অভিমুখে রওনা হ'ল। বাবা রথ দেখতে যাবেন এই বার্ত্তা জানি না কেমন করে প্রকাশ পাওয়ায় শতাধিক ভক্ত সকাল ১০টা থেকে এসে আশ্রমে ৫।৬ঘণ্টা প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁদের রথ দেখার বাসনা ছিল না, বাবার দর্শনই ছিল একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। বাবা রিক্সায় বসতেই সকলে রথ টানার মত রিক্সাকেই টানতে থাকেন। মায়েরাও রিক্সার পিছনে আসছিলেন; সংখ্যায় তারা ৩০।৪০জন হবেন। বাবার নির্দ্দেশে নামের দল (অর্থাৎ পুরুষের দল) থেকে বেশ কিছুটা পিছনে আসছিলেন।

বিস্ময়ের বিষয় তখন সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রথটান পড়েনি। বাবা আসতেই অসংখ্য কাংস্যধ্বনি সহ অযুত কণ্ঠে হরি ধ্বনি উঠতে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে বলরামের রথটান শুরু হয়।

তারপর বাবা জগন্নাথদেবের রথের সামনে এসে তাঁকে দর্শন করেন। সুভদ্রার রথ টানা শুরু হবে বলে বাবার সঙ্গে ভক্তেরা একপাশে দাঁড়ান। সপ্রেম মহামন্ত্র কীর্ত্তন চলতে থাকে। বাবার শুভাগমনে সমবেত নরনারীর চিত্তে আনন্দের প্লাবন উপস্থিত হয়। প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী, ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণব-শিরোমণিগণ ও রথতলায় বাবার দর্শনে উল্লসিত হ'ন। কেহ কেহ চামর দিয়ে বাবাকে ব্যজন করেন।

সুভদ্রার রথ মাসীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হবার পর জগন্নাথ দেবের রথটান আরম্ভ হয়। বাবা ইঙ্গিতে জানান, আশ্রমে ফির-বেন। তাঁর আদেশে সেবকগণ জগন্নাথের সামনে নাম করতে করতে অগ্রসর হ'ন।

আশ্রমে ফিরে আসার পথে পূজ্যপাদ শ্রীল দ্বিজপদ গোস্বামী বাবাকে দর্শন করেন ও তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপের সুযোগ প্রার্থনা করেন। বাবা তাঁকে পরদিন আশ্রমে আসবার কথা লেখেন। গোস্বামী মহোদয়ের কল্যাণে আবার বাবাব দর্শন লাভের সৌভাগ্য হবে শুনে সেবকগণ আত্মহারা হ'ন।

১৬ই জুলাই, অর্থাৎ ৩০শে আষাঢ় সকাল ৯টায় শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ গোস্বামী মহোদয়ের শুভাগমন হয়। বাবার কুটিরে ঢুকে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তিনি বলেন, "আর কেন এত মৌন আছেন? সারাজীবন কঠোর তপস্যা করে এসেছেন। সাধনায় যে অমৃত সঞ্চয় করেছেন দেশবাসীকে পান করিয়ে উদ্ধার করে দিন। জগতের এই দুর্দ্দিনে মৌন না থেকে দেশবাসীকে সত্যপথে চালিত করুন।

বাবা লিখে লিখে উত্তর দেন' "নিজের জন্য মৌন কে বললে? এ মৌনে জগতের কল্যাণ হবে। ঠাকুর যে কাজ দিয়েছিলেন উপস্থিত

সেভাবে না করিয়ে অন্যভাবে করাতে চান—সীতারাম যন্ত্র মাত্র।”

গোস্বামীজী। কার সাধ্য আপনাদের লীলা বোঝে। আপনি যে জগৎ কল্যাণই করছেন একথা ঠিক। কিন্তু জিহ্বোপস্থপরায়ণ কলির জীবদের মাঝে মাঝে দর্শন না দিলেই বা চলে কি করে। তবে মৌন-কালে অমৃতময় অতি অপূর্ব্ব সব গ্রন্থ রচনা করেন এই পরম লাভ।

বাবা। দ্বারকা মৌনে কয়েক খানি বই হয়েছে। তার মধ্যে দুটি নাটক আছে—একটির নাম “অশ্রুবাদল,” অপরটি “রণছোড়”।

(সেবক হরিসাধনকে লিখে নির্দ্দেশ দিলেন।) রণছোড় অশ্রুবাদল ছাপা হলে দিবি।

হরিসাধন। ডাঃ দীনবন্ধু দাদা রণছোড মগরা থেকে ছাপাচ্ছেন, ছাপা শেষ হয়েছে দেখেছি শীঘ্রই এখানে আসবে। আর ‘অশ্রুবাদল’ ছাপার কাজ চলছে।

বাবা। ‘শ্রীশ্রীব্রজনাথ লীলামৃত’ নামে কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে একখানি বই হয়েছে। পৃথিবী পাপের ভারে প্রপীড়িতা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ব্রহ্মার কাছে যান’ এখান থেকে আরম্ভ, কৃষ্ণ উপাসক দিগের জন্য লীলাচিন্তার আধারে লেখা হয়েছে।

গোস্বামীজী। আপনার জীবনী আমি পাইনি। আমার অত্যন্ত আবশ্যক।

বাবা। কেন সীতারামের বই তুমি পাওনি? তোমার কাছে কি কি বই আছে?

গোস্বামীজী। রামেন্দু দিয়েছে কতকগুলি, তারমধ্যে জীবনী নাই।

বাবা। জীবনী এখন বোধ হয় আর নেই বিক্রী হয়ে গেছে, তবে রামেন্দুর কাছে সব বই আছে পড়তে পারবে।

গোস্বামীজী। ঐযে কৃষ্ণ উপাসকদিগের কি বই বললেন আমরা চাই।

বাবা। ব্রজনাথলীলামৃত ছাপা হয়নি।

গোস্বামীজী। আপনি এবার প্রধানমন্ত্রী জহরলালকে ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এই পথে আকর্ষণ করুন। তাঁরাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাঁদের ধর্মের দিকে আকর্ষিত না করলে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবেনা।

বাবা। সীতারাম যন্ত্র তিনি (শ্রীভগবান) যেমন করবেন (হবে)। যেদিন প্রয়োজন হবে অবশভাবে তারা এদিকে ঢলে পড়বেন। যাঁর জগৎ তাঁরা তাঁরই দান,—তাঁরা তাঁরই যন্ত্র। বর্ত্তমানে রাজসিক।…বিভিন্ন রাজশক্তিকে একত্রিত করবার জন্যই ঠাকুর তাঁদের নিয়ে এভাবে লীলা কচ্ছেন তাঁরা যন্ত্র মাত্র, খেলছেন —ঠাকুর।

গোস্বামীজী। আমার আর একটি প্রার্থনা—আপনি শতাধিক বর্ষ থেকে কলির কবল হত মানুষকে রক্ষা করবেন। আপনি কি ইচ্ছা করেন ? কতদিন এই জগতে থাকবেন ?

বাবা। ঠাকুর যতদিন রাখেন। "তোমার গৌরসুন্দর নাটক" ৩য় ৪র্থ খণ্ড পাইনি। বাবাজী মহারাজের জীবনী ১ম খণ্ড পাইনি মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড পেয়েছি। চরিতসুধা আগে সংগ্রহ করে পড়েছিলাম।

গোস্বামীজী। কেন আপনাকে ত গৌরসুন্দর পাঠিয়েছিলাম।

বাবা। ছেলেরা (তো) দেয়নি। জীবনী ২য় খণ্ড কার্সিয়াং

এ পড়েছিলাম; কার্সিয়াংএ পেয়েছি। *বাবাজী মহারাজের (সীতারামের প্রতি) ভালবাসার সীমা নাই। বোধ হয়—১৩৫৭ সালে নীলাচল আশ্রমে চাতুর্মাস্য হচ্ছে। তিনি প্রায়ই যেতেন (পুরাতন নীলাচল আশ্রমে)। একদিন হরিদাস বাবার সমাধি মন্দিরে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—"হরিদাস বাবা তিনলক্ষ নাম জপ করতেন,—কিন্তু এটা (সীতারাম) ২ বার ৩বার জপও করতে পারেনা—জপ বন্ধ হয়ে যায় একি ব্যাপার? তিনি বলেন —সেও এক অবস্থা আর এও এক অবস্থা।

গোস্বামী। কি রকম বুঝিয়ে লিখুন। ২।৩ বার জপ করতে পারা যায়না কেন?

বাবা। বন্ধ হওয়া অর্থে—(২।৩ বার নাম জপ করলেই) ওঁকার আবির্ভূত হন্।

গোস্বামীজী। আমাকে আপনি কৃপা করুন্ যাতে এ জীবন ধন্য হয়ে যায়। আমার ত কিছুই হল না।

বাবা। যে গাছে নৌকা বেঁধেছ কিছু ভাবতে হবেনা হবেনা হবেনা। নিজের মাথায় কর্ত্তৃত্ব এনোনা।

গোস্বামীজী। দ্বাদশ খণ্ডে "গৌরসুন্দর" শেষ হবে, এখন মাত্র ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন বাসনা পূর্ণ হয়। ৺শ্রীগৌরসুন্দরের লীলামৃত সম্পূর্ণ যেন ভক্ত নরনারীদের উপহার দিতে পারি।

বাবা। শ্রীমৎ হরিদাস গোস্বামী বাবার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত আছে সেখানি দেখো। কেন ভাবছ? যাঁর কাজ তিনি করিয়ে নেবেন। আপনা আপনি স্ফুরিত হবে।

---

* অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের

বর-কনে (অধ্যাপক রামেন্দু দত্ত অধ্যাপিকা বাণী দত্ত) ভাল আছেত ? তাদের ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ দিও। নদীয়া নাগর সম্বন্ধে কিছু করেছ ?

গোস্বামীপাদ। হাঁ-কি করা হবে ? নিতাই সুন্দর পত্রিকায় ২।৩টি লেখা ক্রমশঃ চল্‌ছে। কয়েকমাসের মধ্যে ২।১ টা শেষ হবে তা হলে পত্রিকার নববর্ষ থেকে দিতে পারা যায়—না স্বতন্ত্র ছাপার ব্যবস্থা হবে ?

বাবা। "নিতাই সুন্দরেই" দিও। সেই বইখানি ভদ্রেশ্বরের ছেলেদের দিয়ে দিয়েছি, তার আয় ব্যয় তাদের। (তারাই বহুবার অভিনয় করেছে।)

(হরিসাধনকে) তুই বাবাকে* বল্‌বি বাবা যেন এ সম্বন্ধে দ্বিজপদবাবার সঙ্গে কথা কয়।

গোস্বামীজী। আপনি ত বইটি বাবাজি মহারাজের নামে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ থাকবে ত ?

বাবা। যখন (পুস্তকাকারে) ছাপা হবে বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তি থাকবে উৎসর্গ পত্র থাকবে।

গোস্বামীজী। আপনি মৌনেই বেশী সময় থাকেন, দর্শন পাওয়া ভাগ্যে ঘটেনা, আবার কবে দর্শন পাব ?

বাবা। সীতারাম (মৌনে) জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেনা এসব জগন্নাথের কাণ্ড, কাল রাত্রির থেকে সংস্রব শূন্য হবে।

গোস্বামীজী। কাল বাবাজী মহারাজের জীবনী দিতে আসব দর্শন মিলবে ত ?

বাবা। কাল দিনের দিকে আসতে পারো। বৈষ্ণবমহা-

---

* শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়

সম্মেলনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাবার জন্য গৌরকিশোর বেদান্ততীর্থবাবা বলে গেছেন ফিরে এসেই সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করব। আর গুরু পূর্ণিমায় একবার ছেলেদের দেখা হবে। অনেকে কলিকাতা থেকে আসবে।

এর পরের কথাবার্ত্তার বিবরণ দিতে পারলাম না কারণ—বাবার শ্রীহস্তের লেখা কাগজগুলি না পাওয়ায়। বাবা গোস্বামীজীকে একদিন আশ্রমে প্রসাদ পাওয়ার কথা বলেন। তারপর গোস্বামীজী বাবাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলে গেলেন আবার কাল আসব।

সকাল অর্থাৎ ১৬ই জুলাই ৩১শে আষাঢ় রবিবার আবার আসেন। সেবকেরা সকলেই নিত্য কৃত্যাদি সেরে প্রতীক্ষা করছেন যে কখন সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসবে, কখন গোস্বামীজী এবং তাঁর কৃপায় আবার কখন বাবার শ্রীবিগ্রহদর্শনে নয়ন তৃপ্ত হবে। বেলা ৯টা নাগাদ শ্রীশ্রীরামদাসবাবাজী মহারাজের কৃপাধন্য শ্রীমৎদ্বিজপদ গোস্বামীজী এলেন। সঙ্গে এসেছেন তাঁর বন্ধু পি. এম. বাকৃচী পঞ্জিকার প্রধান গণক (জ্যোতিষী) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ জ্যোতিষার্ণব।

সাড়ে ৯টায় বাবা দরজা খুলতেই তাঁরা ঘরে ঢুকে বাবাকে প্রণাম করে বাবারই দেওয়া আসনে কুণ্ঠিতচিত্তে বসলেন। গোস্বামীজী পরম ভাগবত রামদাস বাবাজী মহারাজের জীবনী ১ম খণ্ড বাবাকে দিতেই বাবা মস্তকে ঠেকিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন। গোস্বামীজী বাবাকে জানালেন, ইনি আমার পরম বন্ধু পি. এম. বাকৃচী পাঁজির গণক। বন্ধু হলেও উভয়ের মত ভিন্ন।”

তখন জ্যোতিষীমশাই করযোড়ে নিবেদন করলেন আপনিই

বাংলায় একমাত্র আছেন যিনি সকলেরই কল্যাণ কামনা করেন। ইনি (গোস্বামী) আগে আমাদের মত মানতেন আমাদের দিকেই ছিলেন। এখন সুসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মানছেন। আপনি কৃপা করে নির্দ্দেশ দিন ও বলুন কোন্ পাঁজি ভাল, কোন মত ঠিক।

গোস্বামীজী। পি. এম্ বাকচী গুপ্তপ্রেসের গণনার নানাবিধ ভুলভ্রান্তি দেখে আমরা এই নিভু'ল পঞ্জিকার ব্যবস্থা করেছি। আমি এবিষয়ে বাবাজী মহারাজের শরণ নিই, তিনি এই পাঁজিতে স্বাক্ষর করেছেন।

জ্যোতিষীজা। আমাদের পাঁজি সম্বন্ধে বাবাজী মহারাজ কি বলেছেন পরে বলছি, আপনি মহাপুরুষ, আপনি সত্য মিথ্যা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, অতএব আপনি বলুন।

বাবা। 'গুরুদেব'—গুপ্তপ্রেস, পি. এম্ বাকৃচি মেনে গেছেন। পূজ্যপাদ কেদার পণ্ডিত মশাই (কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ) মানছেন। পূজ্য ৺যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ মেনে গেজেন। সীতারাম তাই সহসা পি. এম বাকৃচী গুপ্তপ্রেস 'মত' ত্যাগ করতে পারছে না। উপরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করছি।

জ্যোতিষীজী। আনন্দে উল্লসিত হয়ে গদগদ স্বরে বললেন —ঠিক্ ঠিক্। এই কথা বাবাজী মহারাজও বলেছিলেন। সত্য বলে এতদিন মেনেছি হঠাৎ অসত্য বলা যায় না, সত্যকে বুঝ্তে হবে।

বাবা। সত্য বোঝা শুধু নয়, সাক্ষাৎ সত্যদর্শন। (বাবা ভাবে ও ইঙ্গিতে বোঝান—প্রত্যক্ষ সত্য দর্শনের পর মেনে নেওয়া হবে) জ্যোতিষীজী—হাঁ হাঁ ঠিক বলেছেন।

বাবা আবার লিখলেন—**সাক্ষাৎ সত্যদর্শন চন্দ্র সূর্যের মত,**

যেদিন এরূপ দেখ্‌বো সেদিন পুরাতন মত ত্যাগ করবো। **মনের খেয়াল নয়, (সত্য) আকাশে ফুটে উঠবে**]

গোস্বামীজী। ওঁদের গণনার (তিথি নক্ষত্র সময়ের) ভুল আছে, আমাদের গণনা বিশুদ্ধ। নিজেরাই ত মান্‌বো, ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌বো, কাজেই ভ্রান্তি ত্যাগ ক'রে নিজেদের গণনা বিচার বিশুদ্ধ জেনে তবে বলছি। এই মত এখন অনেকেই মানছেন।

গোস্বামীজী আরও বর্ণনা ক'রলেন—রাধারমণ চরণদাসজীর কাছে তাঁর পাঁজি সম্বন্ধে প্রার্থনা ও কোন এক উপায়ে তাঁর অনুমোদন লাভ এবং বাবাজী মহারাজের আশীর্ব্বাদ (স্বাক্ষর) লাভ করার কাহিনী।

একথা শুনে বাবা লিখেন—"যাঁরা গণক তাঁরা এখনও সত্যদর্শী কিনা জানিনা, তাঁদেরও ভুল ভ্রান্তি ত হতে পারে।"

তারপর বাবা তাঁর হাতের পেন্সিলটি দিয়ে পূর্ব্বের লেখাটি দেখালেন,—সীতারাম তাই সহসা পি. এম্‌ বাক্‌চী ও গুপ্তপ্রেস মত ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছেনা। **উপরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা কর্‌ছি**……।

—পাঁজির প্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

তারপর মহেন্দ্রনাথ জ্যোতিষার্ণব বললেন উনি—হস্তরেখা বিচার খুব ভাল করতে পারেন। রেখা দেখেই জন্মতিথি-মাস বলে দিতে পারেন, বাবা সঙ্গে সঙ্গে হাতটি পেতে দিলেন গোস্বামীজীর সাম্‌নে। গোস্বামীজী বললেন—ফাল্গুন মাসে 'জন্ম' মনে হচ্ছে। জন্ম বোধ হয়-শুক্লপক্ষে, চতুর্দ্দশী তিথি কি ?

উত্তর। না।

গোস্বামীজী। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তা হলে ?

উত্তর। না।

গোস্বামীজী। ঠাকুরের হস্তরেখার একটি ফটো আমাকে দিলে আমি নির্ভুল বিচার করে পাঠাব। জন্মভূমি—মাতুলালয়ে হবে।

বাবা। মাতুলালয়ে জন্ম ১২৯৮ সাল ৬ই ফাল্গুন বুধবার ইংরাজী ১৮৯২ সাল ১৭ই ফেব্রুয়ারী জন্মতিথি কৃষ্ণাপঞ্চমী। কোন সেবক বলে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাবার জন্মতারিখ, মাস, বার ইংরাজী বাংলা দুইই এক।

জ্যোতিষিজী। আপনি ছক দিতে পারেন? আমি তাহলে বিচার করে পাঠাব।

বাবা তৎক্ষণাৎ ছকটি এঁকে দিলেন—

জ্যোতিষী মহাশয় বাবার হাতটির রেখা আবার দেখতে লাগলেন—রেখাতে দেখা যায় পূর্ণায়ুঃ, শতাধিক বর্ষ থাকবেন। ছকে লগ্নে লগ্নপতি গুরু (বৃহস্পতি) ও শুক্র শোভমান,—ইহা অত্যন্ত শুভপ্রদ। সাধারণ মানুষের এরকম হয়না। দুই গুরু গ্রহ আবার মীনস্থিত শনিচন্দ্র কর্ত্তৃক পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত।

জ্যোতিষীজী বাবার "শ্রীহস্ত এবং ছক্" উভয়ই দেখেন ও বলেন রাহু বৃষস্থ সর্ব্বরিষ্ট নাশক কিন্তু ভ্রাতৃস্থানে রাহু সেজন্য ভ্রাতৃহানি কারক। শনি হেতু পত্নী বিয়োগ হইয়াছে (ভাষা ঠিক মনে নাই।)

বাবার শ্রীহস্তে স্পষ্ট শঙ্খ পদ্মাদি চিহ্ন জ্যোতিষী মহাশয় দেখলেন। বাবাও কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন কৃপা করে দেখান। বাবা তাঁর শ্রীহস্তে আঁকা ছকুটি জ্যোতিষীর হাতে দিয়ে লিখলেন—"১২৯৮, **৬ই ফাল্গুন বুধবার কৃষ্ণাপঞ্চমী ৮।২৫ মিঃ জন্ম সময়। (জন্ম) গঙ্গাতীর কেওটা হুগলী (জেলা) মামারবাটী। মঙ্গল ঠিক মনে নাই।'**

বাবা। স্তবকুসুমাঞ্জলি খানা আন্। স্তবকুসুমাঞ্জলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল বাবা ঠিকই দিয়েছেন।) তুমি জাত চক্র নিয়ে যাও—বিচার করে নীলাচল আশ্রম চটক পর্ব্বত পুরীধাম (ঠিকানায়) পাঠাবে।

পূজনীয় গোস্বামীর প্রার্থনায় বাবা তাঁর নামপ্রচারের বিবরণ কিঞ্চিৎ লেখেন, সেগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল : "১৩৪৩ সালে সমস্ত কর্ম্মের অবসান হয় মন্ত্রাদি চলে যায়, ডুমুরদহে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মৌন নিয়ে বসি। স্বপ্নে গুরুদেব বলেন নাম প্রচার করতে হবে, বাণী আসে ঋষি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়। মৌন ত্যাগ করে পুরী এসে ১৩ই চৈত্র নামপ্রচার করে স্বর্গদ্বারে স্বর্গধামে মৌন নিয়ে বসি—ওসব নয় স্বপ্ন বা বাণী নয় যদি নামপ্রচার কারবার ইচ্ছা থাকে স্বয়ং এসে বল, হয় এস, নয়—জীবন যাক্। ব্যবস্থা থাকে প্রথম সপ্তাহে হবিষ্য, দ্বিতীয় সপ্তাহে ফলদুধ, তৃতীয় সপ্তাহে শুধু দুধ নেব। উত্তর সাধকদের বলে সর্বসঙ্গ ত্যাগ করে মৌন নিই। তারপর দর্শন দেন, কোন মন্ত্র তখন ছিল না, কেবল নাদ ছিল, দক্ষিণ কর্ণের কাছ থেকে মাথার মাঝখান্ পর্য্যন্ত ছোট ছেলেপুলের পায়ে দিয়ে নাচলে যেমন শব্দ হয় তেমন "নাচ্" চলতে থাকে, সে নাদ শুনতে শুনতে বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, গোল জ্যোতির মধ্যে 'জগন্নাথদেব' দেখা দিয়ে নাম প্রচারে আদেশ দেন—"যা যা নাম দিগে যা।" ১৩৪৪ সালের ১০ই কি ১১ই বৈশাখ। সেই পর্য্যন্ত চলছে।"

জ্যোতিষীজী গোস্বামীজী বাবার শ্রীহস্ত রেখার বিচার করে পাঠাবার জন্য ফটো তুলে পাঠাতে বললেন। কিঙ্কর সেবানন্দ এইদিন শ্রীশ্রীবাবার হাতের অনেকগুলি ফটো তোলেন, কিন্তু রেখা স্পষ্ট হয়নি।

বেলা প্রায় ১২ টার সময় গোস্বামীজী ও জ্যোতিষীজী প্রণাম করে বিদায় নেন।

বিকেল ৫টার পরেই নিখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ থেকে বাবাকে নিতে আসেন। বাবা তাঁর কুটির থেকে বাইরে এসে তাঁর শ্রীগুরু মূর্ত্তির সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চোখ বুজে করযোড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মৌনে বাবা আশ্রমের বাইরে যান না, সেজন্য বোধ হয় শ্রীশ্রীপরমগুরু দেবের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিরাট নামের দল সাজান হ'ল, সঙ্গে রইল জ্বলন্ত আশ্বাস, অভয়বাণী প্রভৃতি প্রচার পত্র। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী তাঁর মটরগাড়ীতে নিয়ে যাবার কাতর প্রার্থনা করলেও বাবা রিক্সায় বসলেন। পাছে ভক্তহৃদয়ে ব্যথা লাগে সেজন্য বাবা আবার লিখলেন—"বৈষ্ণব মহা সম্মেলন থেকে ফেরার সময় তোর গাড়ীতে আসব।"

অগণিত কণ্ঠোচ্চারিত হরেকৃষ্ণ নামের ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়। ভক্ত সেবকগণ নামীকে কাছে পেয়ে প্রাণ ভরে নাম গান করে ধন্য হন। কি অপূর্ব নাম! রাজপথের উভয় পার্শ্বের অগণিত নরনারী বালক বালিকা শুনে বিস্মিত হয়ে নির্বাক নিশ্চল অবস্থায় সে অপূর্ব দৃশ্য ও মধুময় নাম শ্রবণ করেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাবা শ্রীশ্রীগৌর গম্ভীরার কাছে উপস্থিত হয়ে নেমে দূরে থেকে গম্ভীরার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। সমুদ্র গর্জ্জনের মত নামের গর্জ্জন শুনে গম্ভীরার মহান্ত বৈষ্ণবগণ বাবার শুভাগমন হয়েছে অনুমান করে বেরিয়ে এসে সাদরে বাবাকে ঘিরে ভেতরে নিয়ে যেতে থাকেন। অগণিত ভক্ত নর নারীর দল ছুটে এলেন করুণা ঘন মূর্ত্তি আমার বাবাকে দর্শন করবার জন্য। বাংলার মত ঠেলাঠেলি সুরু হয়ে গেল অবশ্য কিছু কম। প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী এবং

তৎপুত্র শ্রীমদ্ বিনোদ কিশোর গোস্বামী ও গম্ভীরার মহান্ত শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসমহারাজ প্রভৃতি বাবাকে সভা স্থানের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। বাবা তুলসী প্রদক্ষিণের পর পাশের মন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তে সভাভবনে উপস্থিত হয়েই বৈষ্ণব মহাজনদের দিকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। সশঙ্কিত বৈষ্ণবগণ বাবার সামনে থেকে দূরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলেন, অনেকে দণ্ডবৎও হলেন। প্রভুপাদ গোস্বামীজী বাবাকে সভাপতির নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়ে বাবার কণ্ঠ, মস্তক ও জটা মাল্যাদির দ্বারা সুন্দর রূপে সাজালেন। অনেক বৈষ্ণবগণ বিবিধ মালা পরিয়ে বাবাকে তাঁদের অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। যাঁরা কাছে আসতে পারলেন না, তাঁরা, দূর থেকেই বাবার করুণাঘন সৌম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করত অন্তরের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানান। মাল্যাদির পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার উদ্বোধনে বৈষ্ণব সাধন রহস্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন পুরীরাজগুরু প্রভুপাদ শ্রীরঙ্গনাথ দেব গোস্বামীজী। তিনি আজকের এই মহতী সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভাগমনের উল্লেখ করে বলেন—সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথজীকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছেন, বৈষ্ণব মহাসম্মেলন সার্থক হয়েছে তাঁকে আজ সভাপতিরূপে বরণ করে। আমরাও অনেকে শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথজীর পবিত্র কীর্ত্তি এতদিন শুনেই এসেছি, দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি, বিশেষতঃ আমি আজ দর্শন করে প্রভূত আনন্দ পেলাম।

এই সভায়—শ্রীমদ্ বিনোদকিশোর গোস্বামী এম্-এ, শ্রীমদ্ দ্বিজপদ গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ মিশ্র সাহিত্যভূষণ, ডক্টর মহানামব্রত-ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী, প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

প্রভৃতি ভাষণ দান করেন। শ্রীমদ্ দ্বিজপদ গোস্বামী এবং শ্রীমদ্ ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বাবার ত্যাগ তপস্যা ও জীবোদ্ধারলীলা বর্ণনা করেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বলেন হরিনাম যে মাত্র কলির উপায় তা নয়, সর্বযুগেই হরিনাম একমাত্র গতি। শ্রীনারদ ত সব সময় হরিনাম কীর্ত্তন করেনই তাছাড়া নানাযুগে—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, মহাবীর বিদুরাদি ভক্তগণ একমাত্র শ্রীহরিনাম স্মরণেই ধন্য হয়েছিলেন। তাহলে "নাস্ত্যেব" এই উক্তি শুধু কলিতে নয়, সবযুগেই প্রযোজ্য; হরিনাম বিনা গতি নাই বল্‌লেই ভাল হত।

এই মহতী সভায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের 'এমার মঠের' মহান্ত ও সাধুগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ বিনোদ কিশোরের ভাষণ শুনে বাবা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ইনি প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীজীর পুত্র। সকলের ভাষণ শেষে রাত্রি প্রায় ৯ টায় বাবার রচিত "নামাবতার" আদিষ্ট হয়ে পাঠ করেন শ্রীহরিসাধন। 'নামাবতার' গ্রন্থে কলির একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। সেই চিত্র আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিতে ঋষিগণ বলে রেখেছেন—"কলিতে অনেক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বর্জ্জিত হয়ে কর্ম ভ্রষ্ট হবে বেদ বিক্রয় করবে, যেখানে সেখানে যার তার হাতে যা-তা ভোজন করবে, মানুষ উদর সর্বস্ব হয়ে দেহকে আত্মা মনে করবে, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচার পালনে তৎপর হবে, ধর্মকর্মে অর্থব্যয় না করে মানুষ রাশি রাশি টাকা খরচ করে বড় বড় বাড়ী তৈরী করবে। 'স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা' হবে, তারা শ্বশুর শাশুড়া ও স্বামীর দ্রোহ আচরণ করবে। নরনারী গুরুজনকে অবজ্ঞা করবে, পুত্র পিতামাতার সেবা ও ভরণ পোষণ করবে না,

পুরুষ কামকিঙ্কর হবে। "স্বীকার এব চোদ্বাহ" স্বীকার করাই (রেজেষ্ট্রী) বিবাহের কারণ হবে,...ইত্যাদি।

বাবার রচিত এই গ্রন্থের পাঠ শুনে অনেকেই সেগুলির যাথার্থ্য সবিস্ময়ে অনুভব করেন। এই দারুণ কলিযুগে মানুষের একমাত্র উপায় যে নাম এই পুস্তকে তা বেশ ভালভাবে প্রতিপন্ন আছে। কলিপীড়িত নরনারীদের উদ্ধারের জন্য তাঁর "নামাবতার" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। পাঠ শেষ হতেই বাবা তাঁর সেই বইখানি প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীজীকে উপহার দিলেন। উড়িয়ায় ছাপান—"নামাবতার" বই অনেক বিতরণ করা হয়। সর্ব-শেষে সকলকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন প্রভুপাদ প্রাণকিশোর বেদান্ততীর্থ মহাশয়।

সভাশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে স্পর্শ প্রণাম করবার হুড়োহুড়ি পড়ে। প্রভুপাদ তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে—বাবা মৌন আছেন প্রণাম নেবেন না। তবু কি তাদের বোঝানো যায়। বাবার ইচ্ছায় মহান্ত বৈষ্ণবগণ ধীরে ধীরে বাবাকে গম্ভীরায় নামকীর্ত্তন মণ্ডপে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে বৈষ্ণবগণ রাজপথ পর্য্যন্ত বাবার অনুগমন করে বাবাকে গাড়ীতে বসিয়ে বিদায় নিলেন।

রাত্রি তখন প্রায় ১১টা। গোবিন্দ চৌধুরীর গাড়ীতে বাবা ফিরে আসেন। বৈষ্ণবগণের সঙ্গে চৌধুরীদার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বাবা বলেন, এর চেষ্টায় বহরমপুর গঞ্জামে একটি অখণ্ড নাম চল্‌ছেন।

নামকীর্ত্তনকারী দাদারা দীর্ঘ সময় ধরে বাবাকে এই মৌন সময়েও পেয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে নাম গান করতে করতে আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হন। স্বর্গদ্বারের কাছে বাবার গতি রোধ করলেন—ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি, ডি-লিট্

মহোদয়। তাঁর ঐকান্তিকী প্রার্থনা—বাবা প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আশ্রমে অল্পসময়ের জন্যও যান। ভক্তের প্রার্থনায় বাবা সম্মত হ'ন। তাঁদের আশ্রমে আসতেই তিনি বাবাকে প্রভু জগদ্বন্ধুর একটি বাঁধান ছোট্ট ছবি দেন, সাগ্রহে সেখানি নিয়ে তাঁর শ্রীমস্তকে রক্ষা করার পর হরিসাধনের হাতে দিলেন। আশ্রমে আসতে সাড়ে এগারটা হল। সেবকগণ দূর থেকে প্রণাম করে বাবার সঙ্গ আবার কবে পাওয়া যাবে এই চিন্তায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবা তাঁর কুটিরের দরজায় খিল দিলেন।

গুরু পূর্ণিমায় আবার দর্শনলাভ হবে এই প্রত্যাশায় বুক বেঁধে ভক্তগণ নিজ নিজ কর্ম্মে মন দিলেন।

ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে ঠাকুরটি মৌনাবস্থাতেই গুরু-পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দর্শন দেন। এই কৃপা অভাবনীয়। বাঙ্গলা দেশ থেকে তিনশোর বেশী লোক এই সুযোগ গ্রহণ করে কৃতার্থ হ'ন। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও যথেষ্ট ভক্তসমাগম হয়।

সেদিন সকাল ১০ টায় বাবা পরমাগুরুদেবীকে প্রণাম ক'রে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, চরণামৃত পান ক'রে বাইরে দক্ষিণ দিকে সন্তানদের দর্শন দিতে আসেন। সকলে স্পর্শ প্রণামের অনুমতি পায়। পরমা গুরুদেবীকে একটি মঞ্চের ওপর বসিয়ে তাঁর পাশে ঠাকুর আসন গ্রহণ করেন। ভক্ত নরনারীরা পর্য্যায়ক্রমে তাঁর কাছে এসে মাল্য ও পুষ্পাঞ্জলি দান ও স্পর্শ প্রণাম করেন। তিনি লিখে লিখে অনেকের প্রশ্নের উত্তর দেন। মধ্যাহ্নে আটশো লোক অন্নপ্রসাদ নেন।

অপরাহ্ণেও বাবা সকলকে দর্শন দেন। তাঁর আদেশে পরাপর গুরুদেব শ্রীমদ্ দামোদরদাসজীর জীবনী শ্রীহরিসাধন পাঠ করে শোনান।

রাত্রে সত্যনারায়ণ পূজা ও পাঠ হয়। সকলে ঠাকুরের সিন্নি প্রসাদ পান।

১৯শে আষাঢ় ১৩৬৮ তাঁর একটি সঙ্কল্প-লীলা প্রকাশিত হয়। সকাল ১০টায় তাঁর ঘর থেকে একটি পত্র এল, "এখন এদিকের স্থানের বিঘা বা কাঠা কত দরে বিক্রয় হয় তা জেনে নিয়ে শঙ্কর দীনবন্ধু দেবযানে বিজ্ঞাপন দিক, নীলাচল আশ্রমের স্থান বিক্রয়ের জন্য। আমরা নীলাচল আশ্রমের যে ঘর আছে তার রুজু রুজু রাস্তা পর্য্যন্ত স্থান বিক্রয় করব না, তাহলে আশ্রম রাস্তা থেকে আড়ালে পড়ে যাবে, গুরুধামের দিকের জায়গা বিক্রয় করা হবে। সীতারামের বাবা বা মায়েরা নেয়, সীতারামের এই ইচ্ছা, তা হলে একটি ধর্ম্মময়ী পল্লী গড়ে উঠবে, পঞ্চাশ বা ততোধিক বয়স্কগণ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক সস্ত্রীক বাস করে জীবন ধন্য করতে পারবেন। এরূপ প্রস্তাব আগে উঠেছিল।"

আজ সকাল ১১টার সময় হঠাৎ ঠাকুর বাইরে এলেন, দক্ষিণ দিকের বালুর ঢিপির ওপর—সমস্ত স্থানটির চারিদিক নিরীক্ষণ করলেন। কোথা দিয়ে রাস্তা আরম্ভ হয়ে কোথায় শেষ হবে—স্থির করবার জন্য সরকারী রাস্তায় উপস্থিত হলেন।

ঠাকুর জানালেন, এই আশ্রম স্থানটি যখন কেনা হয় তখন ১৫ হাজার প্রথম দর দেয় ভুজেন সরকারকে। ভুজেন জানায় সীতারামের জন্য আশ্রম হবে ; তখন ১০ হাজার টাকা মূল্য দেয়। ভুজেন সরকার এই আশ্রমে দশ হাজার টাকা দেয়। তারপর সারাবার জন্য ৫ হাজার দেয়। পরে খাজনা কমাবার জন্য ৫ হাজার টাকা দেয়। জমি ও মোট ব্যয়িত অর্থ ভাগ কর্। জমির দরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে। সীতারামের ধ্যানের স্থান (যেখানে ঠাকুর জগন্নাথ দেবের দর্শন ও

ও আদেশ পান) তিন হাজার টাকা চায়। তা হলেও এ স্থানের মর্য্যাদা আছে—বাড়বে।

ঠাকুর জানালেন, আমাদের মন্দির, নাট মন্দির যা করা হবে তা রাস্তার রুজু রুজু, তা হলে বাঁকা দেখাবে না। রাস্তার দুপাশ ফুল বাগান হবে।

প্রশ্ন করলেন—দিগসুইয়ের মন্দিরের ভিতরটা কত হবে?

জনৈক শিষ্য—অনুমান ভিতর ১০ হাত, ভিত ১॥০ করে ৩ হাত, বারান্দা ৪ হাত করে আট হাত।

ঠাকুর লিখলেন—"মাপ, চার ধারে ২৫ হাত করে" (মাপ করা হল)

ঠাকুর—সমিতিতে মন্দির তা'হলে অনেক বড়? আজই পত্র দিয়ে জান।

ঠাকুর পরে আশ্রমের ভিতর এলেন, জানালেন, তোরা একটা মুটামুটি এক কাঠার মূল্য কত, তাহা জানিয়ে দে দেববাবে। (জমি বিলির কথা)

এর আগে বোধ হয় সত্য সরকার, মনোজ, তারাশঙ্কর জায়গার প্রার্থনা করেছে।

২০-৮-২০, শনিবার—বেলা ১২টা ঠাকুর হঠাৎ সকলকে ডেকে পাঠালেন—পরমা গুরুদেবী আজ বাংলা ফিরবেন সন্ধ্যার ট্রেনে।

ঠাকুর লিখলেন—একটা বিশেষ পরামর্শ আছে। এ জায়গা ও পূর্ব্ব আশ্রম শঙ্করকে দিয়েছি, এখন কি ভাবে তাকে দেওয়া হবে—আইন মত লেখাপড়া হয় তার ব্যবস্থা কর। তাকে দিয়েছি সে আইনমত যাতে মালিক হয় সে ব্যবস্থা আগে কর।

বিলি জমির একটা দর স্থির করতে বললেন। এবং জানালেন

এর খাজনা নেওয়া হবে না। আগে এ জমির ৩২৫৲ খাজনা ছিল। ৫ হাজার টাকা দিয়ে খাজনা বাৎসরিক ২৭৲ করা হয়েছে।

এখানকার দর ধর। যারা নিচ্ছে তারাও তোরা। এই জমি বিলি করে ঠাকুরের মন্দির করা হবে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হবে। কাজেই যারা জমি নিচ্ছে তারা অন্য মন্দির করার সময় হাজার হাজার টাকা ঢেলেছে।

তারপর ঠাকুর লিখে জানালেন। বৌদি (পরমা গুরুদেবী) এসে মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ গোবিন্দ প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই সঙ্কল্পের রূপায়ন অতি সত্বর শুরু হ'ল এবং তার ফলে নীলাচল আশ্রমের রূপই ক্রমশঃ পাল্‌টে গেল। কিন্তু থাক সে কথা। আরও কত লীলার প্রকাশই যে এ মৌনে হ'ল।

যথা: বাণীবিলাস। সব মৌনেই গ্রন্থ রচনাই তাঁর মুখ্য লীলা। কিন্তু এই মৌনে যে লেখা হ'ল সে তো আদৌ লেখা নয়, নিছক অবতরণ। স্বতঃ অবতীর্ণা তাঁর বাণীর প্রবাহ দুই তরঙ্গে "বাণীবিলাস" নামে বিধৃত এবং প্রকাশিত হ'ল। আর দুটি গ্রন্থরত্ন এই মৌনে আত্মপ্রকাশ করলেন: "পুরুষোত্তম" এবং "শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম লীলা"। প্রথমটি অভিনব সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ের অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্বচ্ছ আলোকে সব মত এবং পথের এমন সুষ্ঠু সমন্বয় অভাবনীয়, অতুলনীয়। দ্বিতীয়টির দুই অংশ, "ঘোর বিকার" এবং "মহামুষ্টিযোগ"। পূর্ব্ব খণ্ডের উপনীত বর্তমান যুগের সকল জালা যন্ত্রণার মূল ব্যাধির যথাযথ নির্ণয় দ্বিতীয় খণ্ডের উদ্দেশ্য সেই মহাব্যাধির অতি সহজ অথচ অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দেওয়া। মূল গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ইংরাজী ও সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল। মূল বাঙ্‌লা

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নামে, হিন্দী সংস্করণ তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ড়ঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নামে, ইংরাজী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নামে এবং সংস্কৃত অনুবাদ ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের নামে উৎসর্গীকৃত।

পুরীর মৌনের আর এক মহামহিমময় অবতরণ "আর্য্য-শাস্ত্র" মাসিক পত্র। এটিও সত্যিকারের "অবতরণ"। এই নব সুর-ধুনীর ভগীরথ শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজীর মন্ত্রশিষ্য "সুদর্শন" সম্পাদক শ্রীমৎ শিশির কুমার ব্রহ্মচারী। বাঙ্‌লায় শাস্ত্র-গ্রন্থের আত্যন্তিক অভাব এবং ক্রমিক বিলুপ্তি লক্ষ্য করে এই তাপস প্রবরের পবিত্র চিত্তে ব্যথা জাগে। মহাষ্টমীর শুভ তিথিতে তিনি ঠাকুরটির কাছে পত্রযোগে তাঁর প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করেন। তারই পরিণাম "আর্য্যশাস্ত্রের" আবির্ভাব।

জয়গুরু পাক্ষিক মিলন পত্রের ৫ম বর্ষ ,৯ম সংখ্যায় (২৬শে কার্ত্তিক ১৩৩৬) প্রকাশিত ব্রহ্মচারী শিশির কুমারের পত্র, তদুত্তরে ঠাকুরটির ভক্ত ও শিষ্যগণের প্রতি পত্র এবং তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বিরক্ত সন্তানের লিখিত নিবেদনটি স্মরণীয়।

ব্রহ্মচারী শিশির কুমারের পত্র

৺৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীচরণকমলে শত সহস্র দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

বাবা! আজ মহাষ্টমীর পুণ্য দিনে আপনার কৃপাশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রন্থগুলি পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

বাবা! আপনি শাস্ত্র মূর্ত্তি বলিলে যথার্থই বলা হয় মনে করি। এত শাস্ত্র আপনি পড়িয়াছেন,—ভাবিতে গেলে বিস্মিত না হইয়া

উপায় নাই। ডাঃ মহানামজীর সঙ্গে এ বিষয়ে কত কথাই কিছু দিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। বাবা! আজ একটি প্রার্থনা নিয়ে শ্রীচরণ সমীপে উপনীত হইতেছি—এ শুধু আমার একার প্রার্থনা নহে,—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু মাত্রের এই প্রার্থনা।

আপনি ছাড়া এমন কাউকে দেখিতেছি না যাঁর নিকট এই প্রার্থনা করা চলে। একদা পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্নের কৃপায় শাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থই বঙ্গ ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সমস্ত গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ পুরাণের একখানাও ছাপা নাই, বিংশ সংহিতার একখানাও ছাপা নাই, কত নাম করিব? সবই আপনি অবগত আছেন।

বাজারে সম্পূর্ণ ভাগবত নাই, ইহা বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের পক্ষে কলঙ্ক নয় কি? এই কলঙ্ক কালিমা দূর করিবার মতন শক্তিমান পুরুষ ত আর দেখিতে পাই না। আপনার কৃপাদৃষ্টি এদিকে পতিত হইলে আবার সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় গ্রন্থ বহু দিন যাবৎ অপ্রাপ্য, এর চাইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আপাততঃ ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ যাতে অনতিবিলম্বে ছাপা আরম্ভ হয়, আপনি তদ্রূপ আদেশ দানে, বাংলার শাস্ত্রজিজ্ঞাসু নরনারীকে কৃপাশীর্ব্বাদে কৃতার্থ করুন, এই প্রার্থনা আপনার শ্রীচরণকমলে জ্ঞাপন করিতেছি। বাংলা অনুবাদ এবং সেই সঙ্গে উভয় গ্রন্থেরই শ্রীধর স্বামীর টীকা সঙ্গে থাকিলে ভাল হয়। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে—গ্রন্থের মূল্য যাতে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে না যায়। দেশের সমস্ত পণ্ডিতসমাজ আজ আপনার কৃপাপ্রার্থী—কাজেই,

আপনার আদেশ পাইলে তাঁহারা অবশ্যই এই কার্য্যে উৎসাহিত হইবেন এবং ব্রতী হইবেন, এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই নাই।

ভাগবত মূল সহ অনুবাদ যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হওয়া চাই। শ্রীধর স্বামীর টীকা দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ অনুবাদ সহ মূলই আগে বাহির হউক। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধেও এই কথাই।

এ সম্বন্ধে আপনার কৃপাদেশ শীঘ্রই অবগত হইব এই প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে যদি এ সম্বন্ধে কিছু করিবার থাকে আদেশ দানে কৃতার্থ করিবেন।

বাবা! আবার বলিতেছি আপনি শাস্ত্রমূর্ত্তি, কাজেই শাস্ত্রপ্রকাশ আপনার দ্বারাই সম্ভব, তাই আমার এই প্রার্থনা যথাস্থানে করিয়াছি বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস।

এই পত্রবাহক শ্রীযুক্ত শান্তি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতেই আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রন্থগুলি পাইলাম। যিনি এই মহাদান হাতে করিয়া নিয়া আসিয়াছেন তিনিও আমাদের নমস্য। কারণ তা না হইলে তাঁহার হাত দিয়া এতবড় দান আমার কাছে আসিবে কেন?

বাবা! শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস ত হইল না, আপনার কৃপাতেই তাহা হওয়া সম্ভব। অতএব বিনীত প্রার্থনা দয়া করুন।

আপনি সবই জানেন বলিয়া আর কি বুঝাইব। দয়া করিয়া এই অধমের যাতে শ্রীগুরু শ্রীভগবানে ভক্তি বিশ্বাস হয় তাহা করিবেন। এই প্রার্থনা নিবেদন করিয়া মহাষ্টমীর এই পুণ্যদিনে আমার শত-সহস্র দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

প্রণতঃ

ব্রহ্মচারী শিশির কুমার

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ জীউর শিষ্য ও অনুরক্ত-গণের প্রতি লিখিত পত্র :—

ওঁ

চটকপর্ব্বত
শ্রীক্ষেত্র
প্রেমকুঞ্জ

শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহেষু,

বাপ্ সকল তোরা প্রেমময়ের প্রীতি জান্‌বি। ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে মৌনকালে বিষ্ণুপুরাণখানি পুনর্মুদ্রণ করবার জন্য শ্রীজীব দাদার কাছে শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত পাঠাই। তিনি দেখে দিবেন লেখেন, অদ্যাপি কোন বিশেষ সাড়া পাইনি। পুনরায় তর্করত্ন মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়,—দিয়েছেন।

যাক্, শ্রীমান্ শিশির কুমার ব্রহ্মচারীর এক পত্র পেলাম, তিনি শাস্ত্র রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

তাঁর প্রার্থনায় অন্তর্য্যামী এভাবে সাড়া দিলেন, যেমন গীতা প্রেস থেকে 'মহাভারত' নামক একখানি মাসিক পত্র কয়েক বৎসর যাবৎ বেরুচ্ছে। (মূল এবং ভাষা টীকা সহ) মহাভারত, হরিবংশ, জৈমিনী ভারত রামায়ণ বেরিয়ে গেছে।

গত বৎসর হনুমান বাবাকে উপপুরাণগুলি বের করবার কথা লিখি—তিনি কোন উত্তর দেননি।

গীতা প্রেসের 'মহাভারতের' মত আমাদের একখানি মাসিক পত্র 'সনাতনশাস্ত্র' 'আর্য্যশাস্ত্র' বা "শাস্ত্রভগবান্" যে কোন নামে

একখানি মাসিক পত্র বের করা হোক্। প্রথমে রামায়ণ, পরে মহাভারত হরিবংশ এইভাবে ক্রমে বেরুতে থাকুক। আমরা বঙ্গানুবাদ প্রায় সমস্ত তর্করত্ন বাবার পাব। মহাভারতের অনুবাদ কালী সিংহ বা বর্দ্ধমান রাজবাটীর নিলে চল্‌বে, যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ এর দ্বারা করিয়ে নিতে পারেন।

শ্রীনবদ্বীপের ঠাকুর, শ্রীশ্রীকুমার বাবা, শ্রীসদানন্দ বাবা, শ্রীতারক বাবা, শ্রীবসন্ত বাবা, শ্রীনলিনী রঞ্জন সেন বাবা, শ্রীচিন্ময়ানন্দ বাবা, শ্রীতুষারকান্তি বাবা, শ্রীতরুণকান্তি বাবা, শ্রীআনন্দবাজার-সম্পাদক বাবা, শ্রীযতীন্দ্রবিমল বাবা, শ্রীসুনীতি বাবা, শ্রীগৌরানাথ শাস্ত্রী বাবা, শ্রীশ্রীজীব দাদা, শ্রীকান্তি দাদা, শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী বাবা, শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য বাবা, শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য বাবা, কাঁথি সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত বাবারা, শ্রীঅনন্ত তর্কতীর্থ বাবা, শ্রীশিশির বাবা, শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী বাবা, শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী বাবা, শ্রীউদ্বোধন-সম্পাদক বাবা, শ্রীউজ্জীবন-সম্পাদক বাবা, শ্রীঅরুণ দত্ত বাবা (প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ), শ্রীরঞ্জিৎ বাবা, শ্রীবিরল 'বাবা, শ্রীবিজয় বাবা, শ্রীগোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ দাদা (নবদ্বীপ), শ্রীমদ্ অসীমানন্দ (শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম), শ্রীলালমোহন বাবা, শ্রীভারত সেবাসঙ্ঘ-সম্পাদক বাবা, শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বাবা, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বাবা, শ্রীহরিচরণ স্মৃর্তিতীর্থ বাবা, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন বাবা, হনুমান প্রসাদ বাবা (গীতাপ্রেস), শ্রীচিমনলাল বাবা, শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্য বাবা, শ্রীসত্যেন বাবা, শ্রীরমাপ্রসাদ বাবা, শ্রীফণীন্দ্র বাবা, (ভারতবর্ষ), শ্রীবসুমতী-সম্পাদক বাবা, এ ভিন্ন আর যে সব

ধর্মপ্রাণ শাস্ত্রবিশ্বাসী বাবারা আছেন—আমরা ক'জনকে চিনি বা জানি—সম্ভব মত তাঁদের কাছে তোদের কথা নিবেদন কর্‌বি, একটি সভার আহ্বান করতঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বি। শ্রীআনন্দময়ী মা ও শ্রীমোহন বাবাকে জানিয়ে তাঁদের আশীর্ব্বাদ নিবি।

তারপর যদি সকলের অভিমত হয় তাহলে বিধান বাবাকে জানাবি। আমরা জানি বিধান বাবা দেবভাষা (সংস্কৃতকে) বড় ভালবাসেন। আমাদের যা কিছু সব সংস্কৃত ভাষায়—আমাদের ইহলোক পরলোক কিভাবে জয় করা যাবে, কিভাবে চল্‌লে মানুষ প্রকৃত মানুষ হবে, মানুষ দেবত্ব লাভ কর্‌বে, ঈশ্বরত্ব লাভে সমর্থ হবে, ব্রহ্মত্ব লাভ কর্‌তে পারবে সে সমস্ত শাস্ত্রে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে যে কেহ তার অনুষ্ঠানের দ্বারা কৃতার্থ হতে পারেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সঙ্কীর্ণবর্ণ সকলের পথের কথা শাস্ত্র সুন্দরভাবে বলেছেন। শুধু অনুষ্ঠানের অভাবে সকলে যন্ত্রণা পাচ্ছেন। "শাস্ত্রের কথা" উপন্যাস উপকথা নয়,—সম্পূর্ণ সত্য, মহাসত্য—এ কথা আমরা উচ্চকণ্ঠে বল্‌বো; শুধু বলবো না, প্রত্যক্ষ করিয়ে দিব যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়।

আমরা আর্য্য, বেদাদি শাস্ত্র আমাদের প্রাণ, এখনো শিরায় শিরায় সেই আর্যঋষিগণের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। "শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান্।" আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলে অবশ্যই তাঁর কৃপা লাভ করবো, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের পুণ্য আশিস্‌ধারা আমাদের মাথায় অজস্রধারে বর্ষিত হবে।

কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে এ শাস্ত্রপ্রচার সীমাবদ্ধ করা হইবে না—বাংলা ভাষা অভিজ্ঞ ভারতবাসী-মাত্রই এর অনুমোদক ও রক্ষক হবেন।

যদি এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তাহলে সমস্ত কাগজ-গুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, নিবেদন আর্য্যশাস্ত্র রক্ষার জন্য শাস্ত্র ভগবান বা সনাতন শাস্ত্র (যে নাম অভিমত হবে সেই নামে) একখানি মাসিক পত্র বের করা হবে।

বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ ১৫৲ টাকা। যিনি গ্রাহক হতে চান তিনি নাম ঠিকানা পাঠাবেন। মাত্র লেখার দিক্‌দর্শন করলাম, যেমন সঙ্গত হয় লিখ্‌বি; লাভের কোন কথা থাকবে না, মাত্র মুদ্রণের খরচই মূল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হবে।

বহুদিন পূর্ব্বের কথা—একদিন ভাটপাড়ায় তর্করত্ন মহাশয়ের কাছে গেছি বোধ হয় ১৩২৯ সালে পূজার পর হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কি পড়? বলি ভাগবত। তিনি বলেন, ভাগবত ভাল গ্রন্থ, কিন্তু **ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য শাস্ত্ররক্ষা**। তিনি শাস্ত্র বড় ভাল-বাসিতেন। আমরা জ্ঞানোদয়ের পর হতে তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করতাম, তিনি বড় ভালবাসিতেন। তবে এইটুকু মনে রাখ্‌তে হবে— **এর লক্ষ্য শাস্ত্ররক্ষা, শাস্ত্র বিক্রয় করে অর্থসংগ্রহ নয়।**

তিলকটীকাসহ রামায়ণ, নীলকণ্ঠ টীকাসহ মহাভারত, শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নীলকণ্ঠের টীকা সহ দেবী-ভাগবত বের করতে হবে।

ওঁ

ওঁ

৺৭শ্রীশ্রীজগন্নাথায় নমঃ

শ্রীনীলাচল আশ্রম
চটকপর্ব্বত
৺পুরীধাম

নিবেদন

নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে॥

শাস্ত্র ব্রহ্মা শাস্ত্র বিষ্ণু শাস্ত্র মহেশ্বর।
শাস্ত্রই পরম ব্রহ্ম শাস্ত্র চরাচর॥

আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুদর্শন-সম্পাদক শ্রীমৎ শিশির কুমার ব্রহ্মচারী দাদা বঙ্গানুবাদসহ উনবিংশসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রগুলি পুনর্মুদ্রণের দ্বারা রক্ষা করবার জন্য বাবাকে জানান। সেই প্রার্থনায় বাবা তাঁর অন্তঃপ্রেরণার কথা নিম্নোক্তভাবে জানিয়েছেন—

"তোরা সবাই মিলে 'আর্য্যশাস্ত্র' নামক একখানি মাসিক পত্র বের কর তাতে মাসে মাসে বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমনুসংহিতা, শ্রীঅত্রিসংহিতা, শ্রীবিষ্ণুসংহিতা, শ্রীহারীত, শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীউশন, শ্রীঅঙ্গিরা, শ্রীযম, শ্রীআপস্তম্ব, শ্রীসম্বর্ত্ত, শ্রীকাত্যায়ন, শ্রীবৃহস্পতি, শ্রীপরাশর, শ্রীব্যাস, শ্রীশঙ্খ, শ্রীলিখিত, শ্রীদক্ষ, শ্রীগৌতম, শ্রীশাতাতপ, শ্রীবশিষ্ঠ প্রভৃতি সংহিতাগুলি; শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমহাভারত, ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড, প্রভৃতি

মহাপুরাণ, এবং আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিব, ধর্ম্ম, দুর্বাসা, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশন, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মাহেশ্বর, পদ্ম, দেব, মহেশ্বর, মরীচি ও ভাস্কর আদি উপপুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসংহিতা, বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, গর্গসংহিতা প্রভৃতি সংহিতা সকল, তন্ত্রসার, মহানির্বাণতন্ত্র, গৌতমীয়, নীল, তোড়ল, গায়ত্রী, মাতৃকাভেদ, কামধেনু, বৃহন্নীল, কামাখ্যা, কঙ্কালমালিনী, নির্বাণ, ফেৎকারিণী, মন্ত্রকোষ, কুলার্ণব, রাধা উড্ডীশ, ক্রিয়োড্ডীশ, গুপ্তসাধন নিরুত্তর, জ্ঞানসঙ্কলিনী, গন্ধর্ব প্রভৃতি তন্ত্রসমূহ এবং সংস্কৃত কলেজে ও অন্যান্য পাঠাগারে অমুদ্রিত পুঁথি অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ সমুদয় ক্রমশঃ বের করতে আরম্ভ কর্।"

আমরা ভ্রাতৃগণ সহ মাত্র আর্য্যশাস্ত্রের মুদ্রণাদি ব্যয় নিয়ে তাঁর আদেশ পালনে উদ্‌যুক্ত হয়েছি। আর্য্যশাস্ত্রের বার্ষিকমূল্য সডাক—১৫ টাকা। গ্রাহক সংখ্যা অধিক হ'লে আমরা মূল্য এর চেয়ে কম করতে পারব মনে করি। যাঁরা শাস্ত্রভগবান ও বাবাকে ভালবাসেন তাঁরা অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ, 'দেবযান' মগরা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ—এইস্থানে নাম ঠিকানা প্রেরণ করত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হতে পারেন।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা হলে আগামী দোলপূর্ণিমা হতেই শাস্ত্র প্রকাশ আরম্ভ হবে।

অনন্তশ্রীবিমণ্ডিত সীতারামদাস ওঁকারনাথ মহারাজ-

শ্রীচরণাশ্রিত

কিংকর শুদ্ধানন্দ কিংকর সচ্চিদানন্দ

কিকর ধ্যানানন্দ কিংকর সেবানন্দ

কিংকর প্রণবানন্দ

তারপর আর্য্যশাস্ত্রের প্রকাশ উপলক্ষে ৭ই জানুয়ারী ১৯৬২ কলকাতার 'মার্ব্বেল প্যালেসে' এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় আর্য্যশাস্ত্র পত্রের সঞ্চালক যে বিবৃতিটি পাঠ করেন সেটিও বোধ হয় এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। জয়গুরু, ২৬শে পৌষ ১৩৬৮ থেকে সেই ভাষণটি এখানে উদাহৃত হ'ল :—

ওঁ

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ু-স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শাস্ত্রভগবান্ আত্মপ্রকাশ করবার জন্য কিভাবে লীলা করেছেন সভাস্থ সজ্জনগণের সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে সে কথা নিবেদন করবো। পূজ্যপাদ বাবা ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে ৺পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ দেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারকব্রহ্ম নাম প্রচারে বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে শ্রীনাম প্রচার করতেন এবং মাঘমাসে মৌন নিয়ে তিন মাস পাঁচ মাস দশ মাস পনেরো মাস সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করে থাকতেন—তৎকালে তাঁকে উপলক্ষ্য করে শাস্ত্রভগবান্ বহু লীলা করেছেন। মৌনভঙ্গে আবার নাম প্রচার করতেন।

গত বৎসর চৈত্র মাসে তিনি কার্সিয়াংএ মৌন গ্রহণ করেন। আষাঢ় মাসে মৌন অবস্থায় বালিতে আসেন। তৎকালে আমাদের

লিখে জানান যে "নামপ্রচারের প্রেরণা আর নাই—'এর' (অর্থাৎ তাঁর) কাজ শেষ হল।"

এর আগেই মন্ত্র দান কে কে করবেন তাঁদের তপস্যা করিয়ে মন্ত্রগ্রাম দান করত মন্ত্রদানের অনুমতি দিয়েছিলেন—সেদিন ছয়টি অনন্তকালোদ্দিষ্ট অখণ্ড মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন আরো ৩।৪টি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অখণ্ড নাম কীর্ত্তন সংবাদ পত্র প্রভৃতি সমস্ত কাজ আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে মৌনাবস্থায় ৺পুরীধামে যান, রথযাত্রার পর সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করেন, গুরুপূর্ণিমায় দর্শনের জন্য প্রার্থনা করায় কয়েক দিন দর্শন দেন।

তারপর সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করে যেমন চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করতেন সেইরূপ থাকেন—তৎকালে আমাদের ত্যাগী দাদারাও প্রায় দেখা পান না—আড়াল থেকেই সেবা করেন।

এইভাবে অবস্থান করার সময় তাঁর সাধনার এক উচ্চস্তর উপস্থিত হয়। তাতে ভস্মমাখা তিলক করা পূজা প্রণাম আদি কিছুই করবার সামর্থ্য থাকে না ; ঠাকুর তাঁর সব নিয়ে নেন, বিরক্ত দাদারা পত্র দেন পূজার সময় কেউ আসবেন না—বাবার দর্শন পাবার কোন আশা নাই। আমরা অনেকে পূজায় গিয়ে দর্শন করবার আশা পোষণ কর্‌ছিলাম—সে সংবাদে নিরাশ হয়ে পড়ি। এই সময় পরমাগুরুদেবী, পরমগুরুদেবের অগ্রজা, কন্যা প্রভৃতি তাঁর নিকট যান—পরমাগুরু-দেবীকে প্রতিনিধির দ্বারা পূজা প্রণাম করান এবং বাহিরে কিছুক্ষণ থাকতে লাগলেন। আমরা শুনলাম তিনি দর্শন দিচ্ছেন, আমাদের সংবাদ দিতে বলেছেন। আমরা আনন্দিত চিত্তে বহু গুরুভ্রাতাভগ্নী পূজার সময় তথায় উপস্থিত হয়ে তাঁর দর্শন লাভে কৃতার্থ হই।

এই সময় শ্রীমৎ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী দাদা শাস্ত্ররক্ষার জন্য তাঁকে একখানি পত্র দেন এবং ব্রহ্মচারীদাদার প্রার্থনায় তিনি কি অন্তঃপ্রেরণা পান আমাদের জানান—সে পত্র দুখানি আমরা প্রকাশ করেছি।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন বেলা অনুমান ১১।১১॥ আমরা সকলে শ্রীশঙ্করমঠে ছিলাম—বাবা ব্রহ্মচারী দাদার পত্র, তাঁর পত্র পড়্বার জন্য দেন—আমরা পড়ি শুনি, তিনি কে কে সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, কোষাধীশ, সংরক্ষক হবেন তাও লিখে দিয়েছিলেন, এবং পরাপর গুরুদেব-পুত্র ১০১৲ টাকা, পরমাগুরুদেবী ১০১৲ টাকা, গ্রন্থকোষ হতে ১০০১৲ টাকা এইভাবে শাস্ত্র প্রচারের সাহায্যের জন্য টাকার কথাও লিখে দেন। সেই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা অনুমান ১২৫০০ কি ১৩০০০ হাজার টাকা শাস্ত্রপ্রচারকল্পে দাদাদের কাছে পাই—অবশ্য তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেন।

পরে ভাটপাড়ার শ্রীজীব দাদাকে, কলিকাতার তর্কাচার্য্য দাদা ও নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত কেদার পণ্ডিতমশাইকে টেলিগ্রাম করা হয়। ক্রমে তাঁরা উপস্থিত হন, শাস্ত্রপ্রচার সম্বন্ধে স্থির হয়। পুনরায় আমাদের ত্যাগী দাদাদের নামে এক "নিবেদন" বের হয়—পর পর কি ভাবে শাস্ত্র প্রকাশ হবে তাতে লিপিবদ্ধ করিয়ে দেন।

তাঁরই আদেশে আমরা আপনাদের সব কথা নিবেদন করি এবং আজ আপনাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর আদেশে মত শাস্ত্রপ্রচারে সমর্থ হই।

এ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। আপনাদের নিকট বাবার প্রেরণার অনুকূল পরামর্শ প্রার্থনা করছি—কি করলে

বাবার আদেশে আমরা শাস্ত্রপ্রচারে সমর্থ হব তাও আপনারা বলে দিন।

* * *

যথাসময়ে আর্য্যশাস্ত্র আত্মপ্রকাশ শুরু করলেন। প্রথমে মনু-সংহিতার কিয়দংশ, তারপর ক্রমশঃ অন্যান্য সংহিতা, বর্ত্তমানে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত মাসে মাসে চলছে। মূল সংস্কৃত বাঙ্লা অক্ষরে, ও তার নিচে বঙ্গানুবাদ—এই ধারা অনুসৃত হচ্ছে।

এই মৌনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা—এটি "আর্য্যশাস্ত্রের" অবতরণের পূর্ব্ববর্তী ব্যাপার—ঠাকুরটির অবস্থান্তর প্রাপ্তি। তার ফলে তাঁর ভস্ম মাখা, তিলক করা, পূজা প্রণাম আদি কিছু করার সামর্থ্য রইল না। ভস্মের দিকে হাত বাডাতে গেলেই, তিলক করা বা প্রণামের উদ্যোগ করতে গেলেই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। পূজো করার ক্ষমতা তো বহু পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হয়েছিল; মন্ত্র উচ্চারণ করতে গেলেই ওঙ্কারে লয় হ'ত। সমাহিত হয়ে পডতেন; তবু এতকাল ঠাকুর দেবতাকে পুষ্প চন্দন দেবার রীতিটী রক্ষা করে আসছিলেন, এবার তা-ও গেল, সে ক্ষমতাও নিঃশেষ হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে তিনি সাধনার এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলেন। কিন্তু এহো বাহ্য। এতকাল যে তিনি ভস্মলেপন, তিলক রচনা, পূজা প্রণাম প্রভৃতি রক্ষা করতে পেরেছিলেন সেটিই আশ্চর্য্য। আজ যে এ সব অন্তর্হিত হ'ল তাতে বিস্ময়ের হেতু নেই। অবশ্য এই সবের অন্তর্ধানের-ও প্রয়োজন ছিল। যে প্রয়োজনে এতদিন এগুলি বলবৎ ছিল সেই প্রয়োজনেই এদের অন্তর্ধান হ'ল। এই অবস্থা যে আসে সেটি প্রত্যক্ষ করাতে হবে

তো! কিন্তু তার আগে এগুলির আচরণের শিক্ষাও দিতে হবে—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' নীতি পালন করা চাই। উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক: লোকশিক্ষা; মুখের কথায় নয়, দীর্ঘদিনে আচরণের দ্বারা শিক্ষা দান। আগে অনুষ্ঠান, তারপর অনুষ্ঠানের অতীত হওয়া: অনুষ্ঠানের বর্জ্জন নয়, অনুষ্ঠানের স্বতঃই স্খলন, অনুষ্ঠানের বিদায় গ্রহণ; অনুষ্ঠান পালনের দ্বারাই অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করা যায়—এই নীতিটি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর এই বিভিন্ন লীলাবিলাস। আজ যে লীলার ভূমিকায় পরিবর্তন এর কারণ তাঁর অনুষ্ঠান পালনের অভিনয়ের উদ্দেশ্য এতদিনে সংসিদ্ধ হয়েছে। এই সব নীতির প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা তাঁর লক্ষাধিক সন্তানের বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে, তাদের মধ্য দিয়ে এখন লোকশিক্ষার কাজ চলবে; তাই তাঁকে আর এ সবের দৃষ্টান্তস্থল হতে হবে না। এবার তাঁকে উচ্চস্তরের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, অনুষ্ঠান পালনের সার্থকতা প্রদর্শনের প্রয়োজনে, সাধনার ঊর্দ্ধগতির আদর্শ সংস্থাপনের জন্য। তাই লীলাময়ের লীলার এবংবিধ পরিবর্ত্তন।

পুরীর এবারের মৌনের অন্যতম অতি আকর্ষণীয় লীলা ছিল বিশিষ্ট ও উচ্চকোটির কয়েকটি সাধক সাধিকার সঙ্গে ঠাকুরটির মিলন। অন্ততঃ দুজন ধর্ম্মগুরুর সঙ্গে তাঁর মিলনের মাধুরিমা প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত থাকবে। তাঁদের একজন হলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীঅসীমানন্দ সরস্বতী ও অন্যজন পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীশ্রীদয়া মাতা।

পুরুলিয়া শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের শ্রীমদ্ অসীমানন্দ দেব

৪।১১।৬১ তারিখে পত্রযোগে ঠাকুরটিকে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রার সংবাদ দেন। পত্রে তিনি লেখেন :—

ওঁ গুরু

শ্রীচরণেষু,

নীলাচল পথে শুভ যাত্রায় আশিস্ পাইনু তব,
স্নেহ প্রীতি ভরা করুণার ধারা রচিল মহোৎসব।
বাহিরিনু পথে শ্রীনাম সহিতে পথের ধূলায় লুটি,
তোমার স্নেহের মধুর মাধুরী হৃদয়ে উঠেছে ফুটি।
করিও আশিস যেতে পারি যেন লুটিয়া পথের ধূলে,
নীলাচল নাথ কৃপা করে যেন ঠাঁই দেন পদমূলে।

স্নেহার্থী—অসীমানন্দ

২৪।৭।৬৮ তারিখে ঠাকুর এই উত্তর প্রেরণ করেন,

বিজয়কৃষ্ণের বিজয় ভেরী ধ্বনিত করিয়া সঘনে,
কলির কলুষ নাশিতে নাশিতে এস এস সখে সগণে।
দুরন্ত কলিরে করিতে শান্ত নাম রূপে ভগবান,
করিছেন লীলা, যন্ত্র আমরা, জেনেছি হে মতিমান্।
যন্ত্রী যে ভাবে বাজান তাঁহার এ সব জীর্ণ যন্ত্র,
বাজিবে সেভাবে এগুলি তাঁহার পরম পাবন মন্ত্র।

—ওঙ্কার

এই পত্রোত্তরের পর পক্ষাধিক কাল অতীত হ'ল। হঠাৎ একদিন সাড়ে এগারোটায়—সে দিন ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৮—নীলাচল আশ্রমের অদূরে নামের শব্দ শোনা যেতেই সেবকগণ

কৌতূহলী হয়ে বেরিয়েই দেখেন শ্রীমদ্ অসীমানন্দ দেব বহু ভক্ত শিষ্য সহ আশ্রমের অভিমুখে এগিয়ে আসছেন। ঠাকুরের কাছে এই শুভ সংবাদ প্রেরিত হল। সঙ্গে এঙ্গে ঠাকুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। উভয়ের দেখা হতেই অসীমানন্দজী প্রণাম করতে উদ্যত হ'ন, কিন্তু ঠাকুরটি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। এই মহামিলনের পরম পবিত্র দৃশ্য দেখে উপস্থিত ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা রইল না।

শ্রীমদ্ অসীমানন্দ মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের প্রশিষ্য, কিরণচাঁদ দরবেশজীর শিষ্য। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের সমাগত সকল ভক্তের চরণ ধৌত করতে নির্দেশ দিলেন। অসীমানন্দজীর শ্রীচরণ ধৌত করার পর ভাবস্থ অবস্থায় তাঁকে ঠাকুরের প্রেমকুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি প্রকৃতিস্থ হ'লে ঠাকুর তাঁকে ও তাঁর ভক্তদের জল খাওয়াতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁদের জল খাওয়ার পর বাবা "আজ এখানে প্রসাদ পাও, এর ইচ্ছা।" বাবা আগেই তাঁর সেবকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "এর ইচ্ছা তাঁরা প্রথম দিন এখানে প্রসাদ পায়।"

প্রসাদ গ্রহণের পর মাননীয় অতিথিরা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। পরের দিন বাবা আশ্রম-সেবক শুদ্ধানন্দদাকে লিখলেন, "আজ তোরা তাঁদের এখানে নিমন্ত্রণ করে আয়।" আহার্য্যের সূচিও বাবাই প্রণয়ন করলেন—শাক, ভাজা, চচ্চড়ী, ডাল, সুকৃতো, ডালনা, অম্বল, পায়েস, মিষ্টি প্রভৃতি। রাত তিনটে পর্য্যন্ত জেগে তরকারি কেটে রাখা হ'ল। বাবার আদেশ—ভোগ ১২॥টায় দিতে হবে। এদিকে আশ্রমে সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত পাঠের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থাও বহাল থাকবে। শুদ্ধানন্দজী বললেন, "তা কি সম্ভব হবে

বাবা ?" বাবা লিখলেন, "আমার ঠাকুর কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করে নেন তোরা দেখ্ না।"

যথারীতি পাঠ হ'ল। পাঠের পর ঠাকুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ৬টি উনুন ধরানোর ব্যবস্থা করলেন। তারপর জয় দিয়ে রান্না শুরু হ'ল। দয়া-মা (কুটাইদি), শুদ্ধানন্দজী, শ্যামানন্দ, পূর্ণানন্দ পাকে রত হলেন। ঠাকুর অধিকাংশ সময় উপস্থিত থেকে ব্যবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। রান্না যথাসময়ে শেষ হ'ল। এদিকে সশিষ্য অসীমানন্দজী মহারাজ এসে গেছেন। তাঁদের জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা বাবা করতে বললেন। "পাগলের খেয়াল" পাঠ হ'ল। অসীমানন্দজী পাঠ শুনে খুব প্রীত হলেন, বললেন, এর প্রত্যেক প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত "মন্দির" পত্রিকায় ছাপাবেন। ইত্যবসরে ভোগারতি শুরু হয়েছে, কাঁসর ঘণ্টা শোনা গেল। ঠাকুর পাঠ স্থগিত রাখতে বললেন। শ্রীমদ্ অসীমানন্দ বাবা ও তাঁর সন্তানদের আহার করিয়ে হাত ধোবার ও মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা করে বাবা তাঁর সন্তানদের আহার তখনও পর্য্যন্ত হয় নি বিবেচনা করে তাঁদের প্রার্থনায় নিজে প্রসাদ নিতে গেলেন।

সশিষ্য বাবা প্রসাদ গ্রহণের পর আবার মাননীয় অতিথির সঙ্গে মিলিত হলেন। বাবা লিখে প্রশ্ন করলেন, "আর কদিন আছ ?" তিনি জানালেন, "পরশু যাব।" বাবা লিখলেন, "কালও যদি এখানে প্রসাদ পাও ওঙ্কার খুসি হয়।"

১৯শে-ও তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ১১টায় এলেন। সেদিন ভজনের পর "বিশ্বজননী রমণী" ও "ঘোর বিকার" পাঠ হল। ঠাকুর ও স্বামীজীর সঙ্গে কিছু আলোচনা হল। স্বামীজী ফেরার অনুমতি চাইলেন। ঠাকুর তাঁকে এগিয়ে দিতে বেরুলেন। অসীমানন্দজী প্রণাম করতেই ঠাকুর নিজ অঙ্গ থেকে শীতবস্ত্রটি নিয়ে তাঁকে প্রেমভরে

পরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে জানালেন, "চিঠি দিয়ো।"

পিছু হাঁটতে হাঁটতে অসীমানন্দজী ফিরে যেতে লাগলেন। নির্ম্মম ঠাকুরটিও তাঁর প্রেমকুঞ্জের দিকে এগুলেন।

এই মিলনের অল্প কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী দয়ামার সঙ্গে ঠাকুরের মিলন। দয়া-মা সারা বিশ্বের যোগদা আশ্রমের অধ্যক্ষা ও সঙ্ঘমাতা। তিনি আমেরিকা-বাসিনী। ২০শে কার্ত্তিক ১৩৬৮ (৬ই নভেম্বর ১৯৬১) সন্ধ্যার আধঘণ্টা আগে তিনি বাবাকে দর্শন করতে আসেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতের সমস্ত আশ্রমের সেক্রেটারী শ্রীবিনয়েন্দ্র নারায়ণ দুবে, মাদার দয়ার সেক্রেটারী মাতা মৃণালিনী, শ্রী এলেন ব্রহ্মচারী (ইনিও অ্যামেরিক্যান, মৃণালিনী ও দয়ামাতার মতই), শ্রীউবে যোঙ্ক (জার্ম্মান ছাত্র), পুরী যোগদা আশ্রমের শ্রীহরিহরানন্দজী এবং শঙ্করাচার্য্য মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীশান্তিপ্রকাশ প্রভৃতি ৮।১০ জন।

দয়া মা, মৃণালিনী মা, এলেন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই সুন্দর সুন্দর মাল্য ও স্তবক দিয়ে বাবার শ্রীচরণ বন্দনা করেন। সকলেই ভারতীয় পদ্ধতিতে শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেন।

বাবার আজ্ঞামত কর্ম্মকুঞ্জের সামনে আসন পাতা হয়। বাবা তাঁদের আদর করে বসালেন। দয়া মা সহ সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বাবার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরা কখনও ঋজু ভাবে বসে দেখতে লাগলেন; কখনও চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যান করছিলেন; ধ্যানের পরক্ষণেই আবার বাবার শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে থাকেন।

বাবা লিখে প্রশ্ন করেন। "এ মা কে? কি নাম মা'র?"

শান্তিপ্রকাশ দা! ইনি আমেরিকা থেকে এসেছেন, যোগদা সৎসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট। এঁর নাম মাদার দয়া।

বাবা। এঁদের নাম কি?

শান্তিপ্রকাশদা বিনয়বাবুকে পরিচয় করিয়ে দিতে বললে তিনি একে একে প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করলেন।

বাবা লিখলেন : মা কি কিছু বলতে চান?

বিনয়বাবু বাবার কথা মাকে ইংরেজী করে বুঝিয়ে দিলেন। মা হাসতে হাসতে মৃদুস্বরে ইংরাজীতে বললেন, "বাবার উপদেশ শুনতে চাই।"

বাবা। মা কতক্ষণ থাকতে পারবেন?

হরিহরানন্দজী। এই আধঘণ্টা।

তখন বাবা লিখে লিখে অধ্যাত্ম তত্ত্ব যৎকিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটন করলেন। বিনয়েন্দ্রবাবু ইংরাজীতে অনুবাদ করে দয়া মাকে বুঝিয়ে দিলেন।

বাবা। আনন্দরাজ্যে পৌঁছবার দুটি প্রধান পথ। একটি বিচার, একটি যোগ। জগৎ সৃষ্টি হয়েছে শব্দ থেকে, জগতের মূল কারণ শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার। শ্রুতি বলেন—ওঙ্কারই পরাপর ব্রহ্ম। বর্ণজগৎ বা দৃশ্যজগৎ সবই ওঙ্কার।

দয়ামা মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালেন—হাঁ।

বিনয়েন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করে বাবা লিখলেন—তোমাকে 'দুটি কথা' বলে একটি বই দেবো। সেখানি অনুবাদ ক'রে মাকে শুনিয়ো।

বাবা। সেই শব্দব্রহ্ম ওঙ্কার দেহটিকে ধরে রেখেছেন 'পরা,' 'পশ্যন্তী' 'মধ্যমা,' 'বৈখরী' রূপে। পরা গুহ্যদেশে, পশ্যন্তী নাভিতে, মধ্যমা হৃদয়ে, মুখে বৈখরী। যে শব্দ আমরা জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করি তার নাম বৈখরী। জগৎ শব্দময়, বাণীই ভগবান্। এই

বাণীকে সংযত করতে পারলে মানুষ মূলকেন্দ্রে সহজে পৌঁছে যায়। শব্দের অনুলোমগতি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী ; বিলোমগতি— বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী পরা। পরাই হল সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা।

দয়ামা। ভক্তির দ্বারাই তো ভগবানকে লাভ করা যায়? ভক্তই ভগবানকে দর্শন করতে পারেন?

বাবা হাত নেড়ে নিষেধ করলেন—'শোন্'।

বাবা। কেমন করে তাঁর কাছে পৌঁছব? মন চঞ্চল, বিচারের শক্তি নাই, ইন্দ্রিয় সংযম করবার ক্ষমতা নাই, এ অবস্থায় ভগবানকে কি করে লাভ করতে পারি? গুরুদেব বললেন—তুমি কেবল নিরন্তর রাম রাম কর। মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ—'পাপ'। নাম করতে করতে পাপক্ষয় কতক হ'ল জিহ্বা কণ্ঠ শুদ্ধ হ'ল, বৈখরী থেকে নাম হৃদয়ে এলেন। হৃদয়ে অনাহত পদ্ম আছে, সেখানে স্বতঃই ধ্বনি হচ্ছে— চিন্ চিন্ চিনী, সমুদ্র গর্জ্জন, অগ্নিজ্বলন ইত্যাদি বহুবিধ ধ্বনি আছে; সেই ধ্বনি স্বতঃই উঠতে লাগলো। মেঘ, বাঁশী, বীণা, 'জয়গুরু' 'গুরুগুরু' 'ওঁগুরু' 'সোহং' এই শব্দনাদ শুনতে শুনতে আরও পাপক্ষয় হ'ল। ইষ্টদর্শনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগলো। জ্যোতির্ম্ময় ইষ্ট 'রাম' দেখা দিলেন, বর দিলেন। যে রামনাম জপ করছিলেন সাধক, সে নাম ইষ্টঅঙ্গে বিলীন হ'ল। রইলেন নাদাত্মক ওঙ্কার। যিনি ব্রহ্মোপাসক তিনি নাদ শুনতে শুনতে তাঁর পাপক্ষয় হ'লে তাঁর সুমুখে পরমাকাশ উপস্থিত হলেন, তাঁর অহং-জ্ঞানের লোপ হ'ল, তিনি পরমাকাশে লীন হ'য়ে গেলেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

দয়ামা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে একদৃষ্টে কখনও বা চোখ বুজে ধ্যান-মগ্না হয়ে যাবার উপদেশ শুনতে থাকেন।

বাবা। যিনি যোগী তিনি জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার উপাসক, তাঁর কাছে অপরিসীম জ্যোতিঃরূপে পরমাত্মা আবির্ভূত হলেন। যোগীর অহংজ্ঞান পরমজ্যোতিতে একীভূত হয়ে গেল, দ্বৈতজ্ঞানের লয়ে অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। একমাত্র অদ্বয় জ্ঞান আছেন—তাঁকে তত্ত্বজ্ঞগণ 'তত্ত্ব' বলেন, জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' বলেন, যোগিগণ 'পরমাত্মা' বলেন, ভক্তগণ 'ভগবান্' বলেন।

তাঁর কথা—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে," যাঁরা আমার যে ভাবে শরণাপন্ন হয় আমি সেইভাবে তাঁদের গ্রহণ করি। এক অদ্বয় জ্ঞানরূপ পরমব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞের কাছে তত্ত্বরূপে, জ্ঞানীর কাছে ভগবান্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এই সময় 'দয়ামা' 'ঈয়েস্ ঈয়েস্' শব্দ খুব মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল "ভক্ত ভগবানকে দেখতে পান?" তার উত্তর পাওয়ায় মা খুব আনন্দিত হন এবং হাসতে থাকেন।

বাবা। তত্ত্বের কোন ভেদ নাই, অধিকারী আপন আপন চিত্তানুসারে তাঁকে লাভ করে থাকেন। পশ্যন্তীতে দর্শন হ'ল, অখণ্ড নাদ চলতে লাগলো, নাদের সঙ্গে বিবিধ জ্যোতিও দেখা যায়। সেই নাদ শুনতে শুনতে সমাধি হয়ে গেল। শ্বাস রইল না, বক্ষের ক্রিয়া থাকলো না, জীবিত কি মৃত বোঝবার উপায় রইল না। এই হ'ল ভক্তিযোগ। হঠযোগী আসন প্রাণায়াম ক'রে শেষে নাদলাভ করেন। সেই নাদ অবলম্বনে সমাহিত হন। রাজযোগী লয়যোগীর চরম অবলম্বন—'নাদ'। 'নাদ' 'জ্যোতি' অতিক্রম করে কোন সাধনপথ নাই যা অবলম্বনে মানুষ পরমানন্দময় ভগবানকে লাভ করতে পারে।

নাদব্রহ্মই সকল সাধনার একমাত্র কাম্য। একই নাম "কুণ্ডলিনী" "ওঙ্কার" ইত্যাদি। যতক্ষণ নাদ লাভ না হবে ততক্ষণ বুঝতে হবে আমি 'সাধন' হতে দূরে আছি। নাদ আরম্ভ হলেই সকল ভাবনার অবসান হবে। তিনিই অবশ-ভাবে টেনে নিয়ে পরমানন্দে সম্মিলিত করে দেবেন, সাধককে আর কিছু ভাবতে হবে না। মা যেমন শিশুকে বুকে সতত রক্ষা করেন, তেমনি জাগরিতা কুণ্ডলিনী সাধককে বুকে করে নিয়ে গিয়ে পরমানন্দে সম্মিলিত করবেন। যিনি মিশতে চান মিশে যাবেন, যিনি আস্বাদন করতে চান আস্বাদন করবেন—কেউ চিনি হবেন, কেউ চিনি খাবেন।

মাদার দয়া একথা শুনে খুব উচ্চহাসি হাসেন। শ্রীশ্রীবাবা নীরবে মুখ চাপা দিয়ে খুব হাসেন. উপস্থিত দর্শনার্থীগণও তাতে যোগ দেন।

দয়ামা এই সময় বলেন—"ঠাকুরকে মনে হয় যে মিষ্টি গোপাল।" 'গোপাল' শব্দ বাংলাতেই যেন বলেন।

বাবা। 'ওঁগুরু' 'ওঁগুরু', কখন 'জয়গুরু' চল্‌ছে। কখন সোহং সোহং নাদ চলে, তখন সব স্থির করে দেয়। তারপর "ওম্—শেষে ম্ ম্ ম্ ম্, (হসন্ত 'ম' কার মাত্র থাকে।)

দয়ামা। আপনাকে দর্শন ক'রে উপদেশ শুনে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। বাবার (ঠাকুরের) বহুমূল্য সময় অনেক নিলাম, বাবার কোন অসুবিধা হয় নি ত?

বাবা। যাচ্ছিলাম ধ্যানগৃহে। তবে মা জানতে চাইলেন; এ অনুভূত সত্য; মার বেটা মাকে শুনিয়ে দিল। মা যা দিয়েছিস তাই নে।

মাকে বাবার এই কথার ইংরাজী শোনালে মা বাবার উদ্দেশ্যে মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দয়ামা। কাল বাবার কাছে ধ্যানে বসতে ইচ্ছে করছে। বাবা কাল কখন দর্শন দেবেন?

বাবা। মা কখন আসতে চায়?

দয়ামা। বেলা দশটা এগারটার সময়।

বাবা। দশটা পর্য্যন্ত বেরুই না। তারপর ভিড় হয়, সকালের দিকে হবে না। ৪॥। ৫ সাড়ে চার পাঁচটা।

বিনয়েন্দ্রবাবু। মা কালই এক্সপ্রেসে কলকাতা ফিরবেন। বিকেল মার সময় হবে না।

বাবা। মা কতক্ষণ বসতে চাস্?

দয়ামা। আপনি যতক্ষণ বসাবেন। ধ্যানে বসলে ৩।৪ ঘণ্টাও হয়ে যায়। যদি এক দেড় ঘণ্টা বসার সময় হয় হবে।

বাবা। সকালের দিকে ১০টার পর ভিড়। আচ্ছা ৮॥। ৯ টায় আসতে বল্।

তারপর বাবা উঠে দাঁড়ালেন। দয়ামা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করত প্রণাম করলেন। তারপর বাবার নির্দ্দেশে মায়ের জন্য গোটা ফলাদি উপহার দেওয়া হয়। বাবা রাত্রি হওয়ায় একটা 'হ্যাজাক্' নিয়ে মাকে যোগদা আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেন। বাবা স্বয়ং আশ্রমের শেষ সীমানা শঙ্করাচার্য্য মঠের কাছ পর্য্যন্ত মাকে এগিয়ে দিয়ে যান। পরে দয়ামার অনুরোধে আশ্রমে ফিরে আসেন।

এর পরের দিন অর্থাৎ ২১শে কার্ত্তিকের ইতিবৃত্ত: ৮॥টায় দয়ামা, বিনয়েন্দ্রবাবু প্রভৃতি কালকে যাঁরা এসেছিলেন সকলেই এলেন।

বাবার মৌনকুটিরের সামনে তুলসী কাননের পাশের উঠোনে তাঁদের বসান হল। বাবা তখনই এসে বেশ সাহেবী কায়দায় দয়ামার সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক্' (করমর্দ্দন) করেন। বাবার শ্রীমুখের নীরব মধুর হাসি সকলকেই আনন্দ দান করেন। তাবপর বাবা দয়ামাকে বসতে ইঙ্গিত করে স্বয়ং বসলেন। খাতা কলম বাবার সামনে দেওয়া হল। নরনারীবৃন্দ উৎসুক হয়ে বাবার লেখা কথাগুলি শোনার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

আজকে বাবার লেখা কথাগুলি শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনারায়ণ দুবে এবং বাবার চরণাশ্রিত শ্রীনিশিকান্ত পাল ইংরাজীতে অনুবাদ করে মাকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন।

দয়ামা মৃণালিনীমা, এলেন ব্রহ্মচারী, জার্ম্মানী উভেযোঙ্ক প্রভৃতির দৃষ্টি বাবার তপক্লিষ্ট তনুটির উপর। বাবা দক্ষিণ চরণটি প্রসারিত করে বসে তাঁদের সামনে উপবিষ্ট।

মাদার দয়া অতি মৃদুস্বরে বাবাকে বললেন—আপনি আনন্দময়, সর্ব্বদা আনন্দ দান করছেন। আপনি প্রেমের দেবতা প্রেম আপনাতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

বাবা। যেমন মা, তার বেটার কি তার মত হওয়া উচিত নয়? তোর ছোট্ট ছেলেটা একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে, উত্তর দে।

দয়ামা। কি বলুন।

বাবা। তুই নিজের ইচ্ছায় আসিস নি, ঠাকুরই তোকে এনেছে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

দয়ামা। আমি ভেবেছিলাম এবার ভারতে যেয়ে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের দর্শনলাভ করবো। সেই মহাপুরুষ আপনিই। গতবারে

পুরী এসে আপনার নাম শুনি কিন্তু আসতে পারিনি, মনে করেছিলাম এরপর তাঁর কাছে আমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে।

বাবা। বর্ত্তমান যুগে সকল প্রকার অধিকারী যাতে সহজে পরমানন্দে পৌঁছুতে পারে, সেই পথ এর দ্বারা ৭০ বৎসর কাল সাধিয়ে ঠাকুর এই সহজ পথের কথা তোকে দিয়ে এ্যামেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচার করবেন, যে পথ শ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ। বেটা তার মার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী —"শ্রী" "লক্ষ্মী", তুই তার অপর মূর্ত্তি।

দয়ামা। আমেরিকায় ২৫ বৎসর ধরে একজন মহাপুরুষের সঙ্গ করি, তাঁর কাছ থেকে জানি,······প্রেমই পরম কাম্য। ভগবানের বিভূতি প্রেমীতেই দেখা যায়। আমি চাই সর্ব্বদা সমাহিত হয়ে প্রেম-ময় ঈশ্বরে মিশে যেতে, এবং সকলকে সেই প্রেমে মাতিয়ে তুলতে।

বাবা। পাগলী মা! নিজে ভগবৎ প্রেমে মেতে থাকলে, কোন চেষ্টা করতে হবে না, আপনা আপনি সবাই মেতে যাবে। খুব বড় অগ্নিকুণ্ড যদি জলতে থাকে তাহ'লে পোকা মাকড তাতে ছুটে এসে পড়ে অগ্নিময় হয়ে যায়। লোকে মনে করে পোকা পুড়ে মোলো, পোকা পুড়ে মোল না—নূতন অগ্নিময় জীবন পেলো।

দয়ামা। ৮বৎসর হতে 'ভারতে' আসার ইচ্ছা হয়েছিল এবং ভগবৎ প্রেম আনন্দ লাভের জন্য ইচ্ছা জেগেছিল। গুরুদেব অনেক কাজ করার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সব করতে পারিনি। এখন আমি চাই নিজে সেই পরমানন্দ প্রেমে ডুবে যেতে ও সকলকে আনন্দে নিয়ে যেতে।

বাবা। নিজে ডুবে যা, তার দ্বারাই তোকে গুরুদেব যে ভার দিয়ে গেছেন তা স্বতঃই সিদ্ধ হবে।

বাবার লেখা কথাগুলি শুনে মা চোখ বুজে স্থির হয়ে বসলেন। একটু পরেই হাসতে হাসতে বাবার দিকে তাকালেন।

বাবা। আজ বেটা তার হারানো মাকে পেলে, মা তার হারানো বেটাকে লাভ করলো।

একথা শুনে মার ঐ পূর্ব্বোক্ত অবস্থা। তারপর মা ধীরে ধীরে বললেন—"নিশ্চয়ই এই আত্মা (মার আত্মা) ঠাকুরকে জান্‌তো, নিশ্চয়ই জানা পরিচয় ছিল।"

বাবা। যতক্ষণ আমি কিছু কোর্‌বো এভাব হৃদয়ে থাক্‌বে ততক্ষণ ঠিক ঠিক কাজ হবে না; যখন হৃদয় সমস্ত বাসনাশূন্য হবে, তখই ভগবৎশক্তি দেহমনকে অধিকার করে নিয়ে বিশ্বকল্যাণে নিরত হবেন। তখন যে কাজ আরম্ভ হবে তার বেগ অপ্রতিহত, অতি দুর্নিবার।

দয়ামা। যখন আমার এই আমির বিনাশ হবে তখন আমি জান্‌বো কে আমি। When I shall die, I shall know who am I. আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন ফোর্স—শক্তি—সর্ব্বদা পাই।

বাবা। তুই "নাদ জ্যোতি" পেয়েছিস্?

দয়ামা। হাঁ 'ওম্' শব্দ ও জ্যোতি দৃশ্য হয়।

বাবা। সর্ব্বক্ষণ থাকে?

দয়ামা। মন চঞ্চল থাকলেও কোন কাজ করার সময়ও থাকে। তবে মনস্থির থাকাকালে ভালই দেখি ও শুনি।

বাবা। তা না হলে তুই এখানে আসবি কেন?

বাবা। তোর যাবার তাড়া আছে কি না?

দয়ামা। না, আমি এখন যেতে চাই না। আমার আত্মা

এখন আপনার কাছে থাকতে চাইছে। ১৯৪৮ সালে প্রথম নাদ অনুভব করি। আমি ভীষণ অসুস্থ হ'য়ে পাড়। গুরুদেব ১০০ একশো মাইল দূরে ছিলেন। তাঁরই আদেশে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়। সেই সময় শব্দ, নাদ শুনতে পাই। "ভ্রূ"তে জ্যোতি দেখি। বাঁচার আশা ছিল না, তখন নারীকণ্ঠে এক বাণী শুন্‌তে পাই—তুই কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছিস্? যদি বাঁচতে চাস তাহলে আমার কাজ করতে হবে। আমার তখন বিষয় বা ভোগে কোন আসক্তি ছিল না। আমি বললাম—যদি বেঁচে উঠি তো তোমার কাজেই জীবন উৎসর্গ করবো।

বাবা। বাংলা ১৩৩৭ সালে "সাইনোভাইটিস্" হয়। তিন মাস এককাতে পড়েছিলাম। তিনটা অপারেশন হয়, একদিন মনে হ'ল প্রাণ উঠ্‌ছে উর্দ্ধে উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে···যেন প্রাণ দেহ ছেড়ে চলে যাবে। তখন উপর থেকে বাণী এল—"কাজ আছে।" প্রাণ আবার দেহ আশ্রয় কর্‌লো, চেতনা ফিরে এল। অপারেশন কালে অজ্ঞান করেন নাই, শুধু জিহ্বা "নারায়ণ নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করেছিল।

দয়ামা। ১৯৩১ সালে আমি সন্ন্যাস নিই।

বাবা জিজ্ঞাসা করেন—বাংলা কত সাল হিসেব কর্‌। বলা হয় ১৩৩৮ সাল।

বাবা। এ তখন শয্যাগত। লোক তো দুজন নেই। একজনই বিশ্ব ব্যেপে কাজ করছেন নানা মূর্ত্তি, যেমন—আকাশ।

দয়ামা। এখন এই চিন্তাই আমার হৃদয়ে জাগে, তুমিই যন্ত্রী। আমার কোন স্বাধীনতা বা কাজ করার শক্তি নাই, তুমি সব করাচ্ছ।

বাবা। ঠিক—'এ'ও (সীতারাম) সকলকে এই কথা বলে থাকে।

দয়ামা। গুরুদেব মৃত্যুর ২ঘণ্টা পূর্ব্বে বললেন—আমি চলে যাব। বল্লাম—কি ভাবে থাক্‌ব? বল্‌লেন—তুমি ভগবৎ প্রেমে সর্ব্বদা ডুবে থাকবে। আমি কেবল প্রেমই চাই।

বাবা। এখন এর সাধন লভ্য ৭০ বৎসর কালের সহজ পথের কথা বল্‌বো।

দয়ামা। আচ্ছা বলুন।

বাবা। বিবেকানন্দ বাবা যে বেদান্তপথ প্রচার করে যান সে পথের অধিকারী খুব কম। মনোজয়ী না হলে সে পথে অর্থাৎ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই সত্যে দাঁড়াতে অর্থাৎ স্থির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। "শিবোঽহং সোঽহং" মুখে সাধবার বস্তু নয়। সোঽহং নাদ আপনা আপনি উঠ্‌বে। তাতে সাধ্‌তে হবে না, এই নাদই স্থির-প্রতিষ্ঠ করে দেবে পরম সত্যে। এখানে বিচার বিভীবিকা নাই। বিচার করবার অধিকারী বর্ত্তমান যুগে অতি অল্প। বিচার কি বুঝতে পেরেছো ত তোমরা?

আমি দেহ নই, শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা-ঘ্রাণ নই, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ নই, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার নই, আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত পরব্রহ্ম। এ জগৎ নাই, জীব নাই, একমাত্র আমি আছি। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, সেরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়েছে—জগৎ বলে কিছু নাই; একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। এর নাম বিচার। এ বিচারের অধিকারী ভারতেই দুর্লভ, অ্যামেরিকা প্রভৃতি দেশে ত কথাই নাই। সকলের জন্য চাই—সহজ সুগম পথ।

সেই পথ কলিযুগে "নামকীর্ত্তন।" নাম অবলম্বনে মানুষ কৃতার্থ হয়। ভক্তি থাকুক না থাকুক, শ্রদ্ধা থাকুক না থাকুক, নাম উচ্চারণ করলে নাম তাকে আত্মসাৎ করবেনই।

("দয়ামা" স্থির ভাবে বসে মুদিত নয়নে কথাগুলি শুনে ঈষৎ ঘাড় নেড়ে কথায় সায় দিলেন।)

উদাহরণ দিচ্ছি—নাইট্রিক এ্যাসিড যে কোন প্রকারে গায়ে ঢাল্‌লে তার কাজ করবেই। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এতে ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না।

অভক্তি ভক্তি যে ভাবে হোক, ভাত খেলে পেট ভরে যায়।

অভক্তি করে জল খেলেও পিপাসা দূর হয়।

দয়ামা। 'নাম' ভক্তিতে ও ভালবাসায় করাই ভাল।

বাবা। এই ভালবাসা পাবো কোথায়—শুষ্ক কঠোর হৃদয়ে কজনের ভালবাসা আছে?

দয়ামা। ভালবাসা ভগবান দেবেন। নাম করতে করতে, তাঁকে ধ্যান করতে করতে ভক্তিলাভ হয়।

বাবা। যখন মন বেশী চঞ্চল থাকে তখন নাম কীর্ত্তন করতে হয়। চঞ্চলতার কারণ মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, মুরগী, ডিম প্রভৃতি রাজস আহার, রাজস আহারের দ্বারা দেহের উপাদান দুষ্ট হয়ে মন কামাকুল হয়, ব্রহ্মচর্য্য রাখতে পারে না, অধিক বীর্য্যক্ষয়ে দেহ মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, মনের অন্তর্মুখ হবার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, মন উন্মাদের মত চতুর্দ্দিকে ছুটতে থাকে।

দয়ামা। যখন মানুষের ঐ রকম অবস্থা হয় অর্থাৎ পাপে তাপে সব পরিত্রাহি করে, তখন বোধ হয় ঠাকুর ও ঈশ্বরের শক্তি ঠাকুরের মতন তাঁদের উদ্ধার করতে আসেন।

ঠাকুর। যদি মুখ-দেখা আরসির মত একখানা মন-দেখা আরসি পাওয়া যেতো তা হলে দেখা যেতো সভ্যভব্য ও সাধু সেজে যাঁরা আছেন তাঁরাও এক একটি বদ্ধ পাগল।

দয়ামা নয়ন উন্মীলন করত শান্ত দৃষ্টিতে হাস্‌তে হাস্‌তে বাবার কথার যথার্থতার অনুমোদন করেন।

বাবা। তোর তাড়া লাগছে না তো ?

দয়ামা। না—না, আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি আবার বলুন।

বাবা। এই যে চঞ্চলচিত্ত কলির জীব—এদের জন্য উচ্চ কীর্ত্তন। নৃত্যসহ কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে দেহের উপাদান পাল্‌টে যাবে। মন অন্তর্মুখ হতে থাক্‌বে। জিভ তখন আস্তে আস্তে "গুরুগুরু" জপ করতে সমর্থ হবে। জিহ্বায় বাগেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। এ তিনটির বাহ্যগতি রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। "কান" শুন্‌বে, তার বাহ্যগতি রোধ হবে। নামকীর্ত্তনে 'নাসা' বাইরের গন্ধ নিতে পারবে না। (তাহ'লে) পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বেঁধে ফেল্লেন। নামকীর্ত্তনে হাততালি দিতে দিতে হাত বাঁধা হয়ে যাবে (বাবা নিজে হেলে হেলে দুলে দুলে হাততালি দিতে লাগলেন।) নৃত্য করলে পাদেন্দ্রিয় আয়ত্ত হবে। শরীরে তমোভাব জড়তা আছে, নৃত্যের দ্বারা তমো দূরীভূত হবে। নাম উচ্চারণে রজোগুণ পলায়ন করতে পথ পাবে না, আবির্ভূত হবেন "সত্ত্বগুণ"—রোমাঞ্চ কম্প অশ্রু প্রভৃতি নিয়ে।

বাবা। তোর ক্ষিদে পেয়েছে ?

দয়ামা। খাওয়া পরে হবে, এখন আপনার কথা খুব ভাল লাগছে, বলুন।

বাবা। নাম করতে করতে পাপক্ষয় হলেই জিভ্ থেকে নাম হৃদয়ে নামবেন, অনাহত নাদ আরম্ভ হবে। সেই নাদ প্রথমে খণ্ডভাবে, তারপর অখণ্ডভাবে চল্‌তে থাকবে, নাদই ওঙ্কার। ওঙ্কারের 'অ' 'উ' 'ম' তিনমাত্রা বা তিনপাদ। 'ম'কার পাদটি নাদময়। 'অকার' স্পন্দন, 'উকার' জ্যোতি, 'মকার নাদ।

নাদ জ্যোতিই খণ্ডভাবে জীবাত্মা, আর অখণ্ডভাবে পরমাত্মা। যেমন—'হৃদয়াকাশ' ও 'মহাকাশ'। নাদ কোন রকমে জেগে গেলে আর ভাবনা নাই। নাদই টেনে নিয়ে 'দেহ আমি' এ বোধ নষ্ট করে দেবেন।

আগে বলেছি "গুরুগুরু" নাম করতে করতে অনাহত নাদ পাওয়া যাবে। ক্রমে সে নাদ অখণ্ডভাবে চল্‌তে থাকবে।

প্রশ্ন। অখণ্ড নাদ কি এ কথা বুঝিয়ে বলুন।

বাবা। মানে—স্বতঃউত্থিত বহুবিধ নাদ আবির্ভূত হবেন। তখন 'পশ্যন্তী' অবস্থা লাভ হবে। তখন 'জ্ঞানী' তাঁর বাঞ্ছিত 'পরমাকাশকে', 'যোগী' তাঁর অভিলষিত পরমজ্যোতির্ম্ময় 'পরমাত্মাকে', 'ভক্ত' তাঁর প্রিয়তম ভগবানকে লাভ করবেন। এসব কাল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

বিনয়েন্দ্রবাবু বললেন—এসব অমূল্য কথা। কালকে ও আজকে যা বললেন এসব বাণীর তুলনা নাই। এসব ঠাকুরের প্রত্যক্ষ অনুভব আমাদের দেখাচ্ছেন। কি অপূর্ব্ব!

বাবা। জীব ঈশ্বরের অংশ, জীব নিজের স্বরূপ ভুলে 'আমি দেহ' এই অজ্ঞান-অন্ধকারে জন্ম জন্মান্তর ঘুরতে থাকে।

গুরু কৃপা করে তাঁকে রামনাম বা গুরুনাম, শিব কালী খ্রীষ্ট

আল্লা যে কোন নাম দিলেন। জিভ্ জপ করতে লাগলো—"খ্রীষ্ট খ্রীষ্ট", জিভ শুদ্ধ হ'ল, কণ্ঠ শুদ্ধ হ'ল, খ্রীষ্ট নাম অনাহত নাদে পরিণত হলেন। তখন তিনি অর্থাৎ খ্রীষ্ট যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সে ভাব রইল না—তাঁর প্রকৃত রূপ শব্দেই অর্থাৎ নাদেই পর্য্যবসিত হলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীবাবা তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত' মহাগ্রন্থের কয়েকটী পাতা প্রথমে বাংলা পরে ইংরাজীতে তার অনুবাদ করে শোনাতে আজ্ঞা দেন নৈহাটির নিশিকান্তদাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের "নাদলীলামৃত" নামক অভিনব গ্রন্থের ৫ম থেকে ৭ম উল্লাস এইভাবে শোনানো হ'ল।

বাবা। খৃষ্ট, শিব, দুর্গা দেশভেদে জাতিভেদে শব্দব্রহ্মের বহিঃ-প্রকাশ, দেহ শুদ্ধ হতেই তিনি তাঁর প্রকৃত মূর্ত্তি গ্রহণ করলেন। এই যে শব্দ, ইনিই আত্মা। ইনি পাপের ফলে 'দেহ আমি' এই বাঁধনে বাঁধা ছিলেন। খণ্ডনাদ আরম্ভ হল, ক্রমে অখণ্ড নাদ চলতে লাগ্‌লো, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেলো, সর্ব্বপাপক্ষয়ে সোঽহং সোঽহং করতে করতে ভগবানের অংশ জীব ছুটলেন তাঁর উৎপত্তির স্থান, তাঁর সর্ব্বস্ব প্রিয়তমের অভিসারে—নদী যেমন ছোটে সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের আশায়, তেমনি জীবনদী মিলনের জন্য 'সোঽহং সোঽহং সোঽহং' করতে করতে ছুটে চলেছেন—মিলন-আশে। নদী সমুদ্রে মিশতে চায়, সম্মুখে প্রতিবন্ধক হল বালুকারাশি। নদী মিশ্‌তে না পেরে নীরবে সেখানে স্তব্ধ হয়ে কাঁদতে লাগলো, সে ক্রন্দনে সমুদ্র স্থির থাকতে না পেরে পূর্ণিমায় বেড়ে নদীকে আত্মসাৎ করে নিলেন। তখন নীরব ভাষায় ক্রন্দনময় হৃদয় হ'তে উঠতে থাকে "সোঽহমস্মি·········

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যাঁকে দিয়ে জীব উদ্ধার করাবেন তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরভাবে আবির্ভূত হয়ে কাজ করতে লাগলেন। এবং যাঁকে দিয়ে সে কাজ করাবেন না তিনি ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে জড়োন্মত্ত পিশাচের মত ঘোরেন অথবা নির্জ্জন গিরিগুহায় সমাহিত থাকলেন।

তাহলে তুই নিশ্চয় বুঝতে পারলি যে কোন্ অধিকারী নাম কীর্ত্তনরূপ সহজ সুগম পথে গিয়ে কৃতার্থ হয়?

দয়ামা। হাঁ বুঝেছি।

বাবা। প্রথম থাকে সাধকের প্রযত্নসাধ্য নামকীর্ত্তন, তারপর সেই "নাম ভগবান" নাদরূপে পরিণত হয়ে আপনার অংশ বা প্রকৃতিকে আপনার সঙ্গে মিশিয়ে নেন।

এই সহজ পথ ওদেশে (বহির্ভারতে অ্যামেরিকায়) প্রচারের জন্য ঠাকুর তোকে পাঠিয়েছেন। 'এ'ও তোর অপেক্ষা করছিল। অ্যামেরিকায় কাজ আরম্ভ হয়েছে। মুকুল দে (শান্তিনিকেতনের) গিয়ে কাজ সুরু করে। এখান থেকে হরেকৃষ্ণ নামের রেকর্ড পাঠিয়েছিলাম। দুটি তুলসী মালা পাঠাই দুজনকে, একজনের ঘরে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়—তুলসীমালা পোড়েনি।

এইভাবে শ্রীশ্রীবাবা লিখে লিখে শ্রীশ্রীদয়ামাকে উপদেশ করেন। বিনয়েন্দ্র বাবু ও নিশিকান্তদা ইংরাজী করে দয়ামাকে বুঝিয়ে দেন। তারপর বাবার আদেশে দয়ামা প্রভৃতিকে ফল মিষ্টি খাওয়ান হয়। বাবা দাঁড়িয়ে থেকে মাকে হাত ধোয়ালেন এবং খাবার জায়গায়

সেবকদের ইঙ্গিত ক'রে গোবর দিয়ে এঁঠো পাড়ালেন। বাবার বাণী —বাইরের শুচিতা না মান্‌লে অন্তরের শুচিতা আসবে না, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করতে হয়। এঁঠো হাত না ধুলে যাতে হাত দেবে সব এঁঠো হয়ে যায়। শুদ্ধ আহার, শুদ্ধ শরীর না হলে সত্ত্বশুদ্ধ হবে না। সত্ত্বশুদ্ধি না হলে ধ্রুবাস্মৃতি ভক্তিলাভ হয় না।

তারপর বাবা অন্যান্য সকলকেই হাত ধোয়ান। দয়ামা বাবাকে প্রণাম ক'রে করযোড়ে বললেন—আপনার আশীর্ব্বাদ ও কৃপাই আমার কাম্য। বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের সীমা অতিক্রম করে প্রায় শঙ্করাচার্য্য মঠের কাছ পর্য্যন্ত আসেন। এই বিদায়দৃশ্য সকলকে বিস্মিত করে। মা পুনঃ পুনঃ বাবাকে প্রণাম কচ্ছেন আর এক অপূর্ব্ব চাহনিতে সহাস্য বদনে বাবার শ্রীবিগ্রহ দর্শন কচ্ছেন। বাবার চরণে মা একটি একশো টাকার নোট দিয়ে প্রণাম করলে বাবা তৎক্ষণাৎ টাকাটি ফেরৎ দিতে বললেন; কিঙ্কর সচ্চিদানন্দ বললেন—বাবা টাকা স্পর্শ করেন না। তাঁরা বললেন—বাবার সেবায় লাগাবেন। সচ্চিদানন্দদা বলেন—টাকা বড় নয়, আন্তরিকতাই কাম্য ও শ্রেষ্ঠ, এই ব'লে টাকা ফেরৎ দেন। বাবা তাঁর গায়ের একটি চাদর মার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। মাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় মাত্র ধ্যানের সময় ঐটি ব্যবহার করবেন। এই চাদরের মধ্যেও বাবার শক্তি আছে। ধ্যান, কালে চাদর গায়ে দিয়ে দেখবেন, খুব আনন্দ পাবেন।

মার অনুরোধে বাবা আশ্রমের দিকে ফিরলেন। মা যতক্ষণ বাবাকে দেখা যায় ততক্ষণ হাত তুলে একদৃষ্টে দেখতে থাকেন। বাবার প্রতি মার ভক্তি ভালবাসার তুলনা করা যায় না। প্রথম দর্শনেই তিনি বাবাকে চিনে ফেলেছেন। বাবা যখন আশ্রমে এলেন তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে বারটা পার হয়ে গিয়েছে।

দেশে ফিরে দয়ামা বাবাকে কয়েকটি চিঠি দেন ; তাঁর প্রথম চিঠির বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করছি :

১লা মার্চ, ১৯৬২

শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ সমীপেষু

পরম প্রেমাস্পদ ঠাকুর—

পুরীতে বিদায় নেবার সময় বলেছিলাম চিঠি লিখব। এতদিনে সে সুযোগ পেলাম। এখন আমরা লস এঞ্জেলেসে আমাদের আশ্রমে এসে পৌঁচেছি। এইমাত্র আমাদের সেক্রেটারি শ্রীবিনর দুবের পাঠানো আমাদের আলোচনার ছাপানো বিবরণ* পেলাম। অবশ্য ঠিক বলতে গেলে—ওম্ এবং জ্যোতি বিষয়ে দিব্যজ্ঞানে ভরপুর ঐ আলাচনা নিছক তোমারই। বিবরণ পাঠ করে সুস্পষ্ট মনে পড়ল ঐ স্বর্গীয় মিলনের কথা আর তোমার দিব্য শ্রীমুর্ত্তির কথা। সেই দর্শনের স্মৃতি কখনও ভুলতে পারব না, ভুলতে পারব না তোমার ঐ শিশুসুলভ অথচ দিব্যজ্ঞানদীপ্ত শ্রীমূর্ত্তির স্মৃতি।

এখানকার ভক্তরা তোমার সঙ্গে আমাদের মিলনের কথা শুনেছেন। আমরা অবশ্যই এই আশা পোষণ করি যে জগন্মাতা আমাদের বারে বারে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবেন, আমাদের আবার তোমার দর্শন লাভের সুযোগ দেবেন।

আশ্রমের সকল ভক্তকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবে, তুমি নিয়ো আমার হৃদয়ের প্রগাঢ়তম প্রীতি।

গভীরভাবে তোমার

দয়ামাতা

---

* 'মাদার' পত্রিকায় প্রকাশিত।

এই চিঠির যে উত্তর বাবা দিয়েছিলেন (আমরা সেটির ইংরেজী করে দি' তাঁর আদেশে) সেটিও উদ্ধৃতিযোগ্য :—

২৩-১১-৬৮

শ্রীভগবন্মূর্ত্তিষু—

মা, তোর ছোট্ট মিষ্টি গোপাল তোর একখানা ঠিক এরূপ পত্রের আশা করছিল। পত্র পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম।

কেমন আছিস্ মা? আবার কবে আসবি মা? দাদারা সব কেমন আছে? তাদের প্রীতি দিস্। তুই সব জানিস্।

দেখ্ মা, এই যে মা-ব্যাটার মিলন এটা আকস্মিক নয়। এ মিলন কত জন্ম জন্মান্তর ধরে চলেছে। বেটা তার হারানো মাকে পেলে। মা বেটা একই কাজ করছে। পত্রের উত্তর দিস্। তোকে একখানা বই পাঠাবো, শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমলীলা তার নাম। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরাজী এই চারিটি ভাষায় বইখানা লেখা হয়েছে। তুই একখানা নিবি না চারখানা নিবি? মা মা মা আমার মা।

তোর

ছোট্ট মিষ্টি গোপাল

আরও এক বিশিষ্ট বিদেশী অতিথির আগমন হয়েছিল নীলাচল আশ্রমে তাঁর মৌনের মধ্যে। সে ঘটনা দয়া-মা ও অসীমানন্দ বাবার শুভাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী—২২শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮, ইংরাজী ৮ই নভেম্বর ১৯৬১।

তাঁর-ও আগমন বাবার দর্শন কামনায়।

নাম তাঁর জন সোস্‌কো। অধ্যাত্মপথের পথিক তিনি ছিলেন না। তবে বৈষয়িক ব্যক্তির চিত্তেও তো কখনও কখনও অধ্যাত্ম-

পিপাসা জাগে। তাঁরও জেগেছিল। তিনি ছিলেন কলম্বোর অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী। মাত্র দিন কয়েক আগে সিংহল থেকে পুরী এসেছেন ; আজই পুরী ত্যাগ করবেন। তার আগে কোন সাধু মহাপুরুষের সন্ধান পেলে দর্শন করবেন, এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সন্ধান পাবেন কি ভাবে? শেষ পর্য্যন্ত বি-এন-আর হোটেল থেকে বেরিয়ে রিক্সায় বসে চালককে প্রশ্ন করে বস্লেন, "তোমার সন্ধানে কোন মহাপুরুষ থাকে তো আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল।"

রিক্সাচালক সাহেবকে সোজা নীলাচল আশ্রমে এনে হাজির।

সাহেবকে আশ্রমেসেবকেরা কর্ম্মকুঞ্জে বসিয়ে বাবার রচিত গ্রন্থের কিছু ইংরাজীতে অনুবাদ ও 'মাদার' ধর্ম্মপত্রের কয়েকটি সংখ্যা পড়তে দিলেন। সেবক শ্রীনিশিকান্ত পাল ও কিঙ্কর সচ্চিদানন্দজী বাবার লীলা-কথা যৎকিঞ্চিৎ তাঁর অবগতির জন্য বিবৃত করলেন। ঘণ্টা খানেক ধরে সাহেবটি বাবার বিষয়ে প্রশ্নাদি করেন।

বেলা ৩৷৹টায় তিনি বাবার দর্শন পান। বাবা সাহেবী ভঙ্গীতে তাঁর করমর্দ্দন করলেন।

সাহেব বললেন, "আপনার কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনতে চাই। আমি আধ্যাত্মিক বিষয়ে কখনও উৎসাহী ছিলাম না। ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাও আমার ছিল না বা নেই। তবে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী।"

বাবা খাতায় লিখে উত্তর দিলেন, "জগতে অধিকারী (সব) এক রকম নয়। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা শাস্ত্র বলেন। (যথা) কেউ দশ সের ভার বহন করতে পারে, তাকে দশ সের ভার চাপান হয়, কেউ আধমণ, কেউ একমণ ভার বইতে পারে, তার জন্য সেইরূপ

সাধনের ব্যবস্থা, তার জন্য ষড়দর্শন, বেদাদি শাস্ত্র বহু পথের কথা বলেন।"

বাবার লেখা বাণীগুলি সাহেবকে ইংরাজী করে বুঝিয়ে দিলেন শ্রীনিশিকান্ত পাল।

সাহেব প্রশ্ন করলেন, "কি করে জানব এই সহজপথ?"

বাবা। বেদ বলেন, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে একমাত্র শ্রীভগবান্ আছেন, তাঁকে যে সবাই একভাবে ধরতে পারবে তা সম্ভব নয়। যার যেমন অধিকার সে সেইভাবে ভগবানকে অর্থাৎ আমার আত্মাকে লাভ করবার চেষ্টা করে। আকাশ যেমন সমস্ত সমাচ্ছন্ন করে বর্তমান তেমনই ভগবান্ আমাদের ভেতর বার সমাবৃত করে আছেন। শুধু তিনি যে আমার অন্তরে বাইরে বিদ্যমান এই জ্ঞান লাভের জন্য সাধনা। গুরুই সে পথ (যে পথ শিষ্যের অনুকূল) নির্দ্দেশ করবেন।

সাহেব। বিভিন্ন গুরু বিভিন্ন পথের কথা বলেন; আমি কি করে বুঝবো যে এই গুরু যা বললেন, এই আমার পথ? ইনিই আমার গুরু?

বাবা। যাঁকে দেখে প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে, যাঁকে আপনার জন, কতদিনের পরিচিত প্রিয়জন মনে হবে, তিনিই আমার গুরু। তিনি আমার পথনির্দ্দেশ করবেন, পথের বিভিন্নতা মাত্র বাইরে, একটা স্তর অতিক্রম করলে সকল পথ একসঙ্গে মিলিত হবে।

সাহেব। হ্যাঁ, বুঝলাম।.........ঈশ্বর তো একজন?

বাবা। ঈশ্বর তো আছেন, তার প্রমাণ? তিনি কোথায় আছেন? তাঁকে কি করে জানতে পারব?

সাহেব। হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে বুঝতে জানতে চাই। আমি এর উত্তর জানি না।

বাবা। জড় চেতন ছুটি বস্তু দেখা যায়। জড় দেহ, চেতন আত্মা। সেই যে চৈতন্য শব্দব্রহ্ম, তিনি পরা পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরীরূপে দেহটিকে ধরে রেখেছেন।

সাহেব। এই পরা-পশ্যন্তী জানতে পারা যায় কি ক'রে?

বাবা। জগৎ সৃষ্টি হয়েছে শব্দ থেকে। বাইরে যা কিছু দেখা যায় তা শব্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি। ভিতরে সেই শব্দ বা নাদ গুহ্যে পরা, নাভিতে পশ্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমা, জিহ্বায় বৈখরীরূপে লীলা করছেন। এই শব্দই ভগবান্। ভগবানকে আমার কি প্রয়োজন? আমি খাচ্ছি, দাচ্ছি, বেশ আছি, কি প্রয়োজন ভগবানকে? (উত্তর দাও)

সাহেব। এ বিষয়ে আমায় চিন্তা করতে দিন।

বাবা। উত্তর দিচ্ছি—তোমার কি দরকার। আমি চাই আনন্দ; আনন্দের জন্য ভগবানকে (প্রয়োজন)। বিত্তায় অর্থে মানে সম্ভ্রমে স্ত্রীতে (অর্থাৎ এই সব বস্তুতে) আমি ছুটেছি আনন্দের জন্য। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক। আমি চাই চিরস্থায়ী আনন্দ—যে আনন্দ চিরদিন একভাবে থাকবে, জীবনে মরণে সে আনন্দের পরিবর্ত্তন হবে না—এই পরমানন্দই ভগবান্। সেই পরমানন্দ ভগবান্‌কে কি করে পাব?

সাহেব। হাঁ, সেই পরমানন্দময় ঈশ্বরকে কি ক'রে পাব?

বাবা। আমার বশে আছি—কি? না—জিভ। এই জিভে খৃষ্ট খৃষ্ট করতে গুরুদেব বলেন। আমি খৃষ্ট খৃষ্ট করতে লাগলাম।

সাহেব। জিহ্বায় কি 'ক্রাইষ্ট ক্রাইষ্ট' জপ করতে হবে?

বাবা। আমি আগে জেনেছিলাম—পরা শান্ত, পশ্যন্তী কিছু চঞ্চল, মধ্যমা আরও অস্থির, জিভের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ বৈখরী খুব চঞ্চল। (শব্দের) অনুলোম গতি—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী;

বিলোম গতি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা। আমি খুষ্ট খুষ্ট করতে করতে জিভ শুষ্ক হতেই হৃদয়ে এলাম।

সাহেব। হ্যাঁ বুঝেছি।

বাবা। এইখানে (অর্থাৎ হৃদয়ে) আপনা আপনি শব্দ সকল উত্থিত হচ্ছে। বীণা, বাঁশী, মেঘ, ড্রাম ইত্যাদি শব্দ এখানে স্বতঃই ধ্বনিত হচ্ছে। বৈখরী থেকে যেমন পৌঁছলাম (অনাহতে) —বাঁশী বাজতে লাগল, মেঘ ডাকতে আরম্ভ করল, চঞ্চল মন বাইরের সুখের জন্য পাগলের মত ছুটছিল—সে পেল পরমানন্দময় এক শব্দ। (বুঝেছ ?)

সাহেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, একথা যুক্তিপূর্ণ, আমি ঠাকুরের উপদেশ চাই। উনি যা বলবেন, আমি তাই করব।

বাবা। তখন সে পেল এক পরমানন্দময় শব্দ। ইন্দ্রিয়সকল আর বিষয়ের দিকে ছুটল না ; ফিরে এল ভিতরে, সে স্থির হতে লাগল। বাসনা জাগল পরমানন্দময় ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করবার।

কোন সেবক। এই শব্দ শুনতে শুনতে ভগবানের দেখা পাওয়া যাবে ?

বাবা। এই নাদ (শব্দব্রহ্ম) যত গভীর উচ্চস্তরে উঠতে লাগল—তখন—জ্যোতির আবির্ভাব হল, ভগবান্ দেখা দিলেন। অতৃপ্ত আত্মা যে জন্ম জন্মান্তর ঘুরছিল সুখের আশায়, সে ডুবে গেল পরমানন্দে। যতদিন বেঁচে রইল ততদিন লোককে পরমানন্দের পথ দেখিয়ে দিয়ে শেষে পরমানন্দে একীভূত হয়ে গেলেন।

সাহেব পুরী এক্সপ্রেসে ফিরবেন ; তাঁর সময়ের অভাব। তাই ঠাকুর সংক্ষেপে অতি বিরাট তত্ত্বকে তাঁকে লিখে বুঝিয়ে দিলেন। বাবার নির্দেশে তাঁকে কিছু ইংরেজী বই দেওয়া হ'ল।

বাবা ইঙ্গিতে তাঁকে কিছু খাওয়াতে বললেন। সেবকেরা জানালেন তাঁকে ফল মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছে।

বাবা নীরবে সহাস্য বদনে সাহেবের ডান হাতটি দৃঢ়ভাবে ধরে করমর্দ্দন করলেন। সাহেবটি করযোড়ে অভিবাদন করে বিকেল ৫ টায় বিদায় নিলেন।

সাহেব-বাবাদের এই ভাবে আকর্ষণ ক'রে নীরবে নিঃশব্দে লীলা এই একটি বা দুটি নয়। এমন কত লীলার অবতারণই যে করলেন তার সব বিবরণ সংগ্রহ করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটির উল্লেখ মাত্র করা হ'ল।

একটা নূতন ধারার আবির্ভাব হ'য়েছে। এখন মৌন চ'লছে। যাত্রা ক'রলেন পুরী একস্‌প্রেসে। সেখানে মৌন চল্‌ছে। চলছে পুরীতে নব নব লীলা। এবার ছেলেদের নিয়মিতভাবে সাধন শিক্ষা দিচ্ছেন। আনন্দের প্লাবন বইছে।

একবার একটি শিষ্য আকুল হ'য়ে জানায়—"বাবা, আপনার গায়ে পা ঠেকে গিয়েছিল। আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন, বড় অপরাধ হয়ে গেছে।"

উত্তর এল—"বাপের গায়ে ছোট ছেলের পা ঠেক্‌লে, বাপ অপরাধ নেয় কি কিরে?"

পত্র গেল—"বাবা, আমি অনেক অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন।" উত্তর এল—"তোর অপরাধ করার আগেই ক্ষমা হ'য়ে গেছে। ক্ষমার ভাঁড়ারের কাছে অপরাধ পৌঁছাতেই পারে না।"

কিন্তু কথা দিয়ে কি ক'রে এই আনন্দময় প্রেমময় করুণাঘন লীলা-বিগ্রহের পরিচয় দেব। তিনি যে 'অবাঙ্‌মনসো গোচরম্', তাঁকে

চিনে ফেল্‌ব এমন কি তপস্যা আমাদের আছে? শুধু এইটুকু দেখি যে, এই আনন্দময়কে যে একবার দেখেছে, যে একবার তাঁর স্পর্শ পেয়েছে, সেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছে। হয়ত' ফুটো আধারে ধরে রাখতে পারে নি, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ তার আর অগোচর থাকে নাই। তাঁর স্নেহ ভালবাসার কথা ভাষায় বলা যায় না। তাঁর স্নেহ ভালবাসার ডাক যে শুনেছে, সে জেনেছে গোপীরা কিসের আকর্ষণে কুল মান ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের পিছনে ছুটতো। পৃথিবীতে কত জনের কত ভালবাসাই ত' আমরা পেলাম, কিন্তু সেই প্রেমময়ের প্রেমের তুলনা আর কোথাও ত' মিল্‌লো না। এঁর প্রেমের কাছে আর সব ভালবাসা আলুনি লাগে, বিস্বাদ কটু ব'লে মনে হয়।

আর তাঁর ধৈর্য্য! তাঁর সহিষ্ণুতা! এও বুঝি সেই অগাধ প্রেমের আর এক দিক। কত জনে কত অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে আস্‌ছেন! তিনি সকলের সব কথা মন দিয়ে শুন্‌ছেন—সমাধানের পন্থা ব'লে দিচ্ছেন। বেকারের চাকুরির ব্যবস্থা কর্‌ছেন, অবিবাহিতের বিবাহ দিচ্ছেন, অরক্ষণীয়াকে পাত্রস্থ কর্‌ছেন, নিরন্ন পরিবারকে রক্ষা কর্‌ছেন। অথচ এই সব সাংসারিক দুঃখকষ্টের কোন অর্থই তাঁর কাছে নেই। তাঁর কাছে সকলেই সমান প্রেমাস্পদ। ঠাকুরটি যেন কল্পতরু। তিনি সম্বোধন করেন—ছেলেরা মেয়েরা অথবা বাবারা মায়েরা ব'লে। গাড়ীতে চ'লেছেন, সঙ্গে নিলেন ছেলেদের। গন্তব্য স্থান এসে গেল, নাম্‌তে দিলেন না। আরও দু'চারটে ষ্টেশন নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। সে ষ্টেশনও এসে গেল, ছেলেরা নেমে দাঁড়াল। তিনি

যতক্ষণ দেখা যায়, চলন্ত গাড়ির জানালায় মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগ্‌লেন। তিনি বিদায়কালে কত পথ হেঁটে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত নন। যতক্ষণ না গাড়ী ছাড়বে, ততক্ষণ চেয়ে থাকবেন। দূর পাহাড়ের কোল থেকে দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখ্‌বেন—ছেলেরা তাঁর নদীবক্ষে নৌকা করে চলে যাচ্ছে। রাত্রেও তাঁর নিদ্রা নাই। হারিকেন নিয়ে ঘুরে বেড়ান—তাঁর ছেলেমেয়ে না খেয়ে আছে কিনা দেখতে। অধ্যাত্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তিনি আমাদের ডাক্‌ছেন, আমরা কাছে গিয়ে চাইছি চুষিকাঠি, খেলনা, তিনি জননীর স্নেহে এবং পিতার বাৎসল্যে সেই আব্দারই মেটাচ্ছেন। সন্তানদের বোকামিতে একটুও ব্যথা অনুভব করেন না, অসন্তোষ ত' দূরের কথা। প্রতিদিন তিনি ইষ্টদেবরূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান, দেখেন আমরা তাঁকে চাই না, তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েও ক্ষমাভরে যেন বলেন—"এখনও প্রস্তুত হওনি। আচ্ছা, বেশ! আবার আসবো।" এই কথা বলে যেন সেদিনের মত বিদায় নে'ন। আবার সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হ'য়ে বলেন, "আজও প্রস্তুত হওনি। আচ্ছা, আবার আস্‌বো আমি।" এইভাবে প্রতিদিন তিনবার চারবার ক'রে আমাদের ইষ্টদেব আমাদের সাধ্‌ছেন। আমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু কৈ এখন ত' বিমুখ করতে পারলাম না। দয়াল ঠাকুর! কবে—কবে আমরা তোমার যোগ্য হবো! হে প্রভো, আমাদের সকলকে কবে তুমি তোমার মহাদানের যোগ্য ক'রে নেবে। আর কতকাল ধ'রে করবে তুমি আমাদের জন্য এই 'সু'-ধীর প্রতীক্ষা! তোমায় প্রতিদিন হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করছি—এ ব্যথা আমরা কেমন ক'রে ভুল্‌বো!

"গান"

(ওমা) দে না আমায় পাগল ক'রে।
কাজ নেই মোর যোগ বিচারে॥
আমি যে তোর পঙ্গু ছেলে
আমায় পথ দেখাস্ কি ব'লে।
(ওমা) তুই যে মোরে দেহ দিলি,
সেও ত' পঞ্চভূতে খেলে।
(ওমা) আবার মোরে মন্ত্র দিলি,
মন ত' গেল ষড়রিপুর তালে॥
(ওমা) এখন তোর স্বরূপ দেখা।
স্থান দে মোরে তোর চরণতলে॥

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষণ ॥

বিশালবিশ্বস্থ বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥

বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পাপী, পুণ্যবান্, মূর্খ প্রত্যেককে যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়—'কি চাই?' তাহ'লে সকলে একই উত্তর দেবে—পণ্ডিত যা বল্‌বেন, মূর্খও তাই ব'লবে; পাপী যা উত্তর দেবে, পুণ্যবান্ সেই উত্তর দেবেন। কি চায় অখিল জীবনিবহ? কিসের জন্য কল্প-কল্পান্তর যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর উন্মাদের মত ছুটে চলেছে? সে কি পরমবস্তু, যার জন্য সকলে আকুল?

আনন্দ। আনন্দ কেন চায়? "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—আনন্দ হ'তে এ ভূত জন্মেছে, আনন্দে জীবিত আছে, শেষে প্রয়াণ ক'রে আনন্দেই প্রবিষ্ট হয়। যতদিন পর্য্যন্ত সেই পরমানন্দ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন যাতায়াত নিবৃত্তি হয় না। কালে অকালে সকলেই সেই হারান আনন্দের সন্ধান করছে। সে আনন্দ কেমন করে লাভ করা যায়? যে দারুণ সময়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা কি সে আনন্দ লাভ করতে পারি? তার উপায় কি?

*　　　*　　　*

কলিযুগে উপায় নামকীর্ত্তন।

শ্রীভগবন্নামের অপূর্ব মহিমা শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব'লেছেন—

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥

হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধা ক'রে অথবা হেলা ক'রেও যারা নাম কীর্ত্তন করে তাদের নাম আমার হৃদয়ে গ্রথিত থাকে।

হেলায় অথবা অভক্তিতে নাম ক'র্লে কি করে কাজ হ'তে পারে? তদুত্তরে মহাজনগণ বলেন, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে না—নাইট্রিক এসিড্ অশ্রদ্ধা ক'রে গায়ে ঢাল্‌লে শরীর দগ্ধ হয়, ঘৃণা করে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, অশ্রদ্ধা করে বিষ খেলে যখন অনিবার্য্য মৃত্যু হয়, তখন শ্রীভগবানের নাম যে কোন প্রকারে গ্রহণ কর্‌লে মানুষ কৃতার্থ হবেই। যে ক'টি নাম উচ্চারণ করবে অথবা শ্রবণ করবে, সেগুলি সব রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, মেদে, মজ্জায় মিশে যাবে, শরীর নামময় হয়ে যাবে। মাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা মানুষ কি প্রকারে কৃতার্থ হ'তে পারে, তার আলোচনা করা যাক্।

শব্দ হ'তে জগৎ সৃষ্টি হ'য়েছে। একথা বেদ স্পষ্ট করে ব'লেছেন। শ্রুতিতে শব্দকে প্রাণস্পন্দন আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। সকলই শব্দ-সম্ভূত। সেই শব্দব্রহ্ম মানবশরীরে মূলাধারে পরা, নাভিতে পশ্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমা, মুখে বৈখরীরূপে খেলা করেন। সংসাররচনা, জগতের মূল সূত্র—"বহু স্যাং প্রজায়েয়মিতি"—বহু হব, জন্মাব। সৃষ্টুমুখী গতিতে বৈখরী বাক্ সংসাররচনা ক'রেছেন। জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ করে যখন জীব বহির্মুখতার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে কেন্দ্রাভিমুখে ফিরতে চায়, তখন বাক্‌কে অবলম্বন ক'রেই কেন্দ্রে ফিরে আস্‌তে শাস্ত্র নির্দেশ দিয়েছেন। বৈখরী বাকের দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে

কর্‌তে যখন জিহ্বা কণ্ঠ কৃতার্থ হয়, তখন বাক্ মধ্যমায় অর্থাৎ হৃদয়ে উপস্থিত হ'ন। তৎকালে শরীরে কম্প, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ—শরীর যেন বড় হ'চ্ছে মনে হয়, শরীর বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে দুল্‌তে থাকে, শিরদাঁড়ার ভিতর শুড়্ শুড়্ করে, পায়ে সূচফোঁটার মত মনে হয়, আরও বহুপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, ক্রমে জ্যোতি ও নাদ এসে উপস্থিত হয়। অলৌকিক শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের আবির্ভাব হ'লে—লৌকিক রূপরসাদির প্রতি উপেক্ষা আসে, ভিতরে লাল নীল হল্‌দে শ্বেত ইত্যাদি অত্যুজ্বল আলোকের প্রকাশে সাধক আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হ'ন। কোটি শত প্রকার জ্যোতি আছে এবং কোটি সহস্রপ্রকার নাদ আছে। সে সমস্ত নির্ণয় ক'রবার সামর্থ্য কারও নেই। মেঘগর্জন, সমুদ্রকল্লোল, ভ্রমর-ধ্বনি, মধুকর-গুঞ্জন, বেণুবীণা, তন্ত্রীনাদ, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি কত নাদ আছে, তার সংখ্যা করা যায় না। জয়গুরু নাদ, গুরু গুরু নাদ, সোঽহং, ওম্ নাদ সাধক অনুভব করেন। অবিরাম সোঽহং নাদ যখন চল্‌তে থাকে, সাধকের সে নাদ থামাবার সামর্থ্য থাকে না। শেষে ওম্ নাদে সাধক ডুবে যান।

যখন নাদ ও জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের ভগবদ্-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তিনি সর্বত্যাগ করে দেন। অনন্যভাবে শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা ক'রতে থাক্‌লে তিনি আর স্থির থাক্‌তে পারেন না, ভক্তকে তাঁর প্রার্থিতরূপে দর্শনদান করেন, বর দেন, ইষ্ট অঙ্গে মন্ত্রের লয় হ'য়ে যায়, তিনি জীবন্মুক্ত হ'য়ে যান। যতদিন জীবিত থাকেন, সুষুম্নায় নাদময় হ'য়ে ওঙ্কার খেলা কর্‌তে থাকেন। তিনি জগৎকল্যাণব্রত গ্রহণ ক'রে আনন্দে প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রে পরমানন্দময় ধামে উপস্থিত হন। তিনি জল স্থল আকাশ মনুষ্য পশু-পক্ষী কীট-

পতঙ্গ যা কিছু দেখেন, সর্বত্রই ভগবৎস্ফূর্ত্তি হ'তে থাকে, "যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে", জগৎ বাসুদেবময় হ'য়ে যায়।

মন্ত্রযোগী, হঠযোগী, লয়যোগী, পাতঞ্জলযোগী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য—সকলের কাম্য জ্যোতিঃ, নাদ। জ্যোতিঃ নাদ ব্যতীত, জ্যোতিঃ নাদ বাদ দিয়ে, শান্ত হবার দ্বিতীয় পথ নাই। সকলেই চরমে নাদ প্রাপ্ত হয়। সকল সাধনার শেষ হ'ল নাদ, অনাহত ধ্বনি লাভ।

······নামসঙ্কীর্ত্তনকারিগণকে কিছু ক'রতে হয় না, কেবলমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে স্বয়ং নাদ এসে উপস্থিত হ'ন। সাধককে আলোকে পুলকে আনন্দে নিমজ্জিত ক'রে ভগবদ্দর্শন করিয়ে দেন······"*

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ॥

সৎ অসৎ যা কিছু সবই ওঙ্কার। মহাকাশে প্রাণস্পন্দনরূপে এই ওঙ্কার আবির্ভূত হইয়া তেজ জল পৃথিবীরূপে ঘনীভূত হওত মূর্ত্ত হন। স্থূল পাঞ্চভৌতিক যাহা কিছু সবই প্রণবস্পন্দন হইতে সঞ্জাত। আধিভৌতিক নরনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা পাষাণ লৌহ তাম্র সবই ওঙ্কারস্পন্দন। আধ্যাত্মিক চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সকল প্রণবস্পন্দনে উৎপন্ন, আধিদৈবিক সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই প্রণবস্পন্দনে সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি স্থূল পদার্থের অভ্যন্তরে আকাশ

---

* অন্ধ্ররাজ্যের গুণ্টুরে "মহাসাম্রাজ্যপট্টাভিষেকম্" উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত অভিভাষণ ('কলির পথ' নামে মুদ্রিত।)

নাদ জ্যোতি ও বায়ুরূপে প্রণব স্থূল পদার্থসমূহকে ধরিয়া আছেন। এমন পদার্থ কোন নাই, যাহা প্রণবস্পন্দন হইতে মূর্ত্তিগ্রহণ করে নাই।

যেরূপ ঘট শরাবাদি মৃন্ময় পদার্থে একমাত্র মৃত্তিকাই বিদ্যমান, যেমন হার বলয়াদির নানা আকার হইলেও স্বর্ণ ভিন্ন তাহাতে অন্য কিছু নাই, যে প্রকার রাগরাগিণীতে আশমীড় গমক ছুট্ ঝট্‌কাদি তালের অলঙ্কার বহুরকমে ব্যবহৃত হইলেও এক রাগিণী তাহা অন্য কিছু নয়, সেইরূপ এই ওঙ্কার ভিন্ন জগতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছু ছিল না, হইবে না এবং নাই—ওঙ্কারই নানারূপে এই সংসারে লীলা করিতেছেন। এমন কোন ভাষা নাই, যাহার দ্বারা ওঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারা যায়। মন ও বুদ্ধি, ওঙ্কারের তত্ত্ব হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

শাস্ত্রসমূহ ওঙ্কারের পরোক্ষতত্ত্বমাত্র বলিয়াছেন। বিনা ওঙ্কারের অনুগ্রহে ওঙ্কারতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদ আদি সমস্ত বাদই মহামহিমময় ওঙ্কারের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন! ওঙ্কারের নিকট সকল বাদই নির্বিবাদ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার করুণাকণাই প্রার্থনা করিতেছেন। ওঙ্কারের স্তুতিগানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়াছেন।

ওঙ্কারবাদেই সকল বাদের বাদবিসম্বাদ এক হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব শাক্ত সৌর গাণপত্য এই সমস্ত বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণও এক ওঙ্কারকে প্রথমে স্ব স্ব ইষ্টদেবতারূপে, জ্যোতি ও নাদরূপে, আকাশরূপে লাভ করিয়া চরমে ওঙ্কারেই একীভূত হ'ন।

এমন কি মুসলমান খৃষ্টানগণও শব্দব্রহ্ম ওঙ্কারের উপাসক।

তাঁহাদের কোরাণে ও বাইবেলে শব্দব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ইহা কথিত হইয়াছে। গ্রীকৃদর্শনেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

যতদিন মানুষ দৃঢ়ভাবে ওঙ্কারকে আশ্রয় করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। ওঙ্কার এই জগৎ-নাটক অভিনয় করিবার জন্য আপনার অপৃথগ্‌ভূতা শক্তি লইয়া নাট্যমঞ্চ হইয়াছেন, অভিনেতা সাজিয়াছেন। তিনিই অভিনয়, নাটক ও অভিনেতাগণের পোষাকপরিচ্ছদ করিয়াছেন, তিনিই দর্শকসমূহরূপে অভিনয় দেখিতেছেন, তিনিই অভিনয়দর্শনে কখন ক্রন্দন কখন বা হাস্য করিতেছেন।

তিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত। সব ওঙ্কার, জগৎ ওঙ্কার, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণু ওঙ্কার। এই ওঙ্কারই রসস্বরূপ, সে রস লাভ করিয়া মানুষ আনন্দী হয়। এই ওঙ্কার রসতম, এই ওঙ্কার ভূমা সুখ, ভূমা আনন্দ, ওঙ্কারকে যিনি আশ্রয় করিবেন তিনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।" *

তাঁর মতে সগুণ মন্ত্র লয় হইলে, সগুণ সাক্ষাৎকার হইলে তবেই ওঙ্কারের অধিকারী হওয়া যায়। বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যান মৌলিক, অভিনব। তাঁর নাম এবং নাদ একসূত্রে গ্রথিত। নামের পরিণতি নাদে, নাদের উৎসরণের জন্য নাম। তাঁর নামতত্ত্ব নাদতত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোততাবে জড়িত। স্ফোটবাদের অনুপ্রবেশ তাঁর নামতত্ত্ব এবং প্রণববাদকে স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

সর্ব আচার্যগণ প্রণবকে বাচকব্রহ্ম বলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মতে প্রণব বাচ্যব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রণব স্বয়ং ব্রহ্ম। প্রণবই লীলা করবার জন্য বাচকও সাজেন, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি বাচ্য ব্রহ্ম। অন্যে "প্রণবো বাচকো ব্রহ্ম", শ্রীঠাকুর "প্রণব এব ব্রহ্ম"।

---

* ব্রহ্মানুসন্ধানের 'উপসংহার' ২য় খণ্ড।

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের "সাধনা বিকাশ" ॥

*　　　*　　　*

"ওঙ্কারে"র সহিত কথোপকথন।

আচ্ছা, আমার ওঙ্কারে কি আছে? সপ্তাঙ্গ চতুষ্পাদ ত্রিস্থান পঞ্চদেবতা অ উ ম নাদ বিন্দু কলা কলাতীতা, তারপর তুমি কলাতীতার অতীত।

অকার রজোগুণ ব্রহ্মা, উকার সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, মকার তমোগুণ রুদ্র, নাদ বিন্দু কলা কলাতীতা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব।

চতুষ্পাদ বিশ্ব-তৈজস, প্রাজ্ঞ-তুরীয়। শ্রুতি বলেন—অবিদ্যা পাদ, বিদ্যা পাদ, আনন্দ পাদ, তুরীয় পাদ এই চতুষ্পাদ; ত্রিস্থান—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি; পঞ্চদেবতা—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর শিব।

আচ্ছা, আমার সপ্তাঙ্গে লয় কর।

অ-কার উ-কারে, উ-কার ম-কারে, ম-কার নাদে, নাদ বিন্দুতে, বিন্দু কলায়, কলা কলাতীতায়, কলাতীতা পরমব্রহ্মে, নির্গুণ নির্ব্বিকার পরমব্রহ্ম পরমাত্মা শেষ রহিলেন।

তোর স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয় লয় কর্।

ক্ষিতি অপে, অপ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, তন্মাত্রসহ আকাশ তামস অহঙ্কারে, ইন্দ্রিয়গণ রাজস অহঙ্কারে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ সাত্ত্বিক অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পুরুষে, নির্গুণ নির্বিকার পরমপুরুষ রহিলেন।

তা হ'লে ঈশ্বর জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান হ'লেও স্বরূপে কিছুমাত্র ভেদ নাই—এই তো?

হাঁ, আমি মায়োপহিত ঈশ্বর—জগৎটা মায়া! আমি এর অন্তর্য্যামী, তুই অবিদ্যোপহিত জীব, কেমন?

এইবার 'তৎ ত্বং অসি' বিচার কর।

তৎপদের লক্ষ্যার্থ মায়ারূপ উপাধিহীন শুদ্ধচৈতন্য মায়া ও তাহার কার্য্যরহিত চিন্মাত্র।

তৎপদের বাচ্যার্থ মায়া তৎকার্য্য সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ঈশ্বর। ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ—অবিদ্যারূপ উপাধিশূন্য, সমাধি দশা প্রাপ্ত, অবিদ্যা ও তৎকার্য্যরহিত চিন্মাত্র শুদ্ধচৈতন্য।

ত্বং পদের বাচ্যার্থ :—অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য কর্তৃত্বাদি গুণবিশিষ্ট শরীরাভিমানী জীব।

মায়া ও অবিদ্যা তোকে আমাকে ভিন্ন বলে দেখাচ্ছে, নচেৎ আমি তুই স্বরূপে ভিন্ন নই। তুই তোর স্বরূপ চিন্তা কর্।

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা ; 'জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।'

আমার ওঙ্কার

প্রিয়তম ওঙ্কারনাথ, ওঙ্কারের নাথ।

না—না, ওঙ্কার নাথ যার,—এই ভাল। 'অহমেব ত্বং' 'অহমেব ত্বং' 'অহমেব ত্বম্'—

ওঁ ওঁ ওঁ—ওঁ ওঁ ওঁ—ওঁ ওঁ ওঁ॥ ১

* * * * *

"অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে সচ্চিদানন্দময় আমিই আছি। চির-বিকারহীন অদ্বিতীয় আনন্দ অখণ্ড আমি আছি, আমিই আছি।

আমি—আমি—আমি, অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি—অস্মি……॥" ২

১। 'প্রপন্ন পথিক' দ্বিতীয় ভাগ ১৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

২। 'প্রপন্ন পথিক' দ্বিতীয় ভাগ ২১০ পৃষ্ঠা।

সব দর্শনেই দেখা যায় 'সোঽহং' পদই চরম অবস্থা। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায়, এখানেও দুই ভাব আছে। প্রকৃত চরম ও পরম অবস্থা 'অস্মি'। যে অবস্থার কথা কেউ জানাতে পেরেছেন কিনা জানা যায় না, ইনি সেই অবস্থার বর্ণনা করলেন।

॥ অভয় বাণী ॥

জয়গুরু।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মা ভৈঃ

ওরে প্রিয়তম, রোগে, শোকে, অভাবে দিবানিশি জ্বলছিস্? কেবল কাঁদছিস? না আর কাঁদিস্ না। আমার নাম কর্, তোর সর্বদুঃখ নিবৃত্তি হবে, সংশয় করিস না, ভক্তি শ্রদ্ধা থাক না থাক, অবিরাম নাম করলে তুই কৃতার্থ হবি।

তন্নাস্তি কর্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥

'এমন কোন কর্মজ, বাগ্‌জ বা মানস পাপ নাই, যা এ কলিযুগে আমার নাম কীর্ত্তনের দ্বারা নষ্ট না হয়।' নাম কর্, নাম কর্।

উঠ্‌তে বস্‌তে, খেতে শুতে, সুখে দুঃখে, অভাবে স্বাচ্ছল্যে, হেলায় শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অভক্তিতে, সজনে বিজনে, স্বপনে জাগরণে আমার নাম কর্। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোর সব ভার গ্রহণ করলাম, কোন কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। আমার প্রেমলাভে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি। নামময় হবি, তোর অতীত সপ্ত পুরুষ, ভবিষ্যৎ চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।

তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জুন॥
(আদি পুরাণ)

"হে অর্জুন, সেইহেতু দৃঢ়চিত্তে নাম ভজনা কর, নামযুক্ত আমার প্রিয়, তুমি নামযুক্ত হও।"

ওরে কলিযুগে নামরূপে আমি এসেছি। নাম কর, নাম কর। মা ভৈঃ—মা ভৈঃ—মা ভৈঃ। *

মহারসায়ন

॥ প্রথম স্পন্দন ॥

ওঠ্ রে জাগ্।

কে গো তুমি?

আমি রে আমি, যাকে তুই ডাকিস্, সেই আমি এসেছি—উঠে নাম কর্ না।

ওগো তুমি এসেছ! আমি কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, এতদিনে মনে পড়েছে? কে তুমি? কোথায় তুমি? আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

সে কিরে! আমায় দেখতে পাচ্ছিস্ না? এই যে আমি তোর সম্মুখে রয়েছি, এই যে পার্শ্বে রয়েছি, এই যে পশ্চাতে রয়েছি, ঊর্দ্ধে অধে, ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই রয়েছি। আমি যে বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি রে! আমি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।

---

* অভয়বাণী পৃষ্ঠা ৬-৮।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥
—শ্রীগীতা।

ক্ষিতিরূপী আমি—আমায় প্রণাম ক'রে নাম কর্। জল আমি—আমায় প্রণাম ক'রে নাম কর্। অগ্নি আমি, বায়ু আমি, ক্ষুদ্র আমি, বৃহৎ আমি, সৎ-অসৎ যা কিছু দেখ্ছিস্ শুনছিস, সব আমি; দশদিক্ আমার কান—তোর প্রতি ডাক, প্রতি কথা আমি শুনছি, আমি বধির নই। ডাক্ ডাক্, আমার নাম কর্। আমি তোকে আজ্ঞা ক'রছি,—যতক্ষণ তোর জিহ্বা স্ববশ আছে, ততক্ষণ তুই অবিরাম নাম কর্। ফলাফল, শান্তি-অশান্তি দেখে কাজ নেই, আমার আদেশ, আমি সন্তুষ্ট হব—তাই জেনে তুই নাম কর্। দেখ, তোর মুখে নাম শুনতে বড় মিষ্টি লাগে। তাই তোর কাছে কাছে বেড়াই, আর বলি—নাম কর্। তোর কপটতা, সংসার-আসক্তি আছে ব'লে নাম ক'রতে ভয় কি? তোর পাপ, তাপ, স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি, আধি, ব্যাধি সব নষ্ট ক'রে দিব, ওরে তুই নাম কর্।

বিষয় লয়ে উন্মাদ হ'য়ে থাকৃলে দুঃখভোগ করতেই হ'বে। নির্জ্জন আমি বড় ভালবাসি—তুই নির্জ্জনে বসে নাম কর্, আর আমি বসে বসে শুনি। দেখতে পাচ্ছিস্ না বলে, আক্ষেপ করিস না, আমি সময়ের অপেক্ষা ক'রছি, সময় হলেই দেখা দিব। নাম কর্, শান্তি পাবি; নাম কর্, অমর হবি; নাম কর্, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবি; নাম কর্, আমি শুনছি জেনে নাম কর্।

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি সর্ব্বদা।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

শিববিবাহ (নাটক)

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(রামবোলার দ্রুত প্রবেশ)

রামবোলা—রাম রাম রাম রাম, লক্ষ্মণের অগ্রজ রাম, ভরতের দাদা রাম, শত্রুঘ্নের বড় ভাই রাম, রাম রাম সীতাপতি রাম ; দশরথের পুত্র রাম, হনুমানের প্রভু রাম, সুগ্রীবের সখা রাম, বিভীষণের মিত্র নাম, রাম রাম রাম।

(তিনজন নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম—কি ব্যাপার কি ? অত রাম রাম ক'রে চীৎকার করছ কেন দাদা ?

রামবোলা—ভাইরে তোরাও বল্, বড় বিপদ—

দ্বিতীয়—কি হয়েছে দাদা ?

রামবোলা—বল্‌বো বল্‌বো—সব বল্‌বো। তোমরা একবার আমায় ঘিরে রাম রাম বলো ভাই।

সকলে—রাম রাম রাম রাম।

রাববোলা—সুর করে হাতত্তালি দিয়ে বল ভাই—

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম
জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

সকলে—(সুর করিয়া হাততা'ল দিয়া)

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম
জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

রামবোলা—আমায় ঘিরে নেচে নেচে বল ভাই সব।

সকলে—(রামবোলাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম

জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

প্রথম—(কিছুক্ষণ পরে) বলো কি হয়েছে ?

রামবোলা—রাম রাম রাম! বলছি ভাই, ভূত ভূত, বড় বড় প্রকাণ্ড ভূত, রাম রাম রাম।

দ্বিতীয়—কোথায় ভূত দেখলে বল ? কেবল রাম রাম করলে হবে কেন ?

রামবোলা—দক্ষ প্রজাপতি, "বৃহস্পতি সব" বলে এক যজ্ঞ করেন, তাতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, শিবকে করেন নি।

তৃতীয়—কেন ?

রামবোলা—বিশ্বসৃজগণের যজ্ঞে শিব দক্ষ-প্রজাপতিকে অভিবাদন করেন নি, শিব দক্ষ-প্রজাপতির জামাই জান তো ?

প্রথম—হঁা, জানি বৈ কি !

রামবোলা—তাঁকে অপমান ক'রবার জন্য দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। পিতৃগৃহে যজ্ঞ হচ্ছে শুনে সতী নিমন্ত্রণ না হ'লেও যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন, শিব বারণ করলেও সতী তাঁর নিষেধ না শুনে পিত্রালয়ে যান। সেখানে দক্ষের ভয়ে কেহ সতীর আদর অভ্যর্থনা করে না। প্রসূতি মা—তাঁর কথা স্বতন্ত্র। সতী যজ্ঞে শিবের ভাগ না দেখে যোগে দেহত্যাগ করেন।

দ্বিতীয়—বল কি দাদা !

রামবোলা—হাঁ, রাম রাম রাম।

তৃতীয়—তারপর, তারপর ?

রামমোলা—সতী দেহত্যাগ করলে ভূতেরা উৎপাত আরম্ভ করে।

ভৃগুমুনি যজ্ঞে আহুতি দিতেই ঋভু নামক দেবগণ সেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠে, ভূত ও গুহ্যকগণকে জ্বলন্ত আগুনের দ্বারা প্রহার করে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দেয়। রাম রাম রাম! ভাই, একটু এগিয়ে দেখে এসো দিকিনি, ভূতেরা আসছে কিনা।

প্রথম—না দাদা, ভয় নেই, তুমি বল।

রামবোলা—হাঁ, রাম রাম রাম। তারপর নারদের মুখে সেই কথা না শুনে, মহাদেব মহাক্রোধে মাথা থেকে একটা জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন। যেমন ফেলে দেওয়া, অমনি রে ভাই—তা থেকে প্রকাণ্ড দেহ—আকাশে ঠেকেছে বল্‌লেই হয়, কুচ্‌কুচে কালো তিনটে চোখ—যেন সূর্য্যের মত জ্বলছে, বড় বড় দাঁত, চুলগুলো আগুনের মত, কপাল-মালাধারী, হাতে নানারকম অস্ত্র নিয়ে বীরভদ্র দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে, ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে শিবকে বল্‌লে—"কি করবো?" তিনি বল্‌লেন—"আমার ভূতপ্রেতের সেনাপতি হয়ে, তুমি যজ্ঞের সহিত দক্ষকে ধ্বংস কর।" ব্যস্! যেমন বলা, অমনি—রাম রাম রাম রাম ভাই! তোমরাও বল রাম রাম রাম রাম।

তৃতীয়—দাদা, তুমি বল, আমরা রইছি—ভয় কি?

রামবোলা—ভাইরে, তোমরা তো তাকে দেখনি, তাই ওই কথা বল্‌ছো? তারপর কারুর তিনটে মাথা, আড়াইটে পা, কারুর পেটে-চোক, কারুর নাকে মুখ, কারুর মাথায় সাতপাটী দাঁত, কারুর একটা পা, কেউ মাথা দিয়ে হাঁটছে, কেউ পেট দিয়ে দৌড়ুচ্ছে, এই রকম ভূতের পালকে সঙ্গে নিয়ে বীরভদ্র মশাই সেখানে এসে একেবারে মার মার করে পড়লো। কেউ অগ্নিশালা, কেউ পত্নীশালা ও অন্যান্য ঘর-দোর ভাঙ্গতে আরম্ভ করলো, কেউ হোতার হাত থেকে যজ্ঞপাত্র

কেড়ে নিয়ে প্রহার আরম্ভ ক'রলে। বীরভদ্র মশাই মুতে যজ্ঞকুণ্ড ভাসিয়ে দিলে। যে যেখানে পারলে পালিয়ে গেল। সে কি মহা-মারী কাণ্ড রে ভাই। রাম রাম রাম রাম।

প্রথম—তারপর তারপর ?

রামবোলা—সভায় ভৃগুমুনি শিব-নিন্দার সময় হেসেছিলেন বলে মণিমান্ তাঁর বুকে বসে দাড়ি উপড়ে ফেল্‌লে, সে সময় নেত্রভঙ্গি করে-ছিল বলে ভগের চোক্ উপড়ে কানা করে দিলে, পুষা দাঁত বের করে হেসেছিলেন বলে একেবারে তার দুপাটী দাঁত ভেঙ্গে রক্তারক্তি করে দিলে, তারপর বীরভদ্র হাড়কাটে ফেলে দক্ষের গলা কেটে ফেল্‌লে। রাম রাম রাম রাম—সে কি ভূতের নেত্য রে ভাই—রাম রাম রাম। ভাইরে, তোরা একবার রাম রাম কর—রাম রাম রাম রাম। (কম্প)

সকলে—ভয় নেই, ভয় নেই। রাম রাম রাম। জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

রামবোলা—ভাইরে! আমি সেই ভয়ানক ভীষণ প্রচণ্ড বিকট ভূতগুলোর নেত্য স্বচক্ষে দেখেছিরে, রাম রাম রাম।

প্রথম—তুমি কি ক'রে পালিয়ে এলে ?

রামবোলা—আমি উত্তরদিকে ধূলোর অন্ধকার দেখেই আগেই সরে প'ড়েছিলাম। ভূতেদের কাণ্ড দেখে আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে গায়ত্রী জপ ক'রতে গেলাম—বেরুল না, ভূ ভূ ভূ—জিব কেবল ভূ ভূ ভূ ক'রতে লাগলো—তখন কি করি! সহজ সোজা রাম রাম করতে লাগলাম—রাম রাম রাম।

দ্বিতীয়—তাহ'লে বড় ভয়ানক কাণ্ড হ'য়ে গেছে ?

রামবোলা—তা আর ব'লতে! রাম রাম রাম—ভাই মাটিটা কাঁপছে নয় ? হয়তো ভূতেরা আসছে—রাম রাম রাম।

তৃতীয়—না না, ভয় নেই, ভয় নেই।

রামবোলা—বাবা! রাম নাম হেলা ক'রে বল, শ্রদ্ধা করে বল, ঠাট্টা ক'রে বল, হাসতে হাসতে বল—যেমন ক'রেই বল, নিস্তার নেই, রাম রাম রাম।

প্রথম—আচ্ছা, মাটি সত্যি সত্যিই কাঁপছে।

দ্বিতীয়—তাইতো গাছপালাগুলো পর্য্যন্ত কাঁপছে।

রামবোলা—রাম রাম রাম! আমার কথা বিশ্বাস ক'রলে না দাদা—ওই দেখ থর থর ক'রে মাটি কাঁপছে! রাম রাম রাম! আর এখানে নয়—ভূতেরা এখানে পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। সবাই মিলে রাম রাম ক'রতে ক'রতে এখান থেকে পালাই চল।

তৃতীয়—সেই ভাল কথা, যঃ পলায়তি স জীবতি।

রামবোলা—বল, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম
জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

(গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

সুধার ধারা

জপ নাম জপ নাম অবিরাম মন।
পাইবে পরম শান্তি জিনিবে শমন॥
নাম হ'তে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে উদয়।
নামের মাঝারে ভাসে বস্তুসমুদয়॥
নামই হইয়া ঘন সাজেন সংসার।
জীবরূপে নাম হেথা করেন বিহার॥
নরনারী পশুপক্ষী কীট ও পতঙ্গ।
সাজি বহুরূপে নাম করেছেন রঙ্গ॥

নাম দিবা নাম রাত্রি নাম পক্ষ মাস।
নাম ছয় ঋতুরূপে হয়েন প্রকাশ॥
নাম সূর্য্য নাম চন্দ্র নাম গ্রহদল।
নাম আলো অন্ধকার নামই সকল॥
নাম নদী নাম গিরি নাম পারাবার।
নাম বৃক্ষ নাম লতা নাম সর্ব্বাধার॥
স্মর রাম বল রাম গাও রাম রাম।
হইবে কৃতার্থ তুমি দাস সীতারাম॥

কবিতা

গাও বীণা গাওরে
আমার সাধের বীণা রাম গুণ গাওরে।
গাওরে শ্রীরাম কথা গাওরে জানকী ব্যথা
গাওরে ভকত গাথা গাওরে॥
গাওরে জনম গান গাওরে রাক্ষস ত্রাণ
পাষাণের প্রাণ দান গাওরে।
গাও হরধনুভঞ্জন জানকী-পাণি-পীড়ন
ভার্গবতেজহরণ গাওরে॥
গাওরে বনগমন পিতৃসত্যপালন
গুহক মিলন গান গাওরে॥
চিত্রকূটে অবস্থান পিতৃপিণ্ড নির্ব্বপণ
ভরতে পাদুকাদান গাওরে।
পঞ্চবটী নিবসন রাক্ষসী নাসা কর্ত্তন
খর দূষণ্ নাশন গাওরে॥

মায়ামৃগ বিনাশন গাওরে সীতাহরণ
রাম রাণী বিলাপন গাওরে।
রঘুনাথ ক্রন্দন গাও সীতা অন্বেষণ
কানন পরিভ্রমণ গাওরে।
গাও বালী বিনাশন তারারে সান্ত্বনাদান
সুগ্রীব অভিষেচন গাওরে॥
গাও বানর প্রেরণ মারুতি সিন্ধু লঙ্ঘন
রাক্ষস পুর দর্শন গাওরে।
গাওরে অশোকবন সীতাসহ সন্দর্শন
গাওরে॥

গান

চির মঙ্গলময় ভগবান্
যা করেন তিনি সকলই মঙ্গল—
গাহে বেদ পুরাণ।
মঙ্গলে উৎপত্তি—মঙ্গলে স্থিতি—
মঙ্গলে অবসান
বিজয় মঙ্গল—অজয় মঙ্গল—
মঙ্গল মান অপমান।
জয় জয় জয়—জয় জয় জয়—
জয় মঙ্গলময় ভগবান্

গান

জাগ মহাশক্তি জাগগো আবার
নারীধর্ম্ম যে মা হয় ছারখার॥

ঘুমাইও না আর মেল গো নয়ন,
কতদিন রবে হ'য়ে অচেতন ?
জাগগো জাগগো জননী আমার
পতিধর্ম্মমর্ম্ম পতির সাধনা
প্রচার ভারতে (করি) পতি আরাধনা,
পতিই দেবতা ঘোষ অনিবার ॥
দেবভাবে মাগো স্বামীরে পূজিলে
দেবী হয়ে যাবে স্বামীশক্তিবলে,
ভাবনা যাতনা রবে না গো আর ॥
তোমার আদেশে (পুনঃ) আদিত্য উঠিবে,
তোমার ইচ্ছায় অঘটন হবে,
যা' বলিবে তাহা করিবে আবার ॥
বিপন্ন হইয়া তোমার সকাশে
এসেছি জননি জাগাবার আশে
জাগিয়া কর মা (নারী) ধর্ম্মের উদ্ধার ॥

'কিমসি গঠিতস্তৎ কথয় মে'

গুরো ! শঙ্কর ! আমায় দীন করিয়া দাও প্রভো। যে দীনতা দিয়াছ, ইহা যেন চির-প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমি যে আচণ্ডাল প্রত্যেক নরনারী হইতে দীন—পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা হইতে দীন, এ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দাও প্রভো! প্রত্যেকের কাছে আমার শিখিবার জিনিষ আছে, প্রত্যেকে আমা হইতে উচ্চ, সকলেই গুরু ! প্রতি মানবে, জলে স্থলে, অনিলে অনলে, বিহগের কাকলীতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, বনকুসুম-সৌরভে, তরুণ অরুণে, চন্দ্রকিরণে, নব

নীরদে, এইরূপ ত্রিভুবনের যাহা কিছু সুন্দর তাহাতে তুমি ব্যষ্টিভাবে বিরাজ করিতেছ; পক্ষান্তরে বজ্রের ভৈরব গর্জ্জনে, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে, আদি-অন্তহীন বিশাল প্রান্তরে; পেচকের কর্কশকণ্ঠে, দাবদগ্ধ অরণ্যে, মরীচিকায়—আমি মূর্খ কত বলিব, ভালমন্দে, অণু পরমাণু সকলেই তুমি আছ,—সকলই তুমি; তুমিই একথা বলিয়াছ। তাহা হইলে সকলেই আমার পূজ্য, সকলেই আমার প্রণম্য। তোমার আশীর্ব্বাদে সকলের পদতলে যেন এ উন্নত শির নত করিতে পারি। আমি দীন হইতে দীনতম—এ বিশ্বাস স্থায়ী করিয়া দাও। উপদেশ-প্রদানেচ্ছু জিহ্বাকে নিরস্ত করিয়া কর্ণকে উপদেশ শুনিতে নিযুক্ত করিয়াছ, আমার দম্ভ আমার গর্ব্ব সব কাড়িয়া লইয়া আমায় ধূলিকণায় পরিণত করিয়াছ; প্রাণেশ্বর! চিরদিন যেন তোমার এ আশীর্ব্বাদ নিশ্চল থাকে।

আমি গুণহীন, আমি বিদ্যাহীন, আমি শক্তিহীন, রূপহীন; আমার কিছু নাই—একথা আমি যেন ভুলিয়া না যাই। যে আমিত্বে আমি সকলের বড়, সকলের অপেক্ষা বিদ্বান্, সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ মনে হয়, সে আমিত্ব একেবারে নষ্ট করিতে বলিতেছি না। তাহা নষ্ট হইলে দেহ বাক্য ত থাকিবে না। এ দেহ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমি মূর্খের শ্রেষ্ঠ; জগৎ নিকৃষ্ট বলিয়া যাহা জানে, আমি সেই নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতম। এ দেহে, এ আমির প্রতিষ্ঠা করিয়া, কর্ত্তা কাড়িয়া লইয়া দাস আমি করিয়া দাও; তাহা হইলে আর আমাকে বিদ্যার ঝুড়ি মাথায় করিয়া প্রতিপক্ষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। ওহো! কি নিশ্চিন্তের প্রশান্ত সাগর! আমা অপেক্ষা মূর্খ আর নাই—কি আনন্দ, আর আমা অপেক্ষা শিক্ষিতের কাছে ভয় এবং অশিক্ষিতের কাছে পাণ্ডিত্য, এই দুইটাই নাই। আমি অতি বড়

মূর্খ, জিহ্বা নীরব, মস্তক সকলের পদে নত হইবে, এ একটি বিমল আনন্দের অতীত অবস্থা। সুন্দর! সুন্দর! অতিসুন্দর! এমন সুন্দর জিনিষ কোন গুপ্তকক্ষে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলে প্রভো!

সকলেই যখন আমার গুরু, আমি কাহাকে উপদেশ দিব! উপদেশের সাতনলা লইয়া অজ্ঞানরূপ পক্ষী সংহার করিতে লোকের দ্বারে দ্বারে আর ঘুরিতে হইবে না। আমা অপেক্ষা তার্কিককে উপদেশ দিতে যাইয়া ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমা অপেক্ষা বাক্‌পটুতাহীনকে উপদেশ দিয়া, 'ইহার একটু উপকার করিলাম'—এরূপ একটা আত্মতৃপ্তির পুঁটুলী বাঁধিতে হইবে না।

তা বেশ, আনন্দের পাশে নিরানন্দ, সুখের পাশে দুঃখ, শান্তির পাশে অশান্তি, আলোকের পাশে আঁধার, রোগের পাশে আরোগ্য, বিরহের পাশে মিলন, অমাবস্যায় পাশে পূর্ণিমা, দিবার পাশে রাত্রি, জীবনের পাশে মৃত্যু, ক্রন্দনের পাশে হাস্য, তৃপ্তির পাশে অতৃপ্তি, শোকের পাশে হর্ষ—এইটাই জাগতিক নিয়ম; কিন্তু এ মহাদীনতার অতীত জিনিষের পাশে ত কিছু নাই। দীনতার পাশে উচ্চতা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও এটা তা নয়—মহানবমীতে ছাগশিশুর বলির মত এই দুইটাকে বলি দিয়া এদের রক্তে মন্দির রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে শুধু মহানবমীর স্মৃতির মত, চির নবীনা, চির পুরাতনী, পুণ্যময়ী, মহিমময়ী, মহতী স্মৃতি।

সেই সে খড়্গখানা অনাদরে অন্ধকারে থাকিয়া মরিচা পড়িয়াছিল, একদিন শান্ত, স্তব্ধ, অরুণ-কিরণ-ঝলকিত, শান্তিময়, সুখময়, মধুময়, প্রভাতে কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীতে, কি এক মধুর হইতে মধুরতম হৃদয়-উন্মাদকারী প্রেম-সঙ্গীত শুনাইলে! কি জানি সে প্রেমময় বিমোহন সঙ্গীতের কি গুণে—কি জানি কেন খড়্গখানা আবার

শাণিত হইয়া গেল, জানি না কিরূপে সেই মরিচাগুলা কোথায় যাইল! তবে ইহা আমি স্থির জানি, সব তোমার দয়া।

তাহার পর সেই শাণিত খড়্গখানা দ্বন্দ্বগণের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া দ্বন্দ্বশূন্য হইয়াছে এবং তাহাদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। সে এক ভীষণ ঝটিকা—সে এক ভীষণ কোলাহল খড়্গখানার বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে। নির্দ্বন্দ্বরূপ স্থির সরসীসলিলে একটা কমল ফুটাইয়াছ এবং বলিয়াছ— এ পদ্মগন্ধ পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইবে। কমলিনী তাহার পরাগমাখা বুকখানি লইয়া তোমার আশীর্ব্বাদরূপ মৃদু-মলয়-মারুৎ-হিল্লোলে কম্পিত হইয়া সরোবরের শোভা শতগুণ সংবৰ্দ্ধিত করিয়াছে। যেন কাহার আশাপথে চাহিয়া আছে, যেন কি এক সত্যের, কি এক আলোর দেবতা আসিবে; তাই থাকিয়া থাকিয়া মধুকরের মধুর স্বরের সহিত স্বর মিলাইয়া কি এক সুধামাখা সঙ্গীতের লহর তুলিয়াছে।

কি আনন্দ! আমি সকলের অপেক্ষা ছোট, আমা হইতে আর নিকৃষ্ট নাই। সকলেই গুরু, শাস্ত্রজ্ঞগণ যশঃ, অর্থ, পাশের লোভে ধর্ম্মের ব্যভিচার করিতেছেন। তার প্রতিবিধানের জন্য তাঁহাদের সহিত বিচারের আর ইচ্ছা নাই। ব্যবসাদার গুরুগণ দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন—তাহা ভাবিয়া ক্রোধে দিশাহারা হইতাম, উহা আর উপস্থিত নাই। সকলে সুখ দুঃখ লইয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে না। এখন সে সব নাই, এখন সকলেই আমার গুরু। আমি যে সকলের নিকৃষ্ট, আমি কার দুঃখ দূর করিব! ব্যষ্টি সমষ্টিতে তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ, এতদিন কেন শিখাও নাই প্রভো! তুমিই শিখাইয়াছ—গুরু মন্ত্র ইষ্টদেবতা সকলই এক ভাবিতে হয়, গুরুতে মানুষবুদ্ধি করিতে নাই—গুরুই শিব—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই মহামন্ত্র শুধু জিহ্বার দ্বারা বৈখরী উচ্চারণ করিলে হইবে না, মধ্যমা পশ্যন্তী অতিক্রম করিয়া পরা অবস্থায় যাইতে হইবে। এ মহামন্ত্র সাধন করিতে হইবে। এ মন্ত্র সাধন করিয়া যেদিন সিদ্ধিলাভ করিবে,...। সমষ্টিরূপ আমার পূজা কর, সেবা কর, ব্যষ্টি জগৎরূপ আমার কাছে এ মহামন্ত্র শিক্ষা কর। কিরূপ সাধন করিলে এ মহামন্ত্র সিদ্ধ হইবে, শিক্ষা কর। তুমি অতি নিকৃষ্ট,—শিক্ষা কর। জিহ্বা, হৃদয় একতানে এ মহামন্ত্র উচ্চারণ কর। তুমি অতি দীন, অতি হেয়, অতি তুচ্ছ—শিক্ষা কর।

সেইজন্য সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি—হে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অনিল, অনল, আকাশ, অবনী, সলিলরূপ গুরুগণ! আমি তোমাদের সেবকাধম, আমাকে এ মন্ত্র শিক্ষা দাও—কিরূপ-ভাবে গাহিলে, কিরূপভাবে সাধিলে, কিরূপভাবে উচ্চারণ করিলে জিহ্বা, হৃদয় এক হইয়া যায়—শিক্ষা দাও। সকলকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমায় বলিয়া দাও। হে শঙ্কর! একদিন কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে জানি না—

"গুরুর্ব্বা তেঽহং বৈ কিমসি গঠিতস্তৎ কথয় মে"

তুমি কিরূপে গঠিত হইয়াছ? আমাকে বল। তাই তদুত্তরে তোমার দেওয়া ভাব, তোমার দেওয়া ভাষা, তোমারই চরণে ডালি দিলাম, যাহা ইচ্ছা কর!

আমাকে শক্তি দাও! এ মহামন্ত্রসাধনের প্রণালী বলিয়া দাও, আমি হৃদয়-বাক্য একসুরে বাঁধিয়া বলি—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥*

দিগসুই
৭ই বৈশাখ, ১৩২৫ সন }

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোষ্ঠী বিচার

শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন স্মৃতিতীর্থ

[শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে অনেকেই তাঁহার একটী পূর্ণাঙ্গ কোষ্ঠী বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে ভট্টপল্লীর বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে ঠাকুরের সকল পরিচয় সযত্নে গোপন করিয়া মাত্র তাঁহার জন্মের সন ও ক্ষণ জানানো হইয়াছিল। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যে জন্মপত্রিকা রচনা করিয়াছেন এবং উহার ফলাফল যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইল।]

সন ১২৯৮, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, দিবা ঘ ৮।১ মিঃ কৃষ্ণাপঞ্চমী। ইংরাজী ১৮৯২, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

---

* পাগলের খেয়াল।

শকাব্দা—১৮১৩।১০।৫।৪।৩০।৩৫

রা ০।৫৮
৩

শু ১২।১৭
২৬
বৃ ১।১১
২৫
লং ১২
র ৫।৪৪
২৩

বু ২৬।১১
২৩

চং ২৩।৫৭
১৪
বঃ শ- ৮।৪৭
১২

মং ২০।৩৩
১৮
কে ৩।৫৮
১৬

আয়ুর্যোগ—৩ × ৩ লগ্ন + ৮ম পঃ

৩ × ৩ লং + চং

মধ্যায়ুঃ

লগ্নে গুরু কক্ষা বৃদ্ধি দীর্ঘায়ুঃ

লগ্নে লগ্নপতি গুরু ও শুক্র পূর্ণায়ুঃ সূচক।

প্রমাণ বুধো বা ভার্গবো বাপি গুরুর্ব্বা কেন্দ্রসংস্থিতঃ। শতায়ুর্বলবান্ বিজ্ঞো জাতো গোত্রাধিপো ভবেৎ।

শতায়ুর্যোগঃ। শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে।

(১) ভাগ্যপতি মঙ্গল নবমে, লগ্নে লগ্নপতি গুরু (স্বগৃহে) থাকায় ধর্ম্মসাধনায় বিপুল সিদ্ধির যোগ বুঝাইতেছে। জাতক গোত্রাধিপ ও ধর্ম্মজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(২) সপ্তমে শনি চন্দ্রের যোগ সর্ব্বসম্পদ্-সূচক।

বৈরাগ্যপতি শনি সংসারে অনাসক্তির বোধক।

(৩) তৃতীয়ে রাহু, নবমে কেতু, উচ্চস্থ ও শুক্র লগ্নে উচ্চস্থ থাকায় ষড়ৈশ্বর্য্য লাভের সূচক।

(৪) আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ণযোগ পরিলক্ষিত হয়।

বিংশোত্তরীমতে দশাবিচার ঃ

মং	৬।৮।৪
রা	১৮
	২৪।৮।৪
বু	১৬
	৪০ ৮।৪
শ	১৯

৫৯।৮।৪ শনি বুধের বিনিময়-যোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ বঞ্চিত করিতে পারে।

বৃ বু ২।৪।২৭

———

৬২।১।১ বর্ত্তমানে বরাহমতে বু-কে চলিতেছে।

বু কে ০।১১।২৭

———

৬৩।০।২৮ আত্মোন্নতি লাভ উচ্চস্থ কেতু থাকায় শুভপ্রদ।

বৃ শু ২।১০।৮

———

৬৫।১০।২৮ বু-শু ফল সাময়িক দৈহিক ক্লেশ, কিন্তু উচ্চস্থ শুক্রের প্রভাবে ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণ বিকাশ লাভ।

বু র ০।১০।৬

———

৬৬।৯।৪ নেত্রপীড়া ও চর্ম্ম রোগাদি। সর্ব্ব সম্পদ্ লাভের যোগ, দূরযাত্রা, তীর্থসেবা, মোক্ষযোগমার্গে চরম উন্নতি বোধক জ্ঞানের প্রচার।

বু চং ১।৫।০

———

৬৮।২।৪

বু মং ০।১১।২৭

———

৬৯।২।১

বু রা ২।৬।১৮

———

৭১।৮।১৯ ধনাগমের বৃদ্ধি। প্রচার বৃদ্ধি।

বু বৃ ২।৩।৬

———

৭৩।১১।২৫ পূর্ণ সৌভাগ্য লাভ। ধর্ম্ম-সাধনায় পূর্ণ রাজযোগ

বু শ ২।৮।৯

———

৭৬।৮।৪ সাময়িক দেহক্লেশ, বায়ুপীড়া।

কে ৭

———

৮৩।৮।৪ উচ্চস্থ কেতুর দশায় পূর্ণ প্রতিপত্তি।

শুক্র ২০

———

১০৩।৮।৪ শুক্রদশায় দেহরক্ষা।

প্রমাণ :

"পুণ্যাধিপঃ পুণ্যগৃহে চ কেন্দ্রে চন্দ্রপ্রভাযোগ ইহ প্রণীতঃ।
রাজাধিরাজো গুণবান্ বরেণ্যো গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনং যঃ॥
ভাগ্যাধিনাথোঽপি চ ভাগ্যকর্ত্তা শুক্রোঽপি পাপৈঃ সহচেত্রিষু স্যাৎ।
ষড়াদিভাবেষু চ ভাগ্যহীনং কেন্দ্র ত্রিকোণায় গতোঽপি ভাস্বন্॥
একস্থিতৌ তন্বকর্ম্মপৌ যদি তয়োরেকাধিপত্যেঽপি চ।
জাতঃ স্বার্জ্জিতসদ্ধনেন কুরুতে যজ্ঞাদিকর্ম্মোৎসবম্॥
বুধো বা ভার্গবো বাপি গুরুর্ব্বা কেন্দ্রস্থিতঃ।
শতায়ুর্ব্বলবান্ বিজ্ঞো জাতো গোত্রাধিপো ভবেৎ॥

স্তুতেশে কামগে মানী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ।
তুঙ্গ বষ্টি ধনস্বামী ভক্তিভাক্ চৈব তেজসা॥
ধনধান্যযুতো নিত্যং গুণ-সৌন্দর্য্য-সংযুতঃ।
বহু-ভ্রাতৃ-সুখং যুক্তং ভগ্যেশে নবমে স্থিতে॥
দশমেশে শুভে লগ্নে কবিতাগুণসংযুতঃ।
বাল্যে রোগী সুখী পশ্চাদর্থবৃদ্ধির্দিনে দিনে॥

ঐসকল প্রমাণ অনুসারে বুঝায় যে, জাতক গোত্রাধিপ, দীর্ঘজীবী, পুণ্যাত্মা, যজ্ঞাদিসৎক্রিয়াবান্, প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ধর্ম্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ ও মোক্ষলাভ করিবেন। দেহধারণ হইলে রোগ নিত্য সহায় হইয়া থাকে—এখানে বুঝা যায় রবি দ্বাদশে থাকায় নেত্ররোগ, ষষ্ঠপতি রবি পিত্তরোগ এবং লগ্নে শনির পূর্ণ দৃষ্টি হেতু শ্লেষ্মাসংযুক্ত বায়ু-প্রকোপ হাঁপানী শ্বাস কাসাদি হইবার যোগ দেখা যায়। বরাহ মতে চন্দ্রের দ্বিতীয় দ্বাদশে গ্রহ না থাকায় কেমদ্রুম যোগ হইয়াছে। গুরুদৃষ্ট চন্দ্র জীবযোগ হেতু ঐ কেমদ্রুম যোগ ভঙ্গও হইতেছে।

বর্ত্তমানে বয়স ৬১ বর্ষ ৪ মাস ১৪ দিন হইয়াছে।
বরাহমতে ৬২ বর্ষ ৩ মাস ৪ দিন হইয়াছে।

বুধের দশায় কেতুর অন্তরে আত্মোন্নতিও লাভ হইবে। ৬৩ বর্ষ পরে বু-শু পড়িবে। শুক্র অষ্টমপতি বলিয়া শুভ নহে। ঐ সময়ে লগ্ন হইতে রন্ধ্রগত শনির প্রভাব হইবে। ১৩৬০ সালের ৫ই ভাদ্র হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত রন্ধ্রগত শনির প্রভাব আসিলে সকল কার্য্যে বিঘ্ন ও বিলম্ব হইতে পারে। সাধকের সিদ্ধ জীবন হইলেও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হইতে পারে—প্রমাণ অপমানং তথা নিন্দা শোকগ্লানির্ধনক্ষয়ঃ। রোগমৃত্যুমনস্তাপো মৃত্যুরষ্টাবিধঃ স্মৃতঃ। এই কারণে রন্ধ্রগত

শনি প্রীত্যর্থে ৶দক্ষিণা কালিকামন্ত্রজপাদি কর্ত্তব্য। পরাশর বলিয়াছেন "কালী কৈবল্যদায়িন্যাঃ পূজনং শরণং ব্রজেৎ।"

সিদ্ধ পুরুষের জীবন ধন্য হয়।

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন॥"

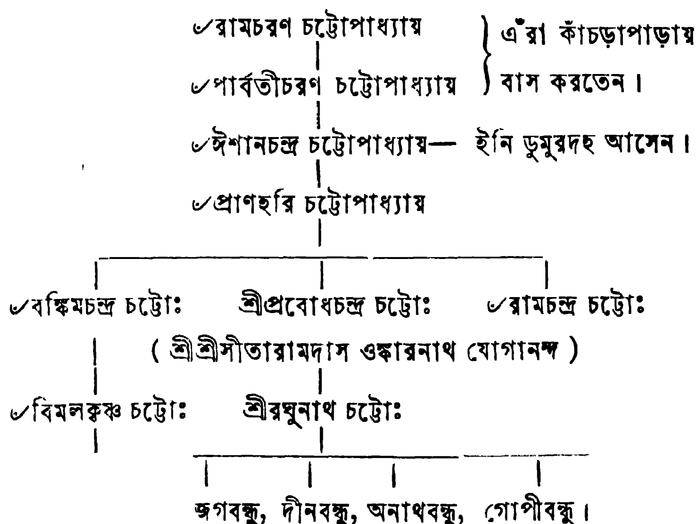
—০—

রামানন্দ শ্রীসম্প্রদায়

বর্ত্তমান নাম—শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়।

বংশ পরিচয়

কাশ্যপ গোত্র, শ্রীকৃষ্ণের সন্তান, সর্বানন্দী মেল, পাটুলি গাঁই, আদিবাস বিল্বপুষ্করিণী। বর্ত্তমান বাসস্থান—ডুমুরদহ, হুগলী।



—০—

শ্রীঠাকুরের আশ্রম, মঠ ইত্যাদি

১। শ্রীরামাশ্রম, পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী।

২। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মঠ, কেওটা, পোঃ সাহাগঞ্জ, হুগলী।

৩। শ্রীরামনাম মন্দির, সাধন সমিতি, পোঃ দিগসুই, হুগলী।

৪। মহাপ্রয়াণ মঠ, পোঃ তারিঘাট, গাজিপুর, ইউ. পি।

৫। শ্রীরামাশ্রম, ২৮।১৮০, পাণ্ডে হাবেলি, পোঃ বারাণসী, ইউ. পি।

৬। শ্রীগুরুধাম মঠ, কুশমা, মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা।

৭। নীলাচল আশ্রম, শ্রীমন্দির, চটক পাহাড়, পোঃ ও জেঃ পুরী, উড়িষ্যা।

৮। শ্রীরামানন্দ মঠ, পোঃ দিগসুই, হুগলী।

৯। ওঙ্কার মঠ, ওঙ্কারেশ্বর, পোঃ মান্ধাতাওঙ্কারজী, জেলা নিমার, মধ্যপ্রদেশ।

১০। লবকুশ আশ্রম, বিঠুর, কানপুর, ইউ. পি.।

১১। মদনমোহন মন্দির, কুণ্ডুঘাট লেন, পোঃ চন্দননগর, হুগলী।

১২। গিরিবালা আশ্রম, বাতনা, পোঃ পিণ্ডীরা, হুগলী।

১৩। শ্যামাশঙ্কর আশ্রম, পোঃ জেজুর, হুগলী।

১৪। গোপাল মঠ, পোঃ গোপালপুর, হুগলী।

১৫। আনন্দ কানন, পোঃ মগরা, হুগলী।

১৬। শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায় আশ্রম, মনসাতলা, পোঃ ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

১৭। হেমাঙ্গিনী মঠ, পোঃ মেমারী, বর্দ্ধমান।

১৮। শ্রীপঞ্চানন আশ্রম, সোৎখানি, পোঃ ভাতার, বর্দ্ধমান।

১৯। আনন্দ মঠ, পোঃ গণপুর, বর্দ্ধমান।

২০। কেদারনাথ আশ্রম, জাথ্‌রা, পোঃ বোহার, বর্দ্ধমান।

২১। তুলসীদাস আশ্রম, পি ১৯, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০।

২২। যোগেন্দ্র মঠ, গঙ্গাসাগর, ২৪ পরগণা।

২৩। যোগেন্দ্র আশ্রম, পোঃ তালপুকুর, ২৪ পরগণা।

২৪। রামদয়াল আশ্রম, দশেড়ে, পোঃ লাউগ্রাম, বাঁকুড়া।

২৫। সরোজিনী মঠ, কৃষ্ণপুর, পোঃ হিজুলী, ভায়া রানাঘাট, নদীয়া।

শুধু মায়েদের জন্য আশ্রম

২৬। মাল্যবতী আশ্রম, গোবিন্দঘেরা, পোঃ বৃন্দাবনপুর, জেলা • মথুরা, ইউ. পি.।

২৭। সরোজিনী মঠ, পুরী।

২৮। কুমারী মঠ, বক্তার নগর, রাণীগঞ্জ।

বেদ প্রচার কেন্দ্র ও সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র

১। শ্রীব্রজনাথ চতুষ্পাঠী, ডুমুরদহ, হুগলী।

২। সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫।

অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামপ্রচার কেন্দ্র

১। "নামদুর্গ", শ্রীরামাশ্রম, ২৮।১৮০, পাণ্ডেহাবেলি, বারাণসী, ইউ. পি.।

২। নামকীর্ত্তন মণ্ডপ, পোঃ গঞ্জাম, বহরমপুর, উড়িষ্যা।

৩। মহামন্ত্র ভবন, পোঃ নবগ্রাম, বর্দ্ধমান।

৪। গোবিন্দ মন্দির, পোঃ নবগ্রাম, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীনীলাচল আশ্রম, পুরী, উড়িষ্যা।

৬। আনন্দ কানন, মগরা, হুগলী।

৭। রামদয়াল আশ্রম, দশেড়ে, পোঃ লাউগ্রাম, বাঁকুড়া।

৮। অখণ্ড নাম মণ্ডপ, শ্রীনীলাচল আশ্রম, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

৯। কানপুর, পোঃ পাহাড়হাটি, জেঃ বর্দ্ধমান।

১০। বারুইপুর, ২৪ পরগণা।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য লওয়া হয়েছে ঃ—

ব্রহ্মানুসন্ধান, জীবনীর উপাদান, পাগলের খেয়াল, আয় ফিরে আয় মা, মহারসায়ন, শিববিবাহ নাটক, কথারামায়ণ, গুরুগীতা, গুরুমহিমামৃত, শ্রীশ্রীঠাকুরের ডাইরী, মন্নাথ, কলির পথ, অভয় বাণী, প্রপন্ন পথিক, সুধার ধারা, স্তবকুসুমাঞ্জলি, জয়গুরু।

—o—

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজজীর ঘটনাবহুল জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাপঞ্জী

(সংক্ষিপ্তাকারে)

আবির্ভাব ঃ মাতুলালয় (কেওটা, হুগলী) সন ১২৯৮ সাল, ৬ই ফাল্গুন
বুধবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি

মাতৃবিয়োগ (গর্ভধারিণীমাতা মাল্যবতী দেবী) ১৩০৩ সাল, ৩রা বৈশাখ।
অনুমান ১৩০৪ সাল
(ছয় বৎসর বয়সে)

বিদ্যারম্ভ (মাতুলালয় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়)	১৩০৬ সাল
উপনয়ন	১৩১১ সাল
শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু মহাত্মা দাশরথি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের আশ্রয়লাভ, যাজন ক্রিয়া, শিখিরার দুর্গোৎসবে পৌরোহিত্য	১৩১৬ সাল
ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ	১৩১৭ সাল
পিতা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের দেহত্যাগ	১৩১৮ সাল, ৩রা পৌষ
দীক্ষালাভ (ত্রিবেণী) ও গুরুদত্ত "সীতারাম" নাম গ্রহণ	১৩১৯ সাল ২৯শে পৌষ
ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩১৯ সাল

আশীর্ব্বাদ, পলায়ন, নরেনদাসহ প্রত্যাবর্তন ও বিবাহ। পরে পুরী-ধামে গমন ও বিখ্যাত গোপালদাস জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনা	১৩২৩ সাল (বিবাহ, অগ্রহায়ণ)
ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলকৃষ্ণের জন্ম	১৩২৩ সাল, ফাল্গুন
লেখনীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, মৌনকালীন বহু গ্রন্থ	১৩২৩
রচনার পূর্ব্বাভাষ	১৩২৪
বেদান্ত পাঠের নিমিত্ত চুঁচুড়া ভূদেব চতুষ্পাঠীতে গমন, রাত্রে সাধনকালে মাতাসহ পরমগুরু শঙ্করের আবির্ভাব, শিবমুখে স্বীয় ইষ্টমন্ত্র শ্রবণ ও বহু অনুভূতি লাভ	১৩২৪ সাল ইং ১৯১৮ ৭ই জানুয়ারী সোমবার
সরস্বতী পূজার সময় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির উদয়	১৩২৪ সাল
পূর্ণতা প্রাপ্তি। 'যদা যদাহি……' ভাবে ভোর	১৩২৪ সাল, দোল পূর্ণিমা
বেদান্তের আদ্য পরীক্ষা দান	১৩২৪ সাল
গুরু, গুরুপত্নী ও সহধর্ম্মিণী সহ একসঙ্গে পরম অনুভূতি আস্বাদন	১৩২৪ সাল
বিখ্যাত যোগী গৌড়েন্দ্রজীর (তৎকালীন বয়ঃক্রম ২৫০ বৎসরের উপর) নিকট গমন ও যোগক্রিয়া গ্রহণ।	১৩২৫ সাল

উত্তমাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী উত্তমানন্দ দেবের তিরোভাব তিথি উৎসবে বক্তৃতা। সন্ন্যাসীর আদর্শ ব্যাখ্যায় বিরূপ সমালোচনা লাভ	১৩২৫ সাল
অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র ও তদীয় স্ত্রী সরোজ বালার দেহত্যাগ	১৩২৫ সাল, ২৮শে কার্ত্তিক (স্বামী)
সাংখ্যের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩২৬ সাল
ব্রজনাথ সমিতি গঠন	১৩২৭ সাল
উপনিষদের অন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩২৭ সাল
ডুমুরদহে হরিবাসর আরম্ভ	১৩২৮ সাল, কৃষ্ণা একাদশী
পুরাণের আন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	১৩২৮ সাল
গয়াধামে পাঞ্জাবী সাধু ভগবান দাসের সহিত সাক্ষাৎ ও তৎসহ বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন, মৌনের প্রেরণা লাভ	১৩২৯ সাল
তীর্থ ভ্রমণ। তারাপীঠ, ফুল্লরাপীঠ, কিরীটেশ্বরী, ললাটেশ্বরী প্রভৃতি তীর্থে গমন	১৩২৯ সাল
প্রথম দীক্ষা দান। প্রথম শিষ্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম, বাকসাড়া, বর্দ্ধমান	১৩৩০ সাল
উৎসব অফিসে গমন ও পরম ভাগবত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের, স্নেহলাভ, শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রভৃতির সহিত পরিচয়।	১৩৩০ সাল

'চোখের জলে মায়ের পূজা' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ 'উৎসব' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ ১৩৩০ সাল আশ্বিন সংখ্যা	
পুরাণ তীর্থ + রত্ন উপাধি লাভ।	১৩৩০ সাল
ডুমুরদহে শ্রীনামযজ্ঞ আরম্ভ	১৩৩১, ১৭ই পৌষ
ডুমুরদহে ৺শ্রীব্রজনাথ বাটীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা	১৩৩২ সাল
ডুমুরদহ রাধারমণ সম্মিলন সমিতির আচার্য্যপদ গ্রহণ	১৩৩৪ সাল
উপনিষদের মধ্য পরীক্ষা দান	১৩৩৪ সাল
ঐ বৃত্তিলাভ	১৩৩৫ সাল
ব্রজনাথ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা প্রথম ছাত্র শ্রীশ্যামাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৩৩৩, ১৩ই আষাঢ়
প্রতিমাসে ২৪ প্রহর নাম আরম্ভ	১৩৩৩ সাল
সনাতন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ	১৩৩৩ সাল
পুত্র রঘুনাথের জন্ম	১৩৩৩ সাল, ৯ই শ্রাবণ
প্রথম গ্রন্থ 'পাগলের খেয়াল' প্রকাশিত	১৩৩৩ সাল
ডুমুরদহে 'রামাশ্রম' প্রতিষ্ঠা	১৩৩৪ সাল, ১৫ই চৈত্র, বুধবার
উপনিষদের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বৃত্তিলাভ।	১৩৩৪ সাল
মজুমদার মহাশয়েরর নিকট যোগক্রিয়া গ্রহণ। ক্রিয়া দৃষ্টে বিস্মিত মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্য।	১৩৩৪ সাল

মজুমদার মহাশয়ের রামাশ্রমে আগমন	১৩৩৪ সাল ২৬শে বৈশাখ
৺কাশী বৃন্দাবন ধাম যাত্রা	১৩৩৫ সাল
কুম্ভশেষে গুরুসঙ্গে (প্রয়াগ ধামে) মিলন	১৩৩৬ সাল
পত্নী কমলাদেবীর দেহত্যাগ	১৩৩৭ সাল, ১৩ই বৈশাখ
কঠিন পীড়া, দক্ষিণ পদে অস্ত্রোপচার।	১৩৩৭ সাল
স্বপ্নে ব্রাহ্মী দীক্ষা।	১৩৩৮ সাল, ১৬ই কার্ত্তিক
গুরুদেব মহাত্মা দাশরথি স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ।	১৩৩৯ সাল, ৩১শে ভাদ্র
সাধন সমিতির আচার্য্য পদ গ্রহণ।	১৩৩৯ সাল
বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে মিলন ও পৌষী অমাবস্যায় তর্করত্ন মহাশয়ের রামাশ্রমে শুভাগমন	১৩৪০ সাল
স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজের জন্মস্থান রামজীবনপুর (মেদিনীপুর) গমন। সভায় বক্তৃতাদানকালে সহসা বাক্যহারা। চণ্ডীপাঠে বসিয়া, শরীরে নানা ক্রিয়ার প্রকাশ	১৩৪০ সাল
রামাশ্রমে সাধন গুহা খনন। সাধন কালে নানা যৌগিক অনুভূতি লাভ, নাদ শ্রবণ।	১৩৪০ সাল
কাশীধাম গমন। মান সরোবরে তর্করত্ন মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।	১৩৪১ সাল

একমাত্র কন্যা জানকী দেবীর বিবাহ। পাত্র খন্যান (হুগলী) নিবাসী শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪২ সাল
তর্করত্ন মহাশয় প্রদত্ত 'যোগানন্দ' উপাধি লাভ	১৩৪৩ সাল
অধ্যাপনার কাজ অচল হয়। চোখে জল, পাঠ আর চলে না; চতুষ্পাঠী বন্ধ হয়।	১৩৪৩ সাল
ত্রিবেণীতে কৌপীন ও বহির্বাস গ্রহণ, 'ওঙ্কারনাথ' নাম গ্রহণ।	১৩৪৩ সাল
৺পুরীধামে মৌন গ্রহণ ও মৌনত্যাগ, প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি—'ঋষি তুমি ঝাঁপিয়ে পড়।'	১৩৪৩ সাল
'জয়গুরু সম্প্রদায়' নাম লাভ ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন।	১৩৪৩ সাল
প্রত্যক্ষ আদেশের পর শূদ্রদিগকে দীক্ষাদান আরম্ভ। প্রথম শূদ্রশিষ্য— ৺ভুজেন্দ্রনাথ সরকার	১৩৪৩ সাল
পুনঃ মৌন গ্রহণ, জগন্নাথদেবের আবির্ভাব ও প্রত্যাদেশ "যা যা নাম দিগে যা"; মৌনত্যাগ	১৩৪৪ সাল ১১ই বৈশাখ
প্রথম চাতুর্ম্মাস্য ৫৮নং শাঁখারীপাড়া লেন, ভবানীপুর	১৩৪৪ সাল
৺পুরীধামে পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সহিত মিলন ও আলাপ আলোচনা	১৩৪৪ সাল

নেতাজী সুভাষ বসুর মাতার আগমন ও আলাপ আলোচনা	১৩৪৪ সাল
দ্বিতীয় চাতুর্মাস্য, ডুমুরদহ	১৩৪৫ সাল
পৌষ সংক্রান্তিতে মৌনগ্রহণ	১৩৪৫ সাল
ভ্রাতুষ্পুত্র বিমলের বিবাহ	১৩৪৫ সাল
৺পুরীধামে রথযাত্রায় যোগদান, ষ্টেটস্‌ম্যান্‌ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ	১৩৪৬ সাল
রামানন্দ মঠে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা	১৩৪৬ সাল
পৌত্র লাভ (বিমলকৃষ্ণের পুত্র, গুরুদাসের জন্ম)	১৩৪৭ সাল
চাতুর্মাস্য, ডুমুরদহ	১৩৪৭ সাল
ঐ, রামেশ্বরপুর	১৩৫০ সাল
পুত্র রঘুনাথের বিবাহ	১৩৫৫ সাল ২৮শে আষাঢ়
চাতুর্মাস্য, দিগসুই	১৩৫১ সাল
চাতুর্মাস্য, কটক	১৩৫২ সাল
চাতুর্মাস্য, ডুমুরদহ	১৩৫৩ সাল
চাতুর্মাস্য, দশেড়ে, বাঁকুড়া	১৩৫৪ সাল
চাতুর্মাস্য, আমলকী, বর্দ্ধমান	১৩৫৫ সাল
চাতুর্মাস্য, ৺পুরীধাম	১৩৫৬ সাল
পৌত্র জগন্নাথের জন্ম (রঘুনাথের পুত্র)	১৩৫৬ সাল ১০ই আশ্বিন মঙ্গলবার
দাক্ষিণাত্যে নাম প্রচার	১৩৫৬ সাল
হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যোগদান	১৩৫৬ সাল
চাতুর্মাস্য, দিগসুই	১৩৫৭ সাল

উজ্জয়িনী হইয়া ওঙ্কারেশ্বর যাত্রা, বহু তীর্থ ভ্রমণ	১৩৫৭ সাল
৺পুরীধামে মৌন	১৩৫৮ সাল
চাতুর্মাস্য, গণপুর, বর্দ্ধমান	১৩৫৯ সাল
চাতুর্মাস্য, মেমারী, বর্দ্ধমান	১৩৬০ সাল
ওঙ্কারেশ্বরে মৌন গ্রহণ। কানাডা নিবাসী অধ্যাপক সিসিল মিডের দীক্ষা গ্রহণ। মাতা গিরিবালার দেহত্যাগ	১৩৬০, মাঘ—১৩৬২ বৈশাখ
হুগলীর অধ্যাপকবৃন্দের দীক্ষালাভ ও যোগেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ১৩৩০ সালের পর পুনরায় মিলন ও পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ।	১৩৫৯ সাল
রাজোল যাত্রা (দাক্ষিণাত্য)	১৩৬০ সাল
গুণ্টুর ধর্ম্মমহাসভায় যোগদান	১৩৬০ সাল
চাতুর্মাস্য, গোপালপুর (হুগলী) লক্ষ তুলসী দান	১৩৬২ সাল
কাশী, বৃন্দাবন, নাগপুর, আঙ্গল কুঁদরু গুণ্টুর ভ্রমণান্তে ৺পুরীধাম হইয়া কলিকাতায় আগমন। শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে বিরাট শোভাযাত্রা। তিব্রীওয়ালা ধর্ম্মশালায় ৭০০ দীক্ষার্থীকে দীক্ষাদান, মহাজাতি হলে বিরাট জনসভায় ভাষণ দান	১৩৬৩ সাল

চিতার মার পড়ায় ১৩০০ দীক্ষার্থীকে একসঙ্গে দীক্ষাদান। ১৩৬৩ সাল

কলিকাতায় দোল পূর্ণিমা উৎসবে বিরাট শোভাযাত্রায় যোগদান ও দেশপ্রিয় পার্কের বিরাট জনসভায় ভাষণ দান। অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে ভাষণ দান ১৩৬৩ সাল

'মাদার', 'পরমানন্দ পত্রিকা,' 'প্রণব পারিজাত' 'জয় জগন্নাথ' পত্রিকা সমূহের অবতরণ ও ক্রমে ক্রমে সব কয়টিরই প্রকাশ। ১৩৬৩ সাল